আবার আমি আসব

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম (বি) সংস্কর
—সেপ্টেম্বর, ১.
—ভাদ্র, ১৯৬০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাভাজনেষু

ঘরের বড় বড় দরজা জানলাগুলো সব সপাট খোলা ছিল। মাথার ওপর পুরোদমে পাখা ঘুরছিল। তার একটানা শাঁ-শাঁ শব্দে ঘরটার নিথর নীরবতা আরো ভরাট হয়ে উঠছিল।

এক একবার থমকে গিয়ে শশিশেখর কান পেতে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে চেষ্টা করেছে। শুনতে পায় নি। পেলে যেন সঙ্কোচের কারণ হত। কালো মসৃণ নরম চামড়ায় মোড়া পাণ্ডুলিপিটার কালের জরা-লাগা বিবর্ণ পাতা ওলটানোর খসখস শব্দে দু'কান সচকিত হয়েছে। এটুকুর মধ্যেও যেন কিসের তন্ময়তা ভঙ্গের অভিযোগ।

আবার আমি আসব!

প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠেছিল শশিশেখর। 'পর কালির আঁচড়ের তিনটা শব্দের ওপর দৃষ্টি স্থির হয়ে আটকে ছিল। চোখের দেখাটাই কানে শব্দ হয়ে বেজেছিল খেয়াল নেই। তার সামনে দাঁড়িয়ে—সামনে নয়, একেবারে মর্মস্থলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অস্ফুট গম্ভীর কণ্ঠে কেউ যেন বলল কথাগুলো।

আবার আমি আসব!

শশিশেখরের হুঁশ ফিরেছে। দিশা ফিরেছে।

শব্দ তিনটের মধ্যেই ডুবে আছে।

পড়ে গেল একটা।

জানলা দরজাগুলো সব খোলা থাকা সত্ত্বেও, পাখার শাঁ-শাঁ আওয়াজ সত্ত্বেও, পাতা ওলটানোর খসখসানি সত্ত্বেও—ঘরটার মধ্যে দুঃসহ গুমোটের মত যে অনড় নৈঃশব্দ থিতিয়ে ছিল, সেটা গেল।

আবার আমি আসব।

কে বলল? শব্দ কটা চোখে তো দেখছে। এই শব্দ-তরঙ্গ কিসের? এই তিনটে কথা এমন অনন্তহীন কেমন করে হল?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শশিশেখর। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে হাল্কা লাগছে। অনেক সবল লাগছে, তাজা লাগছে। একটানা বহুক্ষণ অঘোরে ঘুমানোর পর আমেজটুকুও কেটে গেলে যেমন হাল্কা তরতাজা লাগে—তেমনি লাগছে। অথচ ক'রাত ঘুমোয় নি ঠিক নেই।

পায়ে পায়ে হল্ ঘর ছেড়ে বাইরের বাঁধানো দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। দূরে, বাড়িটার চার-ধারের বিস্তৃত এলাকা ঘেরা দেয়ালের ওধারে উঁচু ল্যাম্পপোস্টের মাথায় একটা চিল বসে আছে। দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে মৌনী নিয়েছে যেন। দুপুরের এই নির্জনতার প্রতীক ওটা।

করে। আগের দেখার সঙ্গে এই দেখায় অনেক—অনেক তফাত। দরজা জানলাগুলো সব খোলা থাকা সত্ত্বেও বিগত ক'টা দিন ধরে তার কেবলই মনে হয়েছে বাড়িটায় আলো বাতাস ঢুকতে পায় নি তেমন করে। চারদিক এত খোলামেলা সত্ত্বেও গোটা বাড়িটাই বুঝি এক নিঃসীম গুমটের গহ্বরে তলিয়ে ছিল। কিন্তু আজ সে-রকম লাগছে না। আজ নয়, এখন সে-রকম লাগছে না।

রহস্যটা এই মুহূর্তে আবিষ্কার করল শশিশেখর। আলো বাতাস ঠিকই ঢুকেছে। এতদিন তারই অন্তস্তলের সবগুলি কুঠরি অর্গলবদ্ধ ছিল। আর সেই অর্গলবদ্ধ কুঠরির প্রত্যেকটিতে একজন করে শশিশেখর মাথা খুঁড়ছিল আর পথ খুঁজে মরছিল। জোয়ান মহাদেও বাড়ির দরজা জানলাই খুলেছে শুধু। নিভৃতের এই বদ্ধ কুঠরিগুলি অর্গলমুক্ত করার মত পেশীর জোর কারও ছিল না। কিন্তু আজ এগুলোতেই অমোঘ একটা করে ঘা পড়েছে যেন। এক অব্যক্ত প্রতিশ্রুতির আঘাত। আবার আমি আসব, আবার আমি আসব, আবার আমি আসব, আবার আমি আসব···

অবরোধগুলো ভেঙেছে।

একে একে সেই বদ্ধ কুঠরির শশিশেখরেরা বেরিয়ে তার সঙ্গে এসে মিশছে। এই শশিশেখরের সঙ্গে। তাই সবল লাগছে, পুষ্ট লাগছে, হালকা লাগছে। বাতাস টেনে টেনে ফুসফুসটা ভরাট করে তোলা যাচ্ছে। দেহের অণুতে অণুতে, প্রতি রন্ধ্রে ওই প্রতিশ্রুতির সাড়া পড়ে গেছে—আবার আমি আসব, আবার আমি আসব।

আবার আমি আসব···

দেখতে অনেক দূর দূর থেকে লোক আসত। যে-সব ফুল ফুটত এখানে সে-সব ফুল এ দেশের লোক চোখেও দেখে নি আগে। ফুলের এত সখ ছিল যার সে ফুল-বাবু নয় তো কী? এখানকার সেই গৃহস্বামীকে ফুল-বাবু বলত অনেকে তামাসা করে। সামনে নয়, আড়ালে। ফুল-বাবুর স্বভাব চরিত্র ফুলের মত অমলিন কিনা সেই সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দিত।

তার কারণও ছিল।

বাবুটি অর্থাৎ কোনো এক কালের সেই গৃহস্বামী কারো সঙ্গে কথা বলতেন না, কারো সঙ্গে মিশতেন না। অথচ রোজ সকালে তাঁরই হাসি মুখের দর্শন মিলত দল বেঁধে সাঁওতাল মেয়েরা এলে। কালো মেয়ের দল ঘণ্টা ধরে ফটকের সামনে ফুলের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকত। আর গোড়ায় গোড়ায় তাদের পুরুষেরা ভাবত, ফুলের ফাঁদ পেতে ওই শ্বেত প্রাসাদে বসে থাকে এক মেয়েখেকো ব্যাধ। না, সেই নিরক্ষর আদিবাসী পুরুষদের মগজের আবিষ্কার-শক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল না। তাদের ওই রকম বোঝানো হয়েছিল। বুঝিয়েছিল ভদ্রলোকেরা। যারা অনেক বোঝে। সভ্যতার আলোয় যারা মন দেখে, ভেতর দেখে।

কালো মেয়েদের পুরুষেরা তাই দ্বিধান্বিত হয়েছিল, সংশয়াপন্ন হয়েছিল। দূর থেকে, তা প্রায় বেশ দূর থেকেই প্রৌঢ় গৃহস্বামীটিকে নিরীক্ষণ করে দেখত। তারা ফটকের মধ্যে ঢুকত না।

একবার ঢুকেছিল।

তার আগে তারা তাদের মেয়েদের শাসন করেছিল।

এনে দিতে গেছে। বাবুটি মধু রেখেছে, হাঁস-খরগোশ ফিরিয়ে দিয়েছে। জীবগুলোর ক্ষত জায়গায় চোখ পড়তে বাবুর চোখের তারায় যাতনা দেখেছে! এই নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছে।

মরদগুলোর তাড়নায় দিন-কতক আসা হয় নি। ফুলের ভারে তাই বাগান যেন ভেঙে পড়ছে। গাছে গাছে আবার কতগুলো নতুন ফুল ফুটেছে কি? তারা যেন অহরহ হাতছানি দিচ্ছে, ডাকছে। সাঁওতাল মেয়েরা দাঁড়িয়ে যায়। দেখে। লোভ দমন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাগানটা তাদের চোখ টানে, মন টানে, শেষে পা'ও টানে। আবার একদিন তারা মরদের সব শাসন হম্বি-তম্বি তুচ্ছ করে দল বেঁধে ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ফটক বন্ধ।

রমণীরা দাঁড়িয়ে জটলা করে, হাসাহাসি করে, কলকণ্ঠে চেঁচামেচি করে। ফটক থেকে লাল কাঁকরের রাস্তা বাড়ির সিঁড়িতে এসে মিশেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠলে সামনে ঢাকা বারান্দা। সেই বারান্দায় বসে মালিক গম্ভীর ঔদাসীন্যে ওদের দেখছেন চেয়ে চেয়ে। ওরা হাতছানি দিয়ে ডাকে তাঁকে, কেউ আবার তারস্বরে চেঁচায়, গেট খুলে দে না কেনে বাবু, মোদের ফুল দিবি না?

এক সময় ওরা টের পেল বাবুর গাম্ভীর্যটা নকল। আসলে বাবুটি মুখ টিপে হাসছেন আর মজা দেখছেন। ওদেরও সাহস বাড়ে, ঝোঁক বাড়ে—ফুল না নিয়ে নড়বে না। ওদেরই মধ্যে একজন অসম সাহসিকা কোমরের কাপড় আঁট করে এঁকে বেঁকে গেট বেয়ে উঠতে থাকে। অন্যান্য রমণীরা রুদ্ধবাক, রুদ্ধশ্বাস। একবার করে তারা সঙ্গিনীর কাণ্ড দেখে আর একবার করে মালিকের মুখভাব থেকে মনোভাব অবলোকনের চেষ্টা করে। ঝুমরিও—মেয়েটার নাম ঝুমরি—গেটের মাথায় উঠে বাবুটিকে শেষবারের মত পর্যবেক্ষণ করে নেয়। তারপর ঝুপ করে এ-ধারে নেমে পড়ে।

মালিক দেখছেন। তেমনি নির্লিপ্ত, উদাসীন।

এঁকে বেঁকে যৌবনকে শালীনতার বাঁধনে বেঁধে ঝুমরি পায়ে পায়ে বাগানের দিকে এগোতে থাকে। যাচ্ছে বাগানের দিকে, হাসিহাসি চোখ দুটো মালিকের দিকে। অর্থাৎ মালিকের মুখ-ভাবের ব্যতিক্রম দেখলে এখনো এগোবে কি গেটের দিকে ছুটবে সেই দ্বিধা। পিছনের সঙ্গিনীদের মুখ খুলেছে আবার, তারা উৎসাহ দিচ্ছে। ঝুমরি সেই নতুন ফুলের গাছগুলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর মরিয়া হয়েই যেন পাতাসুদ্ধ বড় দেখে একটা ফুল ছিঁড়ে নেয়।

বারান্দার মালিক এবারে চেয়ার ছেড়ে উঠেছেন। ওদিকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে মালীরাও মজা দেখছে। আর, মালিক সব দেখছেন বলেই তারা বাধা দেবে কি দেবে না ঠিক করে উঠতে পারছে না।

বারান্দা থেকে নেমে মালিক বাগানের দিকে, ঝুমরির দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। বিষম গম্ভীর।

ফটকের ওধারে রমণীদের কণ্ঠে আর সাড়া নেই। আর মালিককে এভাবে আসতে দেখে ঝুমরির পা দুটোও যেন মাটির সঙ্গে স্থাণুর মত আটকে গেছে। সে না পারছে ফিরতে না পারছে নড়তে। মুখখানা তখনো হাসি হাসি, কিন্তু সেই সঙ্গে অজ্ঞাত ভয়ও।

তারপর তাজ্জব কাণ্ড।

মালিক তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। খুব কাছে। গম্ভীর মুখে হাত বাড়ালেন।

মেয়েটা থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বাঁচল। কিন্তু তারপরেই ভিতরে ভিতরে আঁতকে উঠল। অন্য হাতে মালিক তার একখানা হাত ধরলেন।

পরক্ষণে বহু নারীর সমবেত কলকণ্ঠের হাসিতে আনন্দে বাগান মুখরিত। কারণ, শাস্তিস্বরূপ মালিক নিজের হাতে ফুলট

ঝুমরির খোঁপায় পরিয়ে দিয়েছেন। দিয়ে হাসছেন। লজ্জায় আনন্দে হাসিতে ভেঙে পড়তে পড়তে কালো মেয়ে ছুটল ফটকের দিকে। ততক্ষণে অন্য রমণীরাও ভেতরে আসার জন্য গেট ঝাঁকাচ্ছে, ঠেলছে।

মালিক একজন মালীকে ইশারা করলেন গেট খুলে দিতে। ওরা দল বেঁধে ঢুকল। বাগান উজাড় করে ফুল নিয়ে গেল। মালিক হাসছেন। ওরা আরো বেশি হাসছে।

কিন্তু ঘটনাটা গোপন থাকল না। ওদের মরদের কানে গেল। ঝুমরির খোঁপায় ফুল পরিয়ে দেওয়াটা তারা সহজভাবে দেখল না। দল পাকিয়ে ফয়সালা করতে এলো তারা। বুড়োরা খালি হাতেই আসছে বটে, কিন্তু পিছনের তরুণ দলের হাতে লাঠি সড়কি তীর ধনুকও আছে। ঠিক আক্রমণের উদ্দেশ্যেই যে এসেছে তা নয়, ও-সব অস্ত্র তাদের সঙ্গে থাকে বলেই আছে। কিন্তু তাদের উত্তেজনাটুকু স্পষ্ট।

ফটক বন্ধ। বাগানে থরে থরে ফুল ফুটে আছে। ওই ফুলই যত নষ্টের মূল। আর কিছু করতে না পারুক, বাগানটা নির্মূল করে দেবার ইচ্ছে তাদের।

নিচের বারান্দা সংলগ্ন সিঁড়ির কাছে মালিক দাঁড়িয়ে। দেখছেন ওদের।

ফটকের ওধারে ওরাও দাঁড়িয়ে গেল। মালিকের বন্দুক আছে জানে। ওদিক থেকে বন্দুক নিয়ে কেউ প্রস্তুত কিনা দেখছে।

মালিকের আদেশে সেদিনও একজন মালী গিয়ে ফটক খুলে দিল। ওরা সবিস্ময়ে দেখল, মালিক হাতের ইশারায় ডাকছেন তাদের—সকলকে আসতে বলছেন! মালিকের মুখে ভয়ের লেশ মাত্র নেই।

মাতব্বরদের পিছনে ছেলে ছোকরার দলও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর সকলে ঘিরে দাঁড়াল তাঁকে।

মালিক সহাস্যে বললেন, আমার মেয়েরা যখন এসেছে তোরাও না এসে থাকতে পারবি না জানি। যা মেয়েদের জন্যে ফুল নিয়ে যা—সকলে নিজে হাতে করে খোঁপায় পরিয়ে দিবি—দেখিস ওরা কেমন হাসবে।

সর্দার গোছের একজন লোক কাছে এগিয়ে এলো। দু'চোখ টান করে দেখল তাঁকে। কি দেখল সেই জানে। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে আভূমি নত হয়ে গড় করল তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন গড় করার ধূম পড়ে গেল। আনন্দের হাট।

তারপর থেকে ওদের মেয়েদের আসা একেবারে সহজ হয়ে গেল। ছোট-বড় একদল না একদল আসবেই। ফুল নেবে তবে নড়বে। গৃহস্বামী দুটো চারটে করে ফুল দিতেন সকলকে। সেই ফুল খোঁপায় গুঁজে কালো মুখে হাসির ফুল ঝরিয়ে কলহাস্যে যৌবনের ঢেউয়ের দোলায় নাচতে নাচতে চলে যেত তারা।

শশিশেখরের দৃষ্টিটা জংলা বাগানের দিকে আটকে ছিল। মজুরদের কাজ দেখছিল সে। কিন্তু সত্যিই সে এই সত্যবর্তমানের কিছুই দেখছিল না। মনটা বুঝি নিজের অগোচরে কালের সেতু ডিঙিয়ে উধাও হয়েছিল কোথায়। কোনো এক কালের একটা কালো পরদা যেন চোখের সামনে থেকে সরে গিয়েছিল তার। সেই ফুলবাগান দেখছিল, ফুলবাগানের সেই মালিককে দেখছিল, আর সেই কালো মেয়েদের ফুলঝরা হাসি দেখছিল।

শশিশেখর থমকালো হঠাৎ।

সেই ফুলবাগানের কথা আর সেই যৌবন-তরঙ্গিণী সাঁওতাল মেয়েদের কথা কে আবার বলল তাকে? কার মুখে শুনল?

বাড়িটার সম্বন্ধে অনেক গুজব অনেক রটনা শুনেছে বটে, কিন্তু ঠিক এই ঘটনা কে আবার শোনালো তাকে। এ দৃশ্য কেমন করে চোখের সামনে ভেসে উঠল? কেউ বলেছে কি?

নিজের মধ্যেই শশিশেখর সন্তর্পণে বিচরণ করে নিল একপ্রস্থ

খুঁজল। সমাচারটা তারই অন্দরমহলের কারো কিনা তাই উপলব্ধি করে নিতে চেষ্টা করল!

না,.তা নয়। মনে পড়েছে।

লাইব্রেরি ঘরের কালো নরম চামড়ায় মোড়া সেই পাণ্ডুলিপির পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় চোখে পড়েছিল। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে সে-তো পাতা উল্টেই গেছে, পড়ল কখন? হয়ত কোথাও একটু আধটু থেমেছে, একটু আধটু দেখেছে। কিন্তু ওইটুকু থেকে এমন এক নিটোল পরিপূর্ণ দৃশ্য দেখে ওঠা সম্ভব হল কেমন করে?

শশিশেখরের হাসি পেল। এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে নিজের—সায়েন্স পড়া শশিশেখর দত্তগুপ্তর—এমন উদ্ভট কল্পনার সম্বন্ধে সচেতন হলে হাসবে না তো কি? কিন্তু হাসুক আর যাই করুক, এ-ভাবে কল্পনার বলগা ছেড়ে দিতে মন্দ লাগছে না। বেদম বেপরোয়া ছুটে অভ্যস্ত একটা তেজী ঘোড়াকে এই প্রায় অচেনা গোলক-ধাঁধার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখতে মন্দ লাগছে না। উদ্দাম ছোটার শক্তি সত্ত্বেও চিনে চিনে বুঝে বুঝে পা ঠুকে চলা ছাড়া উপায় নেই এই পথে।

সায়েন্স-পড়া শশিশেখর দত্তগুপ্ত আবার অনমনস্ক হয়ে পড়ল।

এই বাড়িটার যুগ বদলেছে। শুধু এই বাড়িটার কেন, যুগ যুগ ধরে সব-কিছুরই তো ধারা বদলাচ্ছে, গতি বদলাচ্ছে। আকাশ-বাতাসসুদ্ধু বদলাচ্ছে মনে হয়। কিন্তু এই সব-কিছুর তলায় তলায় অনিঃশেষের পরমায়ু নিয়ে যে প্রাণের ধারা বয়ে চলেছে, তার বদল কতটুকু হল? মদ খেলে চোখের সামনে বস্তু বদলায়। মন বদলায়। নেশা ছেড়ে গেলে কিছুই বদলায় না। ঠিক তেমনি করেই বুঝি তামাম দুনিয়াটার বাহ্য বস্তু বদলাচ্ছে আর মন

বদলাচ্ছে। কিন্তু আসলে কিছুই বদলাচ্ছে না। আসলে এই যুগটাই নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন। নেশা ছুটলে হয়ত দেখা যাবে এও ঠায় একভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। কিছুই বদলায় নি।

সাঁওতাল পরগণার এই গোটা এলাকাটার নাম চার্বাক। বাড়ির নাম ফুলবাগ।

চার্বাক নামটা এই ফুলবাগের সেই কোন-এক কালের মালিকের দেওয়া। জলের দরে চব্বিশ বিঘে জমি কিনে দেয়ালে ঘিরেছিলেন তিনি। আশে পাশে তখন আর একটাও বাড়ি ছিল না। ফুল-বাগের মালিক সর্বপ্রথম বাসিন্দা এখানকার।

জায়গাটার চার্বাক নামকরণের হেতু জানা নেই শশিশেখরের। কারোরই জানা নেই। তবু এখানে এসে এই নাম নিয়েও মাথা ঘামিয়েছে শশিশেখর। নিগূঢ় কিছু ইঙ্গিত অনুভব করতে চেষ্টা করেছে।...পুরাণের চার্বাক ছিল দুর্যোধনের সখা এক রাক্ষস। তপস্যা করে সে ব্রহ্মার কৃপায় অভয় বর লাভ করেছিল। তারপর দেবতাশাসন আর দেবতাদমনে মেতে উঠেছিল। নিরুপায় এবং অসহায় দেবতারা যা করে থাকেন তাই করেছিলেন। সদলবলে গিয়ে ব্রহ্মার হাতে পায়ে ধরেছিলেন তাঁরা। ব্রহ্মা তখন ওই অসহায় শিশুদের বাঁচার পন্থা বলে দিয়েছিলেন। যথা, দুর্যোধনের সখারূপে চার্বাক ব্রাহ্মণদের অপমান করবে, তাদের শত্রু হয়ে উঠবে। সেই ব্রহ্মশাপে চার্বাকের নিপাত-লিখন।

অথণ্ড অবকাশে অনেক মাথা খাটিয়ে জায়গাটার চার্বাক নামের একটা তাৎপর্য গড়ে তুলেছে শশিশেখর। এ-জায়গার ওই নাম যিনি দিয়েছেন তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁর পদবী বিশ্বাস। কলকাতার নামজাদা বনেদী বংশের ছেলে। বেনিয়ান শম্ভুনারায়ণ বিশ্বাসের ছেলে ইন্দ্র বিশ্বাস। পুরনো কলকাতার এই পরিবারের নামটা জানে শশিশেখর। আর ইন্দ্র বিশ্বাস নামটাও চেনা। এই বাড়িটা দেখার অনেক আগেই চিনত। ওই নামের সঙ্গে প্রাচীন কলকাতার অনেক গল্পকথা জড়িত। ওই নামের শাখা-প্রশাখা ধরে

এগোলে আত্মীয়তার মূল শিকড়ের সঙ্গে নিজেরও একটা প্রত্যক্ষ যোগ খুঁজে পাবে শশিশেখর।

কিন্তু সেটা খোঁজে নি কখনো।

ওই নামের প্রবল পুরুষটি, অর্থাৎ এই চার্বাক নামের নিয়ামক ইন্দ্র বিশ্বাস বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়েস হত একশ তিরিশ বছর। শশিশেখর হিসেব করে দেখেছে। নাম করা ব্যারিস্টার ছিলেন সেই মানুষটি। যে বছর কলকাতায় হাইকোর্ট হল সেই বছরই তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত ক'টি দিশি লোক সাগর পাড়ি দিয়েছিল এক হাতের দু'তিন আঙুলে গুণে শেষ করা যেত।

কিন্তু ব্যক্তি জীবনে সেই মানুষের সঙ্গে কোনো ব্রাহ্মণের সংঘাতের খবর শশিশেখর শোনে নি। বরং তাঁর প্রতি এক ব্রাহ্মণ-কন্যার অনুরাগের গুজব কিছু শোনা আছে। সেদিনের আর সেই কালের বিচারে গুজবটা যতবড় আলোড়নের বস্তুই হোক, আজ আর সেটা কৌতূহল উদ্রেক করার মত কিছু নয়। এই গল্পগুজবে শশিশেখর কান দেয় নি।

শুনেছে, সংঘাতটা ইন্দ্র বিশ্বাসের নিজের পিতৃপুরুষ আর পরিবার বর্গের সঙ্গেই বেধেছিল। তখনকার দিনের ব্রাহ্মণদের বিধি-বিধান আর গোঁড়ামি অত্যাচরের মতই হয়ে উঠেছিল। সংস্কার আর গোঁড়ামির শিকড় সমস্ত হিন্দু সমাজটি হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গিয়েছিল। খামখেয়ালী দুর্বার পুরুষ ইন্দ্র বিশ্বাস নিজের সাংসারিক জীবনযাত্রায় ওই শিকড়টা ছিঁড়ে খুঁড়ে উপড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে না হোক, তাদের প্রতীক ওই সংস্কার আর গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সেদিনের এক নবচেতনার বিরোধ আজ বহু গল্প কথায় পল্লবিত।

এই দিক থেকে চিন্তা করে জায়গাটার চার্বাক নামকরণের একটা যোগ খুঁজে বার করেছে শশিশেখর। নিজের অগোচরে সে যে সুদূর অতীতের সঙ্গে সদ্য বর্তমানের একটা যোগই হাতড়ে বেড়াচ্ছে খেয়াল নেই।

তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। সামনে মহাদেও দাঁড়িয়ে।

শশিশেখরের থেকেও আধহাত লম্বা আর জোয়ান মানুষটা। এখন বয়েস হয়েছে। কিন্তু বয়সের জরা ওকে স্পর্শ করে নি। কোনদিন করবে বলেও মনে হয় না। বহুকাল ধরে আছে। একেবারে শশিশেখরের ছেলেবেলা থেকে। কালে কালে তাদের পরিবারের ওপর দিয়ে পরিবর্তনের অনেক ঢেউ এসেছে, গেছে। সুখ, শান্তি ধূলায় লুটিয়েছে। আবার মনে হয়েছে, এত সুখ এত শান্তি বুঝি ধরে না। সুসময়ের বন্ধু পরিজনের দুঃসময়ে দেখা মেলে নি, আবার দুঃসময়ে যারা কাছে এসেছে তারা প্রতি পদ-ক্ষেপের হিসেব রেখে এগিয়েছে। কিন্তু কোনো হিত বা বিপরীত ঢেউয়ে পরিবর্তন হয় নি শুধু মহাদেওর। সে অবিচল। একভাবে ছিল, একভাবেই আছে।

বয়সকালে শশিশেখরের মা ওকে টাকা পয়সা দিয়ে বিয়ে করার জন্য দেশে পাঠিয়েছিলেন। বিয়ে করে বউ নিয়ে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু বিয়েটা চুকিয়ে মহাদেবও একাই ফিরেছিল। জিজ্ঞাসা করতে মাথা চুলকে বলেছিল লড়কী বাচ্চা, বড় হলে নিয়ে আসবে। বছর কয়েক বাদে মহাদেও বউ নিয়ে এসেছিল। ওদের জন্য মা বার বাড়ির ঘরে আলাদা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাদেওর মারের চোটে বউটা এক বছরও টিকতে পারে নি। বউটার কান্না শশিশেখর শোনে নি কখনো। না শোনার কারণটাও শুনেছে। বউ ঠেঙানোর আগে তার মুখে আগে বেশ করে কাপড় গুঁজে দিত মহাদেও, আর চারদিকের দরজা জানলা সব বন্ধ করে নিয়ে তারপর শাসন শুরু করত। কিন্তু মারের দাগ যাবে কোথায়? তা'ছাড়া মার খাওয়ার পরে বউ তো আর হাসি মুখে ঘর থেকে বেরুত না।

জানাজানি হত। মহাদেও গালমন্দ খেত।

মা তো রাগ করে কতদিন তাড়িয়েই দিতে চেয়েছেন দু'জনকে।

কিন্তু ধমক ধামক খেয়ে মহাদেও দু ঠোঁট শেলাই করে থাকত। খুব জেরা করলে বলত, বউটা বড় ফষ্টিনষ্টি করে।

মায়ের আর জেরা করা হত না। তিনি নিজেই পালাতেন।

বউ ফষ্টিনষ্টি কার সঙ্গে করে শশিশেখর তখন ছেলেমানুষ হলেও অনুমান করতে পারত। বাড়িতে আরও চার পাঁচটা চাকর-বাকর ছিল তখন। তাদের সঙ্গে বউ হেসে কথাবার্তা কইলেই মাথায় আগুন জ্বলত। মনিব আর চাকরের মধ্যে নিজের একটা মাঝামাঝি মর্যাদা গড়ে নিয়েছিল মহাদেও। সেই মর্যাদা ওকে আর কেউ না দিক, নিজে দিত নিজেকে। তাই পরের পর্যায়ের পরিচারকদের সঙ্গে বউয়ের সহজ মেলামেশায় তার আপত্তি হত, মানহানি হত। কাজ নিয়ে ওদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করলেও সেটা নীচু স্তরের ব্যাপার ভাবত।

ওদিকে বউটা স্বয়ং যমের দোসর ভাবত মহাদেওকে। বয়সোচিত একটুখানি হাসাহাসি সে সমগোত্রীয়দের সঙ্গে ছাড়া আর কার সঙ্গে করবে? মহাদেওর অনুশাসন মত সে সুরুচিশীলা মহিলা বনে যেতে চেষ্টা করেও সব সময় পেরে উঠত না। অতএব প্রহারটাও প্রাপ্য বলেই ভাবত কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী বা বাবুদের বউ ঠেঙানো পছন্দ নয় সেটা ভালো করে বোঝার পর তার ভয় কমতে লাগল। নিরুপায় মহাদেও তখন আবার একদিন দেশে চালান করল তাকে। ফলে তারপর থেকে আবার প্রায়ই ছুটিছাটা নিয়ে দেশে যেত সে। শশিশেখরের মায়ের সামনে এসে মাথা চুলকে দাঁড়ালেই আরজি বুঝতে পারতেন তিনি। ছুটি চাই। তিনি বলতেন, যাও। বউকে দেশে ফেলে রেখেছ কেন, নিয়ে এসো।

মহাদেও নিয়েও আসবে না, আবার ঘন ঘন দেশে যাওয়াও চাই। বাড়ির সরকার মশাইয়ের সঙ্গে মহাদেওর যা একটু মনের কথা হত। তাঁকে বলেছে, বউকে কলকাতায় এনে ভদ্রলোক বানাতে গেলেই সে বিগড়ে যাবে, আসলে তারা তো ভদ্রলোক নয়—ভদ্রলোকের মত মনের জোর তারা পাবে কোথায়?

বর্তমানে সে-কথা যতবার মনে হয়েছে, ততবার সচকিত হয়েছে শশিশেখর। সেদিন সরকার মশায়ের মুখে শুনে হেসেছিল। কিন্তু সে হাসি মিলিয়েছে। বার বার ভেবেছে, মহাদেও ব্যঙ্গ করেছিল সেদিন? বিদ্রূপ করেছিল? সরকার মশাইকে যা বলেছিল আজও কি মহাদেওর তা মনে আছে? মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। মুখ দেখে মহাদেওর মনের কথা কিছুই বোঝার উপায় নেই। এমন কি, ওর মন বলে কোনো বস্তু আছে তাই মনে হয় না কখনো। শশিশেখর বিশ্বাস করতে চায়, সরকার মশাইকে একদিন যা বলেছিল, মহাদেও নিজেই তা ভুলে গেছে। কিন্তু এও জানে মহাদেও ভোলে নি। মহাদেও কিছুই ভোলে না। ওর মনের কথা মা জানতেন। শশিশেখর জানে। আর, অলকাও জানে হয়ত। জানে বলেই মাঝের একটা নির্মম ব্যবধান আবার জুড়েছে। মহাদেওকে দণ্ড দিয়ে নিজের ওপর মৃত্যুদণ্ড হেনেছিল শশিশেখর। অলকা ওকে বাঁচায় নি, তাকে শুধু দয়া করেছে। শশিশেখরকে। কিন্তু অলকা এই দয়া করতে গেল কেন? কেন কেন কেন? কেন মহাদেওকে ফিরিয়ে দিল আবার?

মহাদেও যদি ভদ্রলোকের মনের জোর দেখে অট্টহাসি হাসে এখন, তাহলে কি হয়? কিন্তু না মহাদেও তা হাসবে না। অলকা জানে হাসবে না। শশিশেখরও জানে। ওর ভিতরে মরুবালির মত শোষণী শক্তি আছে একটা। চোখ দিয়ে যা দেখবে, কান দিয়ে যা শুনবে, মন দিয়ে যা বুঝবে—সব ওর ভিতরের মরুগহ্বর নিঃশেষে টেনে নেবে। তারপর আবার যে কে সেই। কিছু বোঝা যাবে না, কিছুই না। মহাদেও নীলকণ্ঠ।

মহাদেওর সেই বউ ছেলে হতে গিয়েছিল। বউ গেছে ছেলেও বাঁচে নি।

কিন্তু সেদিনের সেই মহাদেওকে কেউ নীলকণ্ঠ বলবে না। পাথরের মত নিরেট লোকটার হাপুস নয়নে কান্না দেখে বাড়ির সকলে ব্যথিত যত না হয়েছে তার থেকে অবাক হয়েছে বেশি।

পাথর গলানো কান্না। দিন কতক কেঁদে তারপর শান্ত হয়েছে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়েছে। আর পিছুটান নেই, বউয়ের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে ভাবনা নেই। বছরখানেক বাদে মা আবার বিয়ের কথা বলেছিলেন। মহাদেও মাথা নেড়েছে।

লোকটাকে আর একবার কাঁদতে দেখেছিল বাড়ির সকলে।

শুধু মহাদেও নয়, বাড়ির সকলেই কেঁদেছে সেদিন।···অলকাই কি কম কেঁদেছিল? কিন্তু মহাদেওর কান্না পাগলের কান্না। শশিশেখরের মা মারা যাবার দু'দিন আগে থেকে বলতে গেলে নিরম্বু উপোস করে সূর্য দেবতার কাছে মাইজীর জীবন ভিক্ষা করেছে সে। ছাতে কাঠফাটা রৌদ্রে দু'হাত জোড় করে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। মা যখন মারা গেলেন, তার দিকে চেয়ে মনে হয়েছে আকাশ থেকে ওই 'সুরিয়া দেওতা'কে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দিতে পারলে দিত। বাড়িতে তখন অনেক দেব-দেবীর মূর্তি ছিল, কয়েকটা দিন তাঁদেরও অবস্থান খুব নিরাপদ মনে হয় নি।

মা তাকে বলেছিলেন, দাদাবাবুকে ছেড়ে দিও না, তার কাছে থেকো।

যায় নি। আছে। অলকা হয়ত মায়ের কথা বলেই তাকে ফিরিয়ে এনেছে। তাই আছে। আজও আছে।

মহাদেওর এভাবে সামনে এসে দাঁড়ানোর অর্থ দাদাবাবুর কিছু চাই কিনা।

শশিশেখর মাথা নাড়ল। কিছু চাই না। মহাদেও বাগানে মজুরদের কাজ দেখতে চলে গেল।

অনেকটা হালকা মনে শশিশেখর সেই লাইব্রেরি ঘরের দিকেই এগলো আবার। এই পরিত্যক্ত ঘর বাড়ি বাগান গাছপালা কিছুই আর অর্থশূন্য অস্তিত্বের নিদর্শন বলে মনে হচ্ছে না তার।

ফুলবাগ আর যেন দম বন্ধ করে বসে নেই। এক কালে যেমন সজীব ছিল, তেমনি সজীব লাগছে। বড় বড় গাছগুলোর পাতায় পাতায় বাতাসের কানাকানি কানে আসছে। শীত যাই যাই। গাছের পাতায় হরিদ্রাভ সবুজের আভাস উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ওই জংলা বাগানটাও যেন তার হারানো যৌবনের জন্য তৃষিত হয়ে উঠেছে আবার।

বাড়িটা কেনার আগে আশেপাশের ভদ্রলোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সতর্ক করে দিয়ে গেছলেন তাকে।--কিনবেন না মশাই। একবার কিনে ফেললে বিক্রি করা খুব সহজ হবে না। দেখছেন তো পড়েই আছে।

শশিশেখর জানিয়েছে, কেনার উদ্দেশ্যটা বিক্রির উদ্দেশ্যে নয়।

সে তো জানি মশাই। বেচবে বলে কেউ কেনে না। কিন্তু ক'দিন না যেতে সকলেই আবার আবার বেচতে চায়। কিন্তু তখন বেচা সহজ হয় না।

অতঃপর চিরাচরিত কোনো অশরীরীর উৎপাতের কথা শুনবে ভেবেছিল শশিশেখর। কিন্তু তাঁরা তাও বলেন নি। কেউ এখানে ভূত প্রেত দেখেছে বা ভয় পেয়েছে এমন নজির নেই। কিন্তু এ-পর্যন্ত চার পাঁচ দফা বাড়িটার মালিকানা বদলের নজির আছে। কেউ টিকতে পারে নি। ছু'দিন না যেতে এখানকার নির্জনতা নাকি অসহ্য লাগে। চব্বিশ বিঘে জমি জুড়ে দেয়াল—নির্বাসনের মত লাগে। তার পূর্ববর্তীরা অনেক লোকজন নিয়ে, পরিবারবর্গ আত্মীয় স্বজন নিয়ে এখানে থাকতে চেষ্টা করে গেছেন। তবু এখানকার এই নির্জনতা বরদাস্ত করতে পারেন নি। আর এই লোক একা এখানে শুধু একটা চাকর নিয়ে থাকতে চায় শুনলে বিবেচক পড়শীদের বাধা দেবারই কথা।

এখানকার শৌখিন এলাকা এই চার্বাক, আভিজাত লোকের বসতি। এখানে অমন জলের দরে এই প্রাসাদোপম বাড়ি কিনতে পারার কথা নয়। এত শস্তা বলেই এখানে বাস করা

অসম্ভব সেই সংশয় প্রায় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে স্থানীয় লোকের। ওই দেয়াল ঘেরা বাড়িটার নির্জনতার একধরনের শোষণী শক্তি আছে বলে ভাবেন তাঁরা। তাই নিষেধ করেন।

কিন্তু শশিশেখর নির্জনতার গহ্বরে বিলুপ্ত হতেই চায়। মৃত্যুর মত মুছে যেতেই চায়।

যে কারণে বাড়িটা অনেকবার হাত বদল হয়েছে সেই কারণেই সে কিনে ফেলল এটা। এখানকার এই নির্জনতা তাকে হাতছানি দিয়েছে, তাকে লোভ দেখিয়েছে, তাকে টেনেছে। বস্তু জগৎ থেকে তাকে আপন জঠরে টেনে নেবার প্রলোভন ছড়িয়েছে। নিজেকে সকলের অগোচরে মুছে দেবার এটাই উপযুক্ত সমাধি ক্ষেত্র মনে হয়েছে তার।

কিন্তু আসলে তো একটা জীবিত মানুষ সে।

বিষ মুখে তুলে নেবার পর মৃত্যু যখন দেহ দেউলে কলুপ আঁটতে বসে তখনো একটা বাঁচার যুদ্ধ চলতে থাকে ভিতরে ভিতরে। বাড়িটা কেনার পর সেই অবস্থাই হচ্ছিল শশিশেখরের। এই বদ্ধ, দুর্ভর নির্জনতার গ্রাসে নিজেকে সমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই তার গলার ওপর হাত পড়েছে যেন। একটা অদৃশ্য হাত। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে তবে ছাড়বে। নিঃশ্বাস একেবারে রুদ্ধ হলে তবে তো মুক্তি। কিন্তু সেই মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম। সত্তার রীতি এই। শশিশেখরের মনে হচ্ছিল সেও টিকতে পারবে না এইখানে। এইখানকায় এই মূক জড় অস্তিত্বের প্রতিটি কণা কারো প্রতীক্ষায় আছে। কোনো অবাঞ্ছিত পদার্পণ তারা বরদাস্ত করবে না। প্রাণটাকে নিঙড়ে নিয়ে দেহটাকে ছিবড়ের মত এলাকার বাইরে ছুঁড়ে দেবে।

আবার আমি আসব?

আবার আমি আসব!

কি যে হয়ে গেল শশিশেখর জানে না। শব্দ কটা এখনো কানে বাজছে, বুকে বাজছে, দেহের অণুতে অণুতে বাজছে।

আর এখানে অবাঞ্ছিত লাগছে না নিজেকে। আর দুঃসহ লাগছে না এতটুকু। শ্বাসরোধী মৃত্যুর সংগ্রাম শেষ হয়েছে। এখানে যেন তারই আসার কথা ছিল। এইখানেই। তাই এসেছে। এই উপলব্ধিটুকুই যেন সগু হাতে পাওয়া পরোয়ানার মত। এখানে প্রবেশের, এখানে পদার্পণের, এখানে বাসের পরোয়ানা! গত কটা দিন এটা ছিল না বলেই এমন দম-বন্ধ যাতনা ভোগ করেছে।

লাইব্রেরিতে ফিরে এলো শশিশেখর।

মস্ত হলঘর। বড় বড় কাচের আলমারিগুলো বইএ ঠাসা। বেশির ভাগই দেশ-বিদেশের আইনসংক্রান্ত বই। কিছু পদাবলী গ্রন্থ আছে, দর্শনের বইও আছে কিছু। শৌখিন বাঁধানো মলাটে ছাপার হরফে প্রথম মালিকের নাম লেখা—ইন্দ্র বিশ্বাস। এতদিনেও অস্পষ্ট হয় নি অক্ষরগুলো। বাড়িটার মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বইগুলোর মালিকানাও স্বাভাবিকভাবেই বদল হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই বাড়তি লাভটুকুর প্রতি, অর্থাৎ এই বইগুলোর প্রতি কোনো পরবর্তী মালিকের আগ্রহ দেখা যায় নি। যেমন ছিল বাড়িটা তেমনি কিনেছেন তাঁরা, আর যেমন ছিল তেমনি বিক্রি করেছেন। শশিশেখরের ধারণা কেউ কিছু সরায় নি এখান থেকে। সরালে যেন সে টের পেত, অনুভব করতে পারত।

আলমারিগুলো মহাদেও ঝেড়েমুছে রেখেছে। ওগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে খানিক আগেও শশিশেখর যেন একটা নীরব নিষেধ অনুভব করেছিল। সেই নিষেধ অমান্য করেই একটা আলমারি সে খুলেছিল তখন। সুন্দর মসৃণ কালো চামড়ায় মোড়া খাতার মত একটা লম্বা বস্তু চোখে পড়তে সেটা টেনে নেবার লোভ সংবরণ করতে পারে নি। অগোচরের সেই নিষেধ তখন যেন আরো বেশি উদগ্র হয়ে উঠেছিল। অথচ সেই নিষেধই প্রলোভন মনে হয়েছে —অমান্য করার প্রলোভন। কোনো সার্থকতার মর্মস্থলে পৌঁছানোর আগের শঙ্কা-মিশ্রিত প্রলোভনের মত। কালো চামড়ায় মোড়া খাতার মত জিনিসটার থেকে চট করে চোখ ফেরাতে পারে নি।

ওতেও নাম লেখা—ইন্দ্র বিশ্বাস। মনের তলায় একটা হাস্যকর অনুভূতি উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল। মনে হয়েছে, নাম নয়, নামের ওই মালিকই যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে সকৌতুক গাম্ভীর্যে চেয়ে আছে তার দিকে, হাসছে মিটি মিটি। খুলে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দেখে কৌতূহল চতুর্গুণ।

স্তব্ধ উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওটা দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল। ঘরের মাঝে মস্ত একটা টেবিল। টেবিলের হাত দুই উঁচুতে হল-ঘরের ছাদ থেকে মোটা দড়িতে বাঁধা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। এ-রকম একটা করে ঝাড়লণ্ঠন প্রায় সব ঘরেই আছে। পরবর্তী মালিকদের কেউ ইলেকট্রিক এনে থাকবেন। সব ঘরেই বিজলি আলো জ্বলে এখন। ঝাড়লণ্ঠনগুলো দর্শনীয় বস্তু হিসেবে আছে। পাণ্ডুলিপি হাতে শশিশেখর তখন ঝাড়লণ্ঠটার নীচে টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসেছিল। স্নায়ুগুলো কাঁপছিল। চেয়ার টানার শব্দে নিজেই বিষম চমকে উঠেছিল। আর, তারপর থেকে প্রতি পলে প্রতি মুহূর্তে ঘরের স্তব্ধতা বাড়ছিল, গুমোট বাড়ছিল। পাণ্ডুলিপিটা তখন উল্টেপাল্টে দেখছিল শশিশেখর। ঠিক পড়া বলে না। কোন একটা সম্পদ হাতে এলে উদগ্রীব মন যেমন সবটাই এক নজরে দেখে নিতে চায়, জেনে নিতে চায়, তেমনি হয়েছিল তখন তার মনের অবস্থা।

অথচ, কি-যে এটা সে সম্বন্ধে ধারণা ছিল না একটুও। অন্তস্তলের এই প্রতিক্রিয়াও নিজের কাছেই দুর্বোধ্য। এতবড় খতিয়ানের শেষের পাতাটা দেখে নেবার লোভ বেশিক্ষণ সংবরণ করতে পারে নি। ঝাঁকুনিটা খেয়েছিল তখনই।

আবার আমি আসব!

শেষের পাতার শেষের ওই তিনটে শব্দ। চরাচর বিশ্বের সকল গীতির বুঝি এটুকুই উপসংহার। সাধনা। সান্ত্বনা।

আবার আমি আসব!

॥ তিন ॥

এবারে শশিশেখর অনেক স্থির, অনেক শান্ত। পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা খুলে এবার সে স্থির হয়ে বসতে পারল। এবারে আর উত্তেজনা নেই, তাড়া নেই। কিন্তু পড়া খুব সহজ নয়, টানাটানা লেখা—চোখ বসতে সময় লাগে। লাগুক। শশিশেখর মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু পড়া হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত হলই না পড়া। কেবলই মনে হল, কালের সেতুর ওধারে একজনের জীবনের অন্দর মহলে প্রবেশ করার মত এটা অনুকূল অবকাশও নয়, পরিবেশও নয়।

শেষ পর্যন্ত রেখে দিল। যথাসময়ে পড়বে। এটা পড়ার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে।

ঝাড়লণ্ঠনটার ওপরে চোখ রেখে ভাবল কি। ওটার হারানো যৌবন, বিস্মৃত যৌবন ফিরিয়ে আনা দরকার মনে হল। নইলে এ-ঘরে বসা মানায় না, এই পাণ্ডুলিপি খোলা মানায় না। ক'টা বেজেছে এখন? সবে বিকেল। এ-সময় এ-ঘরে আসারই কোনো মানে হয় না। এটা যেন এই ঘরের ঘুমের সময়। ঘরটা রাতে জাগে। রাতে জাগবে। শশিশেখর তখন আসবে। বসবে। পড়বে। সেটাই সময়। অনুকূল অবকাশ, অনুকূল পরিবেশ।

পকেট হাতড়ে শশিশেখর সিগারেট বার করল। ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নতুন ক'রে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারই ঘর বাড়ি। এই শশিশেখরের। টাকা দিয়ে কিনেছে। এখানকার সবকিছু এই সবকিছু একেবারে নিজস্ব তার। ঘণ্টাখানেক আগেও তা মনে হয় নি। তখন মনে হয়েছিল, সে বুঝি আর কারো এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছে। কিন্তু এখন অন্তরতুষ্টিতে ভিতরটা ভরে ভরে উঠছে। এই বাড়িটা এই জন্মের মত শুধু তারই। তার পরে কার হবে জানে না। জীবিত

মানুষ যেমন মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেই নিজের নিজের মৃতদেহটা দেখতে পায়, শশিশেখরও তেমনি দেখছে, মৃত্যুর পরেও বাড়িটা এমনিই আছে—তারই আছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দেয়ালের গায়ে পুরনো আমলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং ছবি গোটাকয়েক। এগুলোও মহাদেও ঝাড়ামোছা করে রেখেছে। শশিশেখর তখন লক্ষ্য করে নি। এবারে এক-একটার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সব কটাই বিদেশী চিত্রকরের আঁকা। খুব সম্ভব কপি এগুলো। বিভিন্ন চিত্রকরের আঁকা বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ছবি। মিল নেই। কিন্তু ঠিক এই ছবিগুলিই বেছে বেছে টাঙিয়ে রাখার পিছনে একটা অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের মিল আছে বুঝি। তাই বিশ্লেষণ করে করে সাগ্রহে দেখছে শশিশেখর।

প্রথমেই চোখ গেছে যে ছবিটার দিকে, তাতে দাঁড়িয়ে স্খলিত-বাসনা যৌবনভারে বিড়ম্বিত গোটাকতক নারী মূর্তি—চোখে মুখে সর্ব অবয়বে উর্বশীর লাস্যভঙ্গি। তপ্ত যৌবনের পসারিনী তারা, তবু এ যৌবন যেন তারা বিলোতে আসে নি। একে তারা ধরে রেখেছে, আগলে রেখেছে। রেখে আর এক বিপরীত শক্তিকে সচেতন করে তুলতে চাইছে শুধু। তাদের এই চেষ্টা, এই যৌবন-ভার বহন সার্থক। বিস্ফারিত নেত্রে তাদের দেখছে একটি পুরুষ —তার সরল ডাগর দুই চোখে চেতনার প্রথম বিস্ময়ের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে লোভ আর বাসনার আলো। ওই মূর্তিমতী প্রলোভন সমুদ্রে সে যে নিঃশেষে হারিয়ে যাবে তাতে কোন ভুল নেই।

পরের ছবিটায় তিনটি নারীমূর্তি। আনন্দ সৌন্দর্য আর উজ্জ্বলতার প্রতীক তারা। তাদের চোখে মুখে ভঙ্গিতে কোনো তরল ইশারা নেই, তবু পুরুষের লোভের ভাণ্ডার যেন তাদেরই দখলে। তাঁদের দিকে দুই ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করে আছে বাসনা উন্মুক্ত কামদেব কিউপিড। কিন্তু রমণী তিনটির মনোভাব আশাপ্রদ নয়। তারা

আড়চোখে দেখছে আর সরে পড়াই নিরাপদ ভাবছে। ওদিকে কিউপিডও কম ধুরন্ধর নয়, তার হাতে অস্ত্র আছে—অমোঘ ফুলশর। তার মুখে মৃদুমন্দ হাসি, বলতে চাইছে, ভালো কথা শোনো তো শোনো, ফেরো, কাছে এসো—

এর পরের ছবিটিতে মৃগয়াদেবী ডায়না সঙ্গিনীদের নিয়ে শিকারের আনন্দে উল্লাসমত্তা। তাদের শিকারের স্তূপ দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। সেই হিংস্র উল্লাস তাদের চোখে মুখে অস্ত্রধারণে অঙ্গুলিসংকেতে। সমস্ত প্রাণীজগৎ তারা উজাড় করে তবে ক্ষান্ত হবে বুঝি। কিন্তু ডায়নার চোখের মত্ত হিংসা তারপরেও স্তিমিত হবে কী?

তার পরের দৃশ্যেই রমণী প্রাধান্যের অবসান। বিশাল দরজার এ পাশে দেয়ালজোড়া একটাই ছবি। রেপ অফ্ পলিক্সিনা আর রেপ অফ্ দি স্যাবাইনসএর দৃশ্য! সুন্দরী পলিক্সিনাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে ট্রয় যুদ্ধের দুর্দম নায়ক অ্যাচিলিস, আর, রোমনগর প্রতিষ্ঠাতা দুর্ধর্ষ রোমালাস হরণ করে নিয়ে চলেছে বিজিত স্যাবাইন কন্যাদের। রমণীরা প্রবল পুরুষ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু তাদের চোখে করুণ মিনতি। পুরুষের দোসর হতে আপত্তি নেই তাদের, তারা ব্যভিচারের দোসর নয়। এইটুকু মর্যাদা চায় তারা। কিন্তু পাবে কিনা সেই সংশয়।

বড় টেবিলের ডান ধারের দেয়ালের বিশাল অয়েলপেন্টিং দুটোর চিত্রকারুর তাৎপর্য বোধগম্য হলে ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ হবে হঠাৎ। ওই ছবিগুলোর পরে এই ছবি দুটো আকস্মিক দুটো ধাক্কার মত। একটা মার্সিয়াস ও অ্যাপলো। সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পরাজিত মার্সিয়াসের ভূপাতিত আঁধার-মূর্তি মর্মচ্ছেদী ত্রাসে সামনের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে আছে। যেন বাধা দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বাধা না মেনে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে অটুট সঙ্কল্পবদ্ধ সূর্যদেব অ্যাপলো। শর্তানুযায়ী পরাজিত মার্সিয়াসের গায়ের ছাল-চামড়া তুলে নেবেই সে।

দ্বিতীয় চিত্রটি মিলো অফ্ ক্রোটোনা। শৌর্য বীর্যের প্রতীক তিন-তিনবার ভুবনবিজয়ী বীর মিলো গেছে অরণ্যে গাছ কাটতে। কুঠারাঘাতে আধচেরা গাছের ফাঁকে হঠাৎ তার ডান হাত গেছে আটকে। এমন সময় পিছন থেকে কালান্তর যমের মত পশুরাজ সিংহ তাকে করল আক্রমণ। ভুবনবিজয়ী বীর মিলো অসহায়, কুঠার সহ চেরা গাছে আটকানো হাত নিয়ে পিছনের পশুরাজের সঙ্গে সে যুঝবে কেমন করে? ছবিটির তাৎপর্য স্পষ্ট, অর্থাৎ, যত বড় বীরই তুমি হও না কেন নিয়তির হাতে তুমি খেলার পুতুল মাত্র।

কিন্তু এই পরিবেশে সব থেকে বিস্ময়কর সংগ্রহ সম্ভবত চেয়ারের পিছনের দেয়ালচিত্রটি। সব লোভ কামনা দম্ভ সংঘাতের শেষে এই যেন শেষ আশ্বাস। সাওয়ার অফ্ গোল্ড—সোনার ধোঁয়া। রাজা টিণ্ডার জনমানবের অগম্য নিভৃত গুহায় বন্দিনী করেছে তার অনন্যা সুন্দরী কন্যাকে। কারণ, দৈববাণী ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজা টিণ্ডারকে হত্যা করবে এই কন্যার সন্তান। গুহার মধ্যে একাকী বসে আছে বিষাদক্লিষ্ট বন্দিনী রাজকুমারী। সহসা দেখা গেল শূন্য থেকে সোনার ধোঁয়া নেমে আসছে গুহার মধ্যে — তার থেকে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করছে দেবরাজ জুপিটার। এদের মিলনের সন্তান স্বেচ্ছাচারী রাজার দণ্ডদাতা ভুবনবিজয়ী পার্সিয়াস্।

এই ছবিগুলিই এখানে পরপর সাজিয়ে রাখার পিছনে একজনের একটা মানসিক সত্তার ধারা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে শশিশেখর। উপলব্ধি করছেও। এর ব্যাখ্যা চলে না, শুধু অনুভবই করছে।

হলঘর থেকে বেরিয়ে শশিশেখর সিঁড়ি বেয়ে পায়ে পায়ে উপরে উঠে এলো। মহাদেও চা নিয়ে অপেক্ষা করছে জানে। ঘড়ির কাঁটা ধরে সে নিজের কাজ করে, তারপর চুপচাপ প্রতীক্ষা করে। কারো চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায় না, তাগিদ দেয় না। কিন্তু

তার নীরব প্রতীক্ষাই তাগিদের মত। এই তাগিদেই শশিশেখরের পা দুটো যন্ত্রচালিতের মত সিঁড়ি ভাঙছে।···কিন্তু ভাবছে অন্য কথা। ভাবছে সময় হোক। সময় হলে আবার নামবে। সময় হলে আবার ওই ঘরে আসবে। 'সময় হোক। রাত হোক।

তখন ওই ছবিগুলো ও-ভাবে সাজানোর তাৎপর্য হয়ত আরো স্পষ্ট হবে।

ছবি ছবি ছবি ছবি—

অলকাকে ছবি তোলার নেশায় পেয়েছিল। যখন যাতে ঝোঁক চাপে তাই নিয়ে মেতে ওঠা নেশা তার। শশিশেখরের কত ছবি তুলেছে ঠিক নেই। কাজের শশিশেখর, অকাজের শশিশেখর, ব্যস্ত শশিশেখর, অলস, শশিশেখর, জাগ্রত শশিশেখর, ঘুমন্ত শশিশেখর, খুশির শশিশেখর, গোমড়া-মুখ শশিশেখর—কত শশিশেখর যে তার অ্যালবামে ছিল ঠিক নেই। অ্যালবামও একটা দুটো নয়, এক শশিশেখরকে নিয়েই গোটা তিনেক অ্যালবাম ভরে উঠেছিল।

কিছু বললে অলকা হাসত। বলত, তোমার সঠিক ছবিটা আজ পর্যন্ত তোলা হল না। একদিন ঠিক তুলব।

তুলেছে। শশিশেখর জানে তুলেছে। কিন্তু তার জন্যে কোনো ক্যামেরা দরকার হয় নি।

নিজের অগোচরে একটা বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতে শশিশেখর সচকিত হল। অদূরে মহাদেওর চোখে চোখ পড়তে চায়ের পেয়ালা টেনে নিল। অনুভূতিশূন্য নির্লিপ্ত চোখে মহাদেও তার দিকেই চেয়ে ছিল। তাকেই দেখছিল। ওর এই দেখার ধরনটা শশিশেখর জানে। ওই চোখ থেকে কিছুই এড়ায় না, নির্লিপ্ততার আড়ালে সদা জাগ্রত, সদা তৎপর। রাতে ঘুমোয় যখন, ওর নাকের ডাকে অস্থির কাণ্ড। একটা গর্জন ক্রমশ যেন পুষ্ট হতে থাকে। কিন্তু

কোথাও খুট করে একটু শব্দ হল কি ঘুমন্ত অবস্থা থেকে সোজা উঠে বসবে। এখন নয়, বরাবরই এই রকম।

ওকে নিয়েও অলকা কম হাসে নি। অলকা বলত, গত জন্মে ও অ্যালসেসিয়ান শ্রেণীর জীব ছিল। দিব্বি ভাল মানুষের মুখ, কিন্তু ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি কামড়ে ধরতে ওস্তাদ। ছবি তোলার ব্যাপারে ওকেও অব্যাহতি দেয় নি অলকা। কিছু মনে হতে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ডেকে উঠেছে, এই, এদিকে এসো—

মহাদেও এসেছে।

ওখানে দাঁড়াও। ওই ওখানে--

দাঁড়িয়েছে।

গম্ভীর মুখে অলকা একসঙ্গে দু'তিনটে করে ছবি তুলেছে। গম্ভীর মহাদেও-ও। যেন বউদিমণির কিছু একটা আদেশই পালন করা হল।

এবারে ওখানে, ওই দাদাবাবুর পিছনে গিয়ে দাঁড়াও!

মহাদেও আবারও হুকুম তামিল করেছে। শশিশেখর মনে মনে হয়ত বিরক্ত হয়েছে। হয়ত কিছু একটা কাজে ব্যস্ত সে। কিন্তু মহাদেওর সামনে অলকাকে কি আর বলবে। ওদিকে মহাদেও হয়ত কিছু একটা কাজ হাতে করে এসেছে। হাতের জিনিস সুদ্ধুই তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। দিনের বেলা হলে এমনিতেই ক্যামেরা চির-চির করে উঠল, রাতে হলে মুখের ওপর কয়েক দফা ফ্ল্যাশ বাল্‌ব ঝলসে উঠল।

পরে এনলার্জ ফোটো দেখিয়েও অলকা হেসে বাঁচে না। মুখের হাসিটাও ওর এক অবিচ্ছেদ্য ব্যাধির মত। মুখে লেগেই আছে। কারণে অকারণে এত হাসতে শশিশেখর কাউকে দেখে নি। রাগলে অবশ্য বিপরীত। তখন শরীরের সমস্ত লাল কণাগুলো একসঙ্গে মুখের ওপর ছোটাছুটি দাপাদাপি করতে থাকে। সেই লাল চোখের কোল পর্যন্ত ছড়ায়। কিন্তু রাগতে বড় দেখা যায় না। সর্বদা হাসি যেন ওর ভিতরেই তৈরি হতে থাকে। মহাদেওর ছবি

দেখিয়ে হাসি সামলে মন্তব্য করে, দাঁড়িয়ে আছে দেখো, যেন নন্দী ভৃঙ্গীর একজন।

শশিশেখর বলেছে, বাঁচা গেল, শিব তাহলে আমি।

অলকা বলত, তুমি কলির শিব, টাকা ছাই করো, টাকার ছাই গায়ে মাখো আর টাকার মন্ত্র জপো।

বলেই পালাতো সেখান থেকে। নইলে হিসেবে পটু শশিশেখর তক্ষুনি হিসেবের মধ্যে টেনে আনবে অলকাকে। ধরে বেঁধে তাকে বসিয়ে কে কত বাজে খরচ করে তার চুলচেরা হিসেব নিয়ে বসবে।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে শশিশেখর। অলকা এখনো তেমনি হাসে? শশিশেখর জানে না। এখন অনেক কিছুই জানে না শশিশেখর। অলকার এই ছবি তোলার ঝোঁকের ব্যাপারও আজকের নয়। অনেক দিনের স্মৃতি ওটা! শেষের দিকের কতগুলো বছর তো ক্যামেরা ছুঁতেও দেখে নি। এই নেশা গোড়ার দিকে ছিল, শশিশেখরের উঠতি দিনের গোড়ার দিকে। সেই সময় মাকে অর্থাৎ শাশুড়ীটিকেও রেহাই দেয় নি অলকা। বুড়ো মা তার সঙ্গে পারবেন কেন। অলকা খেয়ালখুশি মত তাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে বসিয়েছে, ইচ্ছেমত ছবি তুলেছে। পূজোর ঘরে কতদিন জপমগ্ন তন্ময়তার মধ্যে বিষম চমকে উঠেছেন তিনি। চমকে উঠেছেন অলকার বিনা নোটিসে ফ্ল্যাশ বাল্‌বের ঘায়ে। বিরক্ত হতে গিয়েও মা হেসেই ফেলতেন। অমন রাশভারী মহিলাও হাল ছেড়ে আত্মসমর্পণ করতেন যেন।

অলকা সেই সব ছবিও তাকে এনে দেখাত। বলত, দেখো দেখো, সব দেখে রাখো—কোন্ মায়ের ছেলে দিনকে দিন কি হচ্ছ দেখে রাখো—তোমার ঠিকমত একটা ছবি আজও তোলা হল না।

অথচ এই ছবি তোলার নেশা অলকার আগে ছিল না। সব থেকে আশ্চর্য, বলতে গেলে এই নেশাটা ছিল বরং শশিশেখরেরই।

তাও গোড়ায় শুধু ক্যামেরাই ছিল, নেশা ছিল না। নেশা ধরেছিল অলকা আসার পর। সেই নেশার ঝোঁক আপনিই আবার কবে একদিন কমে এসেছে টেরও পায় নি। অলকাকে ছবি তুলতে সে-ই শিখিয়েছিল। পরে অবশ্য তার থেকে অনেক ভালো ছবিই তুলত, কিন্তু প্রথম শিক্ষাগুরু সে-ই।

চায়ের পেয়ালা তাড়াতাড়ি খালি করে দিল। মহাদেওর সামনে বসে কিছু ভাবতেও অস্বস্তি। বিশেষ করে যে-কথা আর যে-মিল মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। পেয়ালা আর সরঞ্জাম নিয়ে মন্থর পায়ে মহাদেও প্রস্থান করল। শশিশেখর সিগারেট ধরালো।

...সেই অ্যালবামটা কি শশিশেখর এনেছে? না, সেটাও কলকাতাতেই পড়ে আছে। শশিশেখর কিছুই আনে নি। সব ফেলে এসেছে। সবই ফেলে আসতে চেয়েছে। কিন্তু কিছুই যে ফেলে আসা হয় নি এ আর তার থেকে ভালো কে জানে? গোপনে অলকার সাদামাটা একখানা ছবি শুধু এনেছে। তাও ট্রাঙ্কের একেবারে তলায় আছে। মহাদেওর চোখে পড়তে পারে এই সঙ্কোচে বারও করতে পারে নি। কিন্তু সেই অ্যালবাম কলকাতায় পড়ে থাকলেও তার কোন্ ছবিটা এখন শশিশেখরের চোখে ভাসছে? সেই অ্যালবামের ছবিগুলো অলকার তোলা নয়। অলকার ছবি। তার নিজের তোলা। এতদিন তো ওগুলোর কথা মনে পড়ে নি শশিশেখরের, আজ নিচের হলঘরের ছবিগুলো দেখে—বিশেষ করে নারী মূর্তির ছবিগুলো দেখে সেই ছবিগুলো একে একে চোখের সামনে ভিড় করে আসছে কেন তার?

অলকা ওভাবে ছবি তুলতে দিতে চাইত না। কোনো মেয়েই চায় না। কিন্তু শশিশেখর না-ছোড়। রমণীর অনাবৃত সৌন্দর্য স্থিরতার অন্তঃপুরে বন্দি করার ঝোঁকে সে অনেক সময় হামলাই করত। রাগ করত, অভিমান করত, অনুনয় করত আবার জুলুমও করত। পরে, অনেক পরে অলকা বলত শশিশেখরের ঠিক ছবিটা

নিজেকে দু'খানা করে তার শক্তির হাতখানা গ্রাস করেছে। এই নিয়তিরূপিণীকে দেখছে শশিশেখর। আর নির্মম পশুরাজকে দেখছে ঘাড় ফিরিয়ে। সব শেষ হবার আগে শেষবারের মতই দেখে নিচ্ছে। ক্ষুধার্ত হিংস্র-ভয়াল এই মুখও বড় বেশি চেনা শশিশেখরের।

কিন্তু তাহলে? তাহলে দেবগুরু বৃহস্পতির সেই আবির্ভাব কি মিথ্যা? গুহা-গহ্বরে বন্দিনী রাজকুমারীর সন্নিধানে জুপিটার কি সত্যিই আসে নি? আসবে না? তবু স্বর্ণ ধোঁয়া দেখছে কেমন করে তাহলে? পাওয়ার অফ গোল্ডের এ প্রতিশ্রুতি কিসের?

আবার আমি আসব!

এবারে যা হল না, এই জন্মে যা হল না, তা আর একবার হবে, বারান্তরে হবে। বক্ষের গুহাগহ্বরে বন্দিনী রাজনন্দিনীর কাছে দেবগুরু আসবে। তাদের মিলনের শিশু ভূমিষ্ঠ হবে। আর আলোর খড়্গে এ আঁধার মহিষ দ্বিখণ্ডিত হবে।

…হবেই। আবার আমি আসব!

॥ চার ॥

অলকা বলত, তোমার মত এমন বিচ্ছিরি লোক দু'জন দেখিনি, আগে কি ছিলে আর এখন দিনকে দিন কি হচ্ছ, যখন যে নেশায় পেয়ে বসে—

অলকার রাগের কারণ শশিশেখর জানত। তাই মনে মনে সে হাসত শুধু। এখন শুধু শশিশেখরের কাজের নেশাটা দেখছে অলকা। তার কাজের নেশা মানে টাকার নেশা। বিত্তের নেশা। কিন্তু শশিশেখর জানে এটা তার নতুন নেশা কিছু নয়। এই তৃষ্ণা তার কত দিনের অলকা জানে না। মন পরিণত হবার আগেই নিষ্ঠুর বাস্তবের অনেক ঝড় ঝাপটা তার ওপর দিয়ে গেছে। মানুষের

লাভ দেখেছে, হিংসা দেখেছে। কতবার অস্তিত্বের ক্ষীণ আশাটুকুও প্রতিকূল হাওয়ায় নিভু নিভু প্রদীপ শিখার মত কেঁপেছে। দুলেছে। নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে। শিরায় শিরায় তখন একটাই সংকল্পের স্রোত বইত তার। নিজের পায়ে দাঁড়াবে, শক্ত মাটির ওপর শক্ত দুই পা ফেলে দাঁড়াবে। সে যে দাঁড়িয়েছে সেটা সংকোচে বিস্ময়ে চোখ চেয়ে দেখবে সকলে—দেখবে তার আত্মীয় পরিজন জ্ঞাতিরা।

কিন্তু অলকা সেসব কিছু জানে না। অলকা সেই দিন দেখে নি। অলকা সেই দিনের শশিশেখরকে দেখে নি। সেই দিনের কথা কানে শুনেছে শুধু। কিন্তু সে শোনা গল্প-কথা শোনার শামিল। শশিশেখরের তাই ধারণা। না শশিশেখর বদলায় নি। কিছুদিনের জন্য তার নেশা বদল হয়েছিল শুধু। বিত্তের তৃষ্ণার ওপর রূপের ঝকমকে ছায়া পড়েছিল। তার আশপাশে রূপদখলের খেলা চলছিল একটা। সেই খেলায় শশিশেখরও মেতেছিল। অলকা শুধু এই নেশাটাই দেখেছে। এখন যে লোকটা তার মনের ঘরে ফিরেছে তা অলকা জানবে কি করে? তাই তার ক্ষোভ, অসহিষ্ণুতা।

কিন্তু মনে মনে অন্তত শশিশেখর অলকার অভিযোগ স্বীকার করে না। করে না বলেই হাসতে পারে। রূপের লোভ, রূপের তৃষ্ণা তার যেমন ছিল তেমনি আছে। উল্টে তার ঘরের রূপকে মর্যাদায় আর নিশ্চয়তায় প্রতিষ্ঠিত করার দিকে ঝোঁক এখন। এই ঝোঁকের পিছনে দু'জনে ইন্ধন জুগিয়েছেন। পরোক্ষভাবে তার মা, প্রত্যক্ষভাবে তার শ্বশুর। বিত্তের আলোয় যাদের চোখ ঠিকরে দিতে চেয়েছে শশিশেখর, তাদের সংখ্যা একজন বেড়েছে। তিনি শশিশেখরের শ্বশুর, অলকার বাবা। তিনি বিনম্র, পরিতুষ্ট এখন। জামাইয়ের অনুগতও বলা যায়।

অলকার ধারালো অনুযোগে শশিশেখর যে মনে মনে হাসতে পারে তার আরো একটা কারণ আছে। কিন্তু সে কারণটা অলকার

মুখের ওপর বলা যায় না। ছেলেবেলা থেকে অলকাও বিশেষ একটা নেশায় অভ্যস্ত, সেটা স্তুতির নেশা। রূপের স্তুতি, সৌন্দর্যের স্তুতি। শশিশেখর পাকা যোগানদার। প্রথম একটা বছর যে কি করে কোথা দিয়ে কেটে গেছে অলকা টেরই পায় নি। অথচ ওই একটা বছরই শশিশেখরের সঙ্কটের কাল গেছে। অলকার স্বপ্ন খান খান হয়ে ছুটতে পারত, ভাঙতে পারত। সত্য মিথ্যেয় মেশানো একটা ভিতের ওপর তাকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে দেখে এ সংসারের শান্তি সে তছনছ করে দিতে পারত, সবই লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা হয় নি, অলকা তা করে নি। সব জানার পর আর সব বোঝার পর অলকা ভয়ানক হেসেছে, বেদম হেসেছে।

অদ্ভুত হাসতে পারে অলকা।

কিন্তু শশিশেখরের ধারণা, অলকার ওই হাসির পিছনে তারও কিছু কেরামতি আছে। সুদক্ষ স্তুতির কেরামতি। প্রাণের জোয়ারে হৃদয় মন ভরাট করে তুলতে পারলে বাইরের ঘাটতি অনেক সময় উপেক্ষা করানো যায়। যায় যে, শশিশেখর তার নিজের জীবনেই প্রমাণ পেয়েছে। নইলে নিজের শ্বশুরটিই তাকে ধোলাইয়ের পাটায় ফেলে বেশ করে আছড়ে দেবার উপক্রম করেছিলেন। কন্যার সায় থাকলে দিতেনও। কিন্তু কন্যাটিই বাদ সেধেছে। দরকার মত বাপকে গিয়ে উল্টে চোখ রাঙিয়ে এসেছে। ফলে শশিশেখর শান্তিতে নিজের কাজে মন দিতে পেরেছে। সত্য-মিথ্যেয় মেশানো ভিত থেকে মিথ্যার খাদ নির্মূল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তার আবাল্যের সঙ্কল্প চতুর্গুণ জোরালো হয়ে উঠেছে। অলকাকে যে স্বপ্নের মধ্যে এনে দাঁড় করানো হয়েছে—তাও সত্যে পরিণত করতে হবে। নইলে অলকার পুরস্কার কি হল? তারই বা পুরুষকার থাকল কোথায়?

শশিশেখরের দৃঢ় বিশ্বাস, অলকার কাছ থেকে সে একটুও সরে আসে নি। অলকার প্রতি তার টান তেমনি আছে। শুধু স্তুতির

অবকাশে ঘাটতি পড়ছে একটু। তার কাজের চাপে অলকা মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ বোধ করে বলেই এই অভিযোগ। কিন্তু শিগগীরই কোনো অভিযোগ থাকবে না। তাছাড়া, এও ঠিক অভিযোগ বলে মনে করে না সে। ভরা-নদীর কলোচ্ছ্বাসের মত একটু বিরাগের সুর না বাজলে জীবন নীরস। তাই অলকার টিপ্পনীর জবাবে সেও হাসিমুখে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে ছাড়ে নি। বলেছিল, তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলবেন, এমন লোক আর এমন জামাই দুটি হয় না।

কথাটার মধ্যে ইচ্ছাকৃত খোঁচা ছিল না। কিন্তু খোঁচা ছিল। অনেক কাল পর অলকার বাবা পড়ন্ত অবস্থা থেকে শেষে জামাইয়ের ঐশ্বর্যের নোঙর ধরে আজ ডাঙায় বিচরণ করছেন।

···অবশ্য এই মেয়ের বিনিময়ে নোঙর তিনি আরো অনেক ধরতে পারতেন। বেচারী অলকার প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ প্রেমিকের সংখ্যা যে কতয় দাঁড়িয়েছিল, সে-ও নিজেও ভালো জানে না। ইস্কুলের বাসর আমল থেকে কলেজের বাসের কাল পর্যন্ত কত প্রত্যাশী আর তৃষ্ণার্ত চোখের আকুতি তাকে কাটিয়ে উঠতে হয়েছে ঠিক নেই। প্রগলভ, নিরিবিলি অবকাশে শশিশেখর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে আর অলকা বলেছে। অলকার মনে মুখে লাগাম নেই। বলেছে আর হেসে গড়িয়েছে।

ইস্কুলে পড়ত যখন ফ্রক পরত। সেই তখন থেকে পাড়ার ছেলের দল ফুল জোগাত তাকে। স্তুতির ফুলও। অলকা ফুল ভালবাসে এ কেমন করে কোথা থেকে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ছেলের দল কাড়াকাড়ি রেষারেষি করে কোথা থেকে যে ভালো ভালো ফুল নিয়ে আসত অলকা ভেবে পায় না। মাঝে মধ্যে বে-পাড়ার নতুন কলেজে পড়া ছেলেরাও নানা কৌশলে ওকে ফুল দেবার ফিকির খুঁজত। অলকা ভাবত কেন এত আগ্রহ ওদের। সঠিক উপলব্ধি না করলেও কারণ জানত। ইস্কুলের মেয়েরা ঈর্ষাভরা চোখে তার দিকে চেয়ে থাকত, দিদিমণিরা আড়ালে নিজেদের মধ্যে ওর রূপের

মুখের ওপর বলা যায় না। ছেলেবেলা থেকে অলকাও বিশেষ একটা নেশায় অভ্যস্ত, সেটা স্তুতির নেশা। রূপের স্তুতি, সৌন্দর্যের স্তুতি। শশিশেখর পাকা যোগানদার। প্রথম একটা বছর যে কি করে কোথা দিয়ে কেটে গেছে অলকা টেরই পায় নি। অথচ ওই একটা বছরই শশিশেখরের সঙ্কটের কাল গেছে। অলকার স্বপ্ন খান খান হয়ে ছুটতে পারত, ভাঙতে পারত। সত্য মিথ্যের মেশানো একটা ভিতের ওপর তাকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে দেখে এ সংসারের শান্তি সে তছনছ করে দিতে পারত, সবই লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা হয় নি, অলকা তা করে নি। সব জানার পর আর সব বোঝার পর অলকা ভয়ানক হেসেছে, বেদম হেসেছে।

অদ্ভুত হাসতে পারে অলকা।

কিন্তু শশিশেখরের ধারণা, অলকার ওই হাসির পিছনে তারও কিছু কেরামতি আছে। সুদক্ষ স্তুতির কেরামতি। প্রাণের জোয়ারে হৃদয় মন ভরাট করে তুলতে পারলে বাইরের ঘাটতি অনেক সময় উপেক্ষা করানো যায়। যায় যে, শশিশেখর তার নিজের জীবনেই প্রমাণ পেয়েছে। নইলে নিজের শ্বশুরটিই তাকে ধোলাইয়ের পাটায় ফেলে বেশ করে আছড়ে দেবার উপক্রম করেছিলেন। কন্যার সায় থাকলে দিতেনও। কিন্তু কন্যাটিই বাদ সেধেছে। দরকার মত বাপকে গিয়ে উল্টে চোখ রাঙিয়ে এসেছে। ফলে শশিশেখর শান্তিতে নিজের কাজে মন দিতে পেরেছে। সত্য-মিথ্যেয় মেশানো ভিত থেকে মিথ্যার খাদ নির্মূল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তার আবাল্যের সঙ্কল্প চতুর্গুণ জোরালো হয়ে উঠেছে। অলকাকে যে স্বপ্নের মধ্যে এনে দাঁড় করানো হয়েছে—তাও সত্যে পরিণত করতে হবে। নইলে অলকার পুরস্কার কি হল? তারই বা পুরুষকার থাকল কোথায়?

শশিশেখরের দৃঢ় বিশ্বাস, অলকার কাছ থেকে সে একটুও সরে আসে নি। অলকার প্রতি তার টান তেমনি আছে। শুধু স্তুতির

অবকাশে ঘাটতি পড়ছে একটু। তার কাজের চাপে অলকা মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ বোধ করে বলেই এই অভিযোগ। কিন্তু শিগগীরই কোনো অভিযোগ থাকবে না। তাছাড়া, এও ঠিক অভিযোগ বলে মনে করে না সে। ভরা-নদীর কলোচ্ছ্বাসের মত একটু বিরাগের সুর না বাজলে জীবন নীরস। তাই অলকার টিপ্পনীর জবাবে সেও হাসিমুখে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে ছাড়ে নি। বলেছিল, তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলবেন, এমন লোক আর এমন জামাই ছুটি হয় না।

কথাটার মধ্যে ইচ্ছাকৃত খোঁচা ছিল না। কিন্তু খোঁচা ছিল; অনেক কাল পর অলকার বাবা পড়ন্ত অবস্থা থেকে শেষে জামাইয়ের ঐশ্বর্যের নোঙর ধরে আজ ডাঙায় বিচরণ করছেন।

···অবশ্য এই মেয়ের বিনিময়ে নোঙর তিনি আরো অনেক ধরতে পারতেন। বেচারী অলকার প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ প্রেমিকের সংখ্যা যে কতয় দাঁড়িয়েছিল, সে-ও নিজেও ভালো জানে না। ইস্কুলের বাসর আমল থেকে কলেজের বাসের কাল পর্যন্ত কত প্রত্যাশী আর তৃষ্ণার্ত চোখের আকুতি তাকে কাটিয়ে উঠতে হয়েছে ঠিক নেই। প্রগলভ, নিরিবিলি অবকাশে শশিশেখর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে আর অলকা বলেছে। অলকার মনে মুখে লাগাম নেই। বলেছে আর হেসে গড়িয়েছে।

ইস্কুলে পড়ত যখন ফ্রক পরত। সেই তখন থেকে পাড়ার ছেলের দল ফুল জোগাত তাকে। স্তুতির ফুলও। অলকা ফুল ভালবাসে এ কেমন করে কোথা থেকে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ছেলের দল কাড়াকাড়ি রেষারেষি করে কোথা থেকে যে ভালো ভালো ফুল নিয়ে আসত অলকা ভেবে পায় না। মাঝে মধ্যে বে-পাড়ার নতুন কলেজে পড়া ছেলেরাও নানা কৌশলে ওকে ফুল দেবার ফিকির খুঁজত। অলকা ভাবত কেন এত আগ্রহ ওদের। সঠিক উপলব্ধি না করলেও কারণ জানত। ইস্কুলের মেয়েরা ঈর্ষাভরা চোখে তার দিকে চেয়ে থাকত, দিদিমণিরা আড়ালে নিজেদের মধ্যে ওর রূপের

কথা বলত। মোটকথা, অলকা তখন অত তলিয়ে কিছু না বুঝলেও বেশ আনন্দ হত তার।

কলেজের কালে ছেলেদের সঙ্গে তরুণ শিক্ষকদের তো বেশ একটা রেষারেষি অনুভব করত সে। কোনদিন কলেজ কামাই হলে সহপাঠিনীরা তাকে জানাতো কোন্ প্রফেসারের সেদিন ক্লাস নেওয়া মাটি হয়েছে। কোন্‌জন তার বসার শূন্য স্থানটির দিকে চেয়ে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পড়ানো শেষ করেছে। আর সেই সঙ্গে ক্লাসের অর্ধেক ছাত্রের প্রক্সি দিয়ে পালানোর কথা তো শুনবেই। অলকার তখনো ভালো লাগত, কিন্তু লজ্জা করত। যাতায়াতের পথে কলেজের গেটে, ক্লাসের সামনে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছেলেদের প্রতীক্ষা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। কখনো হাসি পেত, কখনো রাগ ধরত।

য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকে তো বেশিদূর এগনোই গেল না। একদিন বাড়ি ফিরে ঘোষণা করল, আর সে কলেজে যাবে না, বাড়ি থেকে বেরুবে না—কিচ্ছু করবে না। বাবা সদা ব্যস্তসমস্ত মানুষ। তিনি বুঝে হোক বা না বুঝে হোক এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি। আর বাড়ির অন্য লোককে আমলেই আনে না অলকা। তাই পড়ায় ইস্তফা দেবার কৈফিয়ত কাউকে দিতে হয় নি। কিন্তু শশিশেখর সেই তথ্যও আদায় করেছে। য়ুনিভার্সিটির ছেলেরা বেশ অ্যাডাল্‌ট প্রেমিক ভাবত নিজেদের। তারা কলেজের ছেলেদের মত অত হ্যাংলামো করত না—পড়াশুনার বিষয়, সোস্যাল ফাংসন ইত্যাদির রাস্তা দিয়ে কাছে আসত, কাছে আসতে চেষ্টা করত। তাই মোটামুটি নিরুপদ্রবে কাটছিল। কিন্তু একবার এক ছেলে —যাকে বেশ হোমরাচোমরা বলিষ্ঠ ছেলে ভাবত, সে কি কাণ্ডই না করে বসল। খুব দরকারী কি কাজের কথার অজুহাতে তাকে সকলের চোখের আড়ালে ডেকে এনে একেবারে হাউ মাউ করে কান্না। কিছু বিপদ হয়েছে ভেবে অলকা হকচকিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। সেই বিমূঢ় অবস্থার ফাঁকে ছেলেটা তার পায়ের ওপর

লুটিয়ে পড়ল একেবারে। অলকা তখন বুঝল কোন বিপদ ছেলেটার।

সে সরে আসতেই পুরুষকারে ঘা লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে সে আলটিমেটাম দিলে। এক মাসের মধ্যে হয় সে অলকাকে বিয়ে করবে নয়তো আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা করার আগে সমস্ত খবরের কাগজে লিখে যাবে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে—কার প্রেমে বঞ্চিত হয়ে সে এই পথ বেছে নিল। এর পরে যেন অলকা আর কারো ঘরে গিয়ে সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে—তাকে ভুলে যায়। যে ভাবে আর যে পরিস্থিতিতে ছেলেটা বলেছিল কথাগুলো, অলকা দস্তুরমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর বাড়ি ফিরেই সেই ঘোষণা। শশিশেখর জিজ্ঞাসা করেছিল, ছেলেটার কি হল, সত্যিই আত্মহত্যা করে বসল কি না। শুনে অলকার আবার সে-কি হাসি। হাসি থামতে বলেছিল, আত্মহত্যাই করেছে, তবে একমাস বাদে নয়, চারমাস বাদে। আমি তো আর তারপর থেকে য়ুনিভার্সিটিতে যাইনি, বাড়িতে নেমন্তন্ন, চিঠি পেয়েছি। ক্লাসের এক মেয়ের চিঠি—বিয়েতে অবশ্য যেতে হবে। বিয়ে সেই ছেলের সঙ্গে।

একটি মাত্র রূপসী মেয়ে যে কত বড় সম্বল, ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক অলকার বাবাও তা উপলব্ধি করেছিলেন। মেয়ে তার পড়া ছেড়েছে বলে সত্যিই ঘরে তালা বন্ধ হয়ে বসে থাকে নি। অভিজাত ক্লাবের সভ্য সে, ক্লাবের অন্য সভ্যরাই তাকে বাড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তার অনুপস্থিতিতে না থিয়েটার হয়, না নাচের আসর বসে, না চ্যারিটি রিলিফের চাঁদা ওঠে। ছেলের দল বিয়ের আবেদন সহ নিত্য ধরনা দেয়, ছেলেদের মুখপাত্র হয়ে তাদের বাবারাও।

এ ব্যাপারেও অনেক মুখরোচক কাহিনী শুনেছে শশিশেখর। অলকা শোনানোর জন্যে বলে নি। কখন কোন্ কথার ফাঁক দিয়ে যে শশিশেখর এক-একটা প্রহসন শুনে নিয়েছে অলকা ভালো করে

টেরও পায় নি। বলার পর লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু শশিশেখরের ভারি ভালো লাগত শুনতে। বিশেষ করে হাসিতে খুশিতে রাগে অনুরাগে অলকার বলার ধরনটা। ওর বিব্রত হাসিসিক্ত মুখখানা এক-একসময় এমন সুন্দর কুঁচকে কুঁচকে যেত, যে শশিশেখর চোখ ফেরাতে পারত না। কিন্তু অলকার ধারণাও নেই যে এ-সব হাসি-খুশির গল্প শশিশেখর একা হজম করছে না। সে আবার তার ভাগ দিচ্ছে আর একজনকে। দিব্যেন্দুকে। এই সব গল্পই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শশিশেখর দিব্যেন্দুর কাছে করত। দিব্যেন্দু শুনত, আর মুখ টিপে হাসত।

শশিশেখরের বুক ঠেলে আর একটা তপ্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। যা হবার তাই হয়। হবে বলেই এক-একটি বিশেষ মানুষের সঙ্গে এক-একজনের যোগ। ভাগ্য বিধাতা লক্ষ কোটি হাতে কাজ করেন। এই দিব্যেন্দুর শক্ত দুই হাত দিয়ে তিনি তার জীবনের নৌকোর হাল ধরে রেখেছিলেন। ভরা পালের বাতাস নিয়ে নৌকোটা খর বেগে ছুটছিল। শশিশেখর নিশ্চিন্ত ছিল, নৌকোটা জীবনের খাল বিল মোহনা পেরিয়ে, নদ নদী উপসাগর ছাড়িয়ে একদিন উদ্দাম সাগরের ঢেউয়ে নাচবে।

তাই হয়েছে। তাই তো হয়েছে। জীবনের এ সমুদ্র অনেক বড়। এর গর্ভে অনেক রত্ন। জলটা শুধু লবণাক্ত।

দিব্যেন্দু তার ভাগ্য নিয়ন্তা। ভাগ্যের সোনার চূড়ো দেখিয়েছে। ভাগ্যের পাতালও দেখিয়েছে। শশিশেখর যেটা খুশি বেছে নিতে পারে। দিব্যেন্দুর কোনটাতেই আপত্তি নেই। সে বিধাতার দুই হাতে কাজ করছে। বিধাতার মতই নির্বিকার।

সে-ই তাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। তার আড়ম্বরশূন্য অমোঘ শক্তির ছোঁয়ায় সে শশিশেখরের সুপ্ত শক্তি জাগিয়ে তুলেছিল। বলতে গেলে সে-ই অতি সহজে অলকাকে তার অন্তঃপুরে পৌঁছে দিয়েছিল।

কিন্তু তার আগে অনেক কথা। তার আগে শশিশেখরের

সংসারের চিত্রটি অন্যরকম ছিল—দিব্যেন্দুর সংসার বলে কিছু ছিল না—কিন্তু তারও দিন যাপনের চিত্রটা ভিন্নই ছিল।

এই পর্যায়ে যাঁর ইচ্ছার বেগ শশিশেখরের মনে প্রভাব বিস্তার করেছে, তিনি তার মা। শুধু তারই মা বললে ঠিক হবে না হয়ত—দিব্যেন্দুরও মায়ের মত।···দিব্যেন্দু বোস, শশিশেখরের মামাতো ভাই। মায়ের ছোট ভাইয়ের ছেলে। শশিশেখরের সহপাঠী, সমবয়সী। শশিশেখরের থেকে দুই এক মাসের ছোট।

মা ছিলেন বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বউ। বড় ঘর ভেঙে ভেঙে ক্রমশ ছোট হয়েছে, কিন্তু মায়ের বনেদী মেজাজ খাটো হয় নি একটুও। শশিশেখরেরা তিন ভাই। বড় দু'জন অনেক বড় তার থেকে। মাঝে দুটো বোন ছিল, তারা আর নেই। বড় ভাইয়েরা একান্নবর্তী পরিবারের বাবা কাকার ধারায় মানুষ। কেবল শশিশেখরই মায়ের ছেলে। তার পাঁচ বছর বয়সে বাবা মারা যান। বাবাকে মনেও পড়ে না।

কাকাকে মা স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন। দু'জনে সমবয়সী। ছেলে বেলায় ঝগড়া-ঝাঁটি করেছেন, মান-অভিমান করেছেন, আবার ভাব করেছেন। বাবা যখন মারা যান তার কিছু আগে থেকেই একান্নবর্তী পরিবারের সচ্ছলতায় টান ধরেছিল। কাকার উদারতায়ও। তার আধিপত্য বরদাস্ত করতে মায়ের আপত্তি ছিল না যদি তা স্বার্থশূন্য হত। মা তাঁকে সম্পত্তি ভাগ করে পৃথক হওয়ার ব্যবস্থা করতে বললেন। কাকা সেই প্রস্তাব নাকচ করলেন। দাদারা ভয়ে আর কাকার মন রাখার জন্য মাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন। শশিশেখরকে নিয়ে মা সেই সংসার থেকে সরে দাঁড়ালেন। দাদারা এলেন না। মা-ও তাঁদের আসতে বললেন না।

কিন্তু মা সেই মেয়ে যিনি সরে দাঁড়ালেও হাল ছাড়তে জানেন না। তিনি না-বালক ছেলের অংশ দাবি করলেন। আর যে নামমাত্র অংশ পেলেন তা অপমানেরই নামান্তর। কোর্টে কেস উঠল।

একটি একটি করে গায়ের গয়না বিক্রি করে কেস্ চলতে লাগল। অবশ্য এই সময় বাবার এক শুভার্থী আইনজীবী বন্ধুর সহায়তা পেয়েছিলেন মা। তাতেই খরচের কিছু সুরাহা হয়েছিল। ছোট ছেলেকে নিয়ে মা তাঁর বাড়িতেই এসে উঠেছিলেন। শুধু ভদ্রলোক নন, তাঁর স্ত্রীও মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করত।

একে-একে দু'বছর গেল। কেসের তখনো মীমাংসা হয় নি। কাকা অমন এক জোরালো লোকের খপ্পরে পড়বেন ভাবেন নি হয়ত। বড় ভাইদের আরো বিসদৃশ অবস্থা। তাঁরা নিজেদের স্বার্থেই মাকে বুজিয়ে সুজিয়ে শান্ত করার জন্য দু'চারবার এসেছেন। মা তাঁদের সঙ্গে দেখাও করেন নি।

কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎই ওপরওলার দরবারে আর এক মামলার ফয়সালা হয়ে গেল। মাত্র পাঁচ দিনের জ্বরে কাকা চোখ বুজলেন। কোর্টের মামলার নিষ্পত্তি করার সুযোগ তিনি আর পেলেন না। এখানকার বোঝা এখানেই পড়ে থাকল। যে দিন কাকা মারা গেলেন সেই দিন সকালে খবরটা শুনলেন মা। শুনে স্তব্ধ পাথরের মত বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

তারপর উঠলেন এক সময়। বললেন, আমি যাব, নিয়ে চল্—

শশিশেখরের কাঁপুনি ধরেছিল। কেস্ কাকার সঙ্গে চললেও সে আসলে ভয় করত কাকিমাকে। মহিলার রসনা ছুটলে কাকাকে পর্যন্ত পালাবার পথ খুঁজতে হত। দাদারাও ধারে কাছে থাকত না। শশিশেখর ধরে নিয়েছিল, মা-কে দেখামাত্র কাকিমা গলা ছেড়ে গালিগালাজ বকাবকি শুরু করবেন। এমন কি কাকার মৃত্যুর জন্যে মা-কে দায়ী পর্যন্ত করবেন হয়ত। কাকার যত অশান্তির কারণ তো মা-ই।

কিন্তু অপরিণত বুদ্ধি শশিশেখরের সে-দিন বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। মা-কে সেদিন বড় বিচিত্র-রূপিণী মনে হয়েছিল তার। মনে হয়েছিল, মা যেন কি এক অজ্ঞাত শক্তির আধার। মা গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র বাড়ির সকলকে সচকিত হতে দেখেছে। এমন

কি বাড়ির দাসদাসীদেরও। অথচ, মনে মনে তাঁকে যেন সকলে প্রত্যাশাও করেছিল। কাকিমা দু'চোখ টান করে মা-কে দেখেছিল। শশিশেখরের সেটা সংসার মনস্তত্ত্ব বোঝবার বয়স নয়। তবু তার মনে হয়েছে, রাগ বিদ্বেষ দূরে থাক, কাকিমার চোখে যেন এক দুর্বোধ্য ভয় দেখেছে সে। উল্টে মা-ই যেন তাঁর দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

মা দু'সপ্তাহ ছিলেন ওই বাড়িতে। সেই দু'সপ্তাহে কাকিমার সঙ্গে মায়ের দশটা কথাও হয়েছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু মা যেন তাঁকে বুকে করে ছিলেন সর্বক্ষণ। শশিশেখরের খুশি ধরে নি। সেই শান্ত পরিণাম দেখে কাকার মৃত্যুটাও খুব অবাঞ্ছিত মনে হয় নি তার। মা হাল ধরেছেন। মা-ই বাড়ির কর্ত্রী। মায়ের কথা সকলে শুনছে। মায়ের ব্যবস্থামত কাকার কাজ হয়ে গেল। এর পরেও এই ভাবেই চলবে—ছোট্ট শশিশশেখর কি নিশ্চিন্তই না বোধ করেছিল।

তার পরেই সে বিস্ময়ে হাবুডুবু খেয়েছে আবার। কাকার কাজ মেটার পর বাড়ি ঠাণ্ডা হতে না হতে মা আবার তাকে নিয়ে ফেরার জন্যে প্রস্তুত। আরো অবাক কাণ্ড, কেউ তাঁকে বাধা দিল না। কারো কথার অপেক্ষা না রেখে যেমন এসেছিলেন, কারো কথার অপেক্ষা না রেখে তেমনি ফিরে চলেছেন। মা যে শশিশেখরকে নিয়ে এখানে থাকতে আসেন নি এও বুঝি সকলের জানাই ছিল। যাবার সময়ও দাদারা ধারে কাছে ছিল না। কাজের ব্যস্ততায় এদিক-ওদিক সরে ছিল। আর, কাকিমার যেন দু'নৌকায় পা। ধরে রাখার সাহস নেই, মা থাকলেও অস্বস্তি।

এরই মধ্যে যাবে? অনেক বাধা পেরিয়ে শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিলেন কাকিমা।

হ্যাঁ। তোর ভয় নেই, আর গণ্ডগোল হবে না। মায়ের সেই অল্প কটা কথা শশিশেখরের কানে লেগে আছে। কাকিমার দিকে চেয়ে মা ওকে দেখিয়ে বলেছিলেন, আশীর্বাদ করিস এই ছেলেটা যেন মানুষ হয়, আমি আর কিছু চাইনে।

শশিশেখরের বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল হঠাৎ। হৃৎপিণ্ডের ক'টা ধপ-ধপানি যেন কানে শুনল। মস্ত ঘরের সব জানলা দরজা তেমনি খোলা, সন্ধ্যার অল্প অল্প বাতাসে পুরু পরদাগুলোও একটু একটু দুলছে। তা' ছাড়া এখানেও পাখা ঘুরছে মাথার ওপর। কিন্তু গোটা ফুসফুসটা বাতাসের অভাবে হঠাৎ বুঝি চুপসে গেল। বাতাস টানতে পারছে না। সেই শূন্যতার চাপে বুকের হাড় পাঁজর সুদ্ধ দুমড়ে দুমড়ে যাচ্ছে।

ওই মায়ের সাধ কি অপূর্ণ থাকতে পারে? মা কি কোনোখান থেকে তার ছেলের মানুষ হওয়া দেখছে না?

মুখে বলার সাহস না থাক, সেই ছেলে বেলায় মায়ের বিরুদ্ধে শশিশেখরের একটা নীরব অভিযোগ ছিল। তার ছেলেমানুষি আচরণে কখনো-সখনো তা প্রকাশও পেত। স্বেচ্ছায় মায়ের এই দারিদ্র্য বরণের সে কোনো যুক্তি খুঁজে পেত না, ক্লেশটুকুই শুধু ভোগ করত। মনে হত, মা ইচ্ছে করেই নিজে কষ্ট ভোগ করছে আর তাকেও ভোগ করাচ্ছে। কাকার বাড়ি থেকে ফিরেই মা কোর্টের ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে ফেললেন। আশ্রয়দাতা আইনজীবী বন্ধুটিকে নিরস্ত করলেন। বললেন, ছেলের ভাগ্যে যেটুকু ছিল পেয়েছে। আর দরকার নেই।

দরকার ছিল। জীবনকে শুধু রক্ষা করতে হলেও কিছু তাপ, কিছু আলো বাতাস প্রয়োজন। তার ওপর মা তো শুধু ছেলেকে রক্ষা করতে চান নি, তাকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। আশা আশ্বাসশূন্য অনিশ্চিত গহ্বর থেকে ছেলেকে জীবনের পথটা চেনাবার জন্যও অঢেল না হোক, পরিমিত বিত্তের দরকার ছিল। তবু, অনেকটা হাতে পেয়েও মা কেন সেই দরকারের দিকে হাত বাড়ালেন না, শশিশেখর তখন বোঝে নি। অনেক পরে বুঝেছে। মা শুধু শক্ত হয়ে থাকলেই এরপর একটা ফয়সালা

হয়ে যেত। কাকিমা আপোস করে নিতেন। দাদারাও মনে মনে সেই জন্যই প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু মা স্বেচ্ছায় টানা-হেঁচড়ার অধ্যায়ে গোটাগুটি ছেদ টেনে দিলেন। মা যতটা এগিয়েছিলেন জেদের বশেই এগিয়েছিলেন। কাকার ওপর তাঁর রাগ ছিল। কাকার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাগ গেছে, জেদ গেছে। কিন্তু তা হলেও ছেলের পাওনা অংশ ছেলের মুখের দিকে চেয়েই আদায় করে নিলে তাঁর কর্তব্যবোধ ক্ষুণ্ণ হত না, কেউ সেটা অন্যায়ও বলত না। বরং সেটা না করাটাই সকলের বিচিত্র মনে হয়েছে।

শশিশেখরই শুধু মায়ের সেই বিচিত্র মনোভাবের হেতু অনুমান করতে পেরেছিল। কেমন করে পেরেছিল সঠিক জানে না। কিন্তু উপলব্ধি ঠিকই করেছিল। মায়ের মনে ভয় ছিল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় থেকেও বড় ভয়। ছেলের পৈতৃক বিত্তের আলোয় ছেলের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথ সুগম করার ভয়। ওই আলোর নিচে অনেক বড় ছায়া দেখেছেন মা—সেই ছায়াভয়। বিত্তশালী বুনেদী বংশের অনেক অপচয় দেখেছেন তিনি। কাকা তার ব্যতিক্রম ছিলেন না কিছু। তাঁর বহু দুর্বলতার ফাটল ধরে সেই অপচয়ের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছিল। পূর্ব পুরুষের আর কোনো প্রশস্ত ধারা তিনি পান নি। শশিশেখরের বড় দুই দাদা এই কাকারই অনুরাগী। অনুরাগের কারণ শশিশেখর বড় হয়ে অনুমান করতে পেরেছে। নেশায় উপকরণ যোগালে বনের পশুও পোষ মানে, গুণকীর্তন করে। কাকা তাঁদের আনন্দ আহরণে বাধা দেওয়া দূরে থাক, নির্লিপ্ত থেকে বরং প্রশ্রয় দিয়েছেন। তারা যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র হয়ে উঠেছে মনে করেছেন।

শশিশেখর পরে উপলব্ধি করেছে, মায়ের সামনে পড়লে অমন মাতব্বর দাদারাও কেন কুঁকড়ে যেত, কেন মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারত না। শশিশেখরের আবছা মনে পড়ে,

মা হঠাৎ হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে যেতেন। কখনো দুই দাদাকে এক সঙ্গে পেলে হঠাৎ ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়ে আটকাতেন তাদের। বাইরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট শশিশেখর এক অজানা ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। উঠতি বয়সের দাদারা তার চোখে তখন শৌর্য বীর্যের প্রতীক। ফলে মায়ের জন্যই ভয় হত শশিশেখরের। কিন্তু দরজা খোলার পর অবাক হয়ে দেখত, গম্ভীর মায়ের চোখ জ্বলছে, আর দাদারা যেন চাবুক খেয়ে তাঁর সামনে থেকে পালাচ্ছে।

বেসাতির খিড়কি দিয়ে সহজলভ্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যারা মাতৃরূপা রমণীর রোষকে তাদের সব থেকে বেশি ভয়।

যাই হোক শশিশেখরের ধারণা, এই কারণেই বংশের বিত্তের দিকে হাত বাড়াতে মায়ের ভয়।

এর পরের অধ্যায় দারিদ্র্যের অধ্যায়। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে ধীর স্থির শান্ত মায়ের ছেলে মানুষ করার অধ্যায়। এই অধ্যায়ে শশিশেখরের চোখের সামনে অনেক আশঙ্কা অনেক সংশয়ের পর্দা দুলেছে। আশার আলো অনেকবার নিভু নিভু হয়েছে। তাকে নিয়ে মা পরের-গলগ্রহ কখনো হন নি বটে, যেখানে যখন কাটিয়েছেন, ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছায় হোক মাকে কেউ কখনো অশ্রদ্ধা করেছে খুব শশিশেখরের এমন কখনো চোখে পড়ে নি। সামনা-সামনি মাকে কেউ অশ্রদ্ধা করতে পারে এ তার মনেও হয় না। তবু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শশিশেখরের মনে শান্তি ছিল না। সেই ছেলেবেলা থেকেই একটা অশান্ত আগুন যেন তার বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলেছে। তাই দিয়ে কখনো চোখ ধাঁধানো আলো জ্বালতে চেয়েছে, কখনো বা সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চেয়েছে। মা তাকে নিজের দখলে রেখে সব নেশার দুয়ারে কাঁটা দিয়ে এলেও একটা প্রচণ্ড নেশার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। রক্ষা করার কথা ভাবেনওনি হয়ত।

…বড় হবার নেশা।

ওই অবস্থায় থাকার দরুন চেতনার প্রথম উন্মেষ থেকেই বড় হবার নেশা তার। প্রচণ্ড বড়, সম্ভবের থেকেও বড়। আকাশটার মত বড়! তার এই নেশায় কেউ বাধা দেয় নি, কেউ অন্তরায় হয় নি। সময়ে ভালো করে কেউ টেরও পায় নি। মা সেটা অনুভব করেছেন যখন, সময় গেছে। সেই নেশার শেকড় পরিপুষ্ট হয়ে তখন সত্তার গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। সেটা উপড়ে ফেলার সাধ্য তখন মায়েরও নেই, শশিশেখরের নিজেরও না।

ষোল বছর বয়সে প্রথম পাশ দিয়ে বেরুবার আগেই মায়ের পুঁজি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় শশিশেখর বৃত্তি পেয়েছিল। না পেলে বড় হওয়ার স্থূল রাস্তাটায় সে তক্ষুনি নেমে পড়ত হয়ত। সেই ইচ্ছেই ছিল। অশান্ত মন বার বার তাকে সেই রাস্তার দিকেই ঠেলে দিচ্ছিল। তাই বৃত্তিটা সেদিন নিজের কাছেই চক্ষুশূল হয়েছিল।

ছেলের মনোভাব বুঝে মা সেই প্রথম সচকিত হয়েছিলেন।—বৃত্তি পেয়ে পাশ করবার পরেও আর পড়বি না ?

বৃত্তি পেলে পড়া যায় শশিশেখর জানে। পড়তে পয়সা লাগে না বটে, কিন্তু বৃত্তির ওই সামান্য টাকার সম্বলে সংসার চলে কেমন করে সে বুঝে ওঠে না। মা-ই বুঝিয়ে দিলেন। নীরব ভৎসনায় খানিক তার দিকে চেয়ে থেকে উঠে চলে গেলেন। ওইটুকু থেকেই শশিশেখর বুঝে নিল। বুঝে সর্বাগ্রে কলেজে ভর্তি হয়ে এসে মা-কে জানালো। অন্যথায় মায়ের সামনে এসে আর দাঁড়াতে পারবে না মনে হয়েছিল। তারপর ছেলে পড়ানোর কাজ নিল। সহজে সে কাজ পাওয়াও গেল। বাবার সেই আইনজীবী বন্ধুই তাকে সাদরে ডেকে নিজের বাড়িতে ছেলে পড়ানোর কাজ দিলেন। দেবেন না কেন, এই অবস্থার মধ্যে থেকেও অত ভালো পাশ করার ফলে সে তো চেনা-জানা সকলের চোখেই রত্ন তখন।

তাই ছেলে আর মায়ের সংসার আবারও চলল। প্রচণ্ড বড়র ছটায় ঝলসানো অশান্ত অসহিষ্ণু শশিশেখরের সংসার।

এর পর কলেজ থেকে বৃত্তি পেয়ে পেয়ে আর ছেলে পড়িয়েই পড়ার পাট শেষ করেছে সে। একেবারে শেষ মাথা টপকে তবে থেমেছে। মা-কে আর সেই নীরব ভর্ৎসনার সুযোগ দেয় নি।

কিন্তু প্রথম পাশ দিয়ে বেরুবার পর অপরিণত চোখে বড় হওয়ার রাস্তাটা যত প্রশস্ত মনে হয়েছিল, এই নিশ্চিন্ততার পরে সেটা আর ততো প্রশস্ত লাগছে না। চোখ আরো খুলেছে, বিবেচনা শক্তি বেড়েছে। কিন্তু তার ফল ভালো হয় নি। কারণ সেই সঙ্গে দ্বিধাও বেড়েছে, সম্ভব অসম্ভবের বেড়া টপকানো আগের মত আর অত সহজ হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার বাধাও অনুভব করেছে। শশিশেখরের তখনো বিশ্বাস মনের মত বড় হবার বাস্তবে ঝাঁপ দেবার পক্ষে ছ'বছর আগের সেই অতীতটাই ছিল শুভ লগ্ন। হাতের নাগালের মধ্যে মোটামুটি নিরাপদ নৌকো থাকলে অনিশ্চয়তার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়াটা কিছু কঠিন হয়ে পড়ে।

আপাতত সেই নিরাপদ নৌকোয় ওঠা ছাড়া গতি নেই।

বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, পাশ করে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেতে অসুবিধে হয় নি। সরকারী বা বে-সরকারী বিজ্ঞান-নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠানে মধ্যবিত্তের পক্ষে হয়ত ভালো চাকরিই সে পেতে পারত। আর, তখন তো তাকে মধ্যবিত্ত বললেও অনেক বেশি বলা হবে। কিন্তু ভেবে চিন্তে শশিশেখর কলেজে ছেলে পড়ানোর চাকরি নিল। এ কাজে কিছু স্বাধীনতা আছে, কিছু অবকাশ আছে। তা'ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই ছেলে পড়িয়ে অভ্যস্ত সে। চাকরিই যদি করতে হয়, যথাসম্ভব নিরুপদ্রবের দিকটাই বেছে নেওয়া ভালো।

মা ওতেই পরিতুষ্ট। আর বেশি কিছু চান নি তিনি। যা হয়েছে অনেক হয়েছে, আশার থেকেও বেশি হয়েছে। ঠিক এই সময় মহাদেও এসে তাঁর বাড়িতে কাজে লেগেছে। মা তাতে আরো খুশি। তাঁর মতে ঠাকুর মুখ তুলে না চাইলে মহাদেওর মত লোক মেলে না। শশিশেখর তাকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে।

মহাদেওরও তখন অল্পই বয়েস। কাকার কাছে এসে কাজে লেগেছিল। ওই বয়সে অত বড় বাড়ির হাজারো কাজ যন্ত্রের মত করে যেত সে। দাদাদের খেয়ালের হুকুমে হিমসিম খেত। বনেদী বড়লোকদের স্বভাব চরিত্রের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস তখন থেকেই দানা বেঁধে উঠেছিল কিনা কে জানে।

তখন থেকেই মাকে ভারী ভক্তিশ্রদ্ধা করত এই মহাদেও। শশিশেখরের ধারণা, মা খোঁজ-খবর করেন ডেকে খেতে-টেতে দেন বলেই অত ভক্তি শ্রদ্ধা। পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে তারা বেরিয়ে আসার পরে অবশ্য ধারণাটা বদলেছিল। কারণ, ফাঁক পেলে মহাদেও তখনো বাড়ি থেকে পালিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে যেত। ওর দেখা করা মানে, মায়ের সামনে চুপচাপ বোবার মত খানিক বসে থাকা। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেওয়া ছাড়া নিজে থেকে কোনো কথা শুরু করা ধাতে নেই মহাদেওর।

সেবার বহুদিন বাদে এলো দেখা করতে। মা শুনলেন, বাবুদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে দেশে চলে গিয়েছিল। দেশ থেকে আবার কাজের সন্ধানে এসেছে।

মা সানন্দে এবং সাগ্রহে তাকে এখানেই থেকে যেতে বললেন। মহাদেও-ও এই আশা নিয়েই এসেছিল।

মা পরিতুষ্ট। এখন ছেলে তাঁর মনের মত একটি বউ এনে স্থিতি হলেই তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও কথাটা তিনি মুখ ফুটে প্রকাশ করেন না।

করেন না, কারণ, এতদিনে ছেলের মনটি তাঁর ভালোভাবেই পর্যবেক্ষণ করা হয়ে গেছে। ছেলের চাপা হতাশা, চাপা ক্ষোভ, চাপা অসহিষ্ণুতা কিছুই তাঁর অগোচর নয়। প্রথম প্রথম এই বউ হওয়ার বাতিকটাকে তিনি খুব অপছন্দও করেন নি। কিন্তু এখন মাঝে মাঝে তাঁর শঙ্কা হয়। ও যেন দিন কে দিন এক আশাশূন্য আলোশূন্য ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে চলেছে। লেখাপড়া নিয়ে যতদিন ছিল, এ নিয়ে তিনি তখনও তেমন বিচলিত হন নি।

ভেবেছেন, পাশ করে বেরুলেই সুদিন আসবে মুখে হাসি ফুটবে। তার বদলে এই ভাব-গতিক দেখে তিনি ভাবনায় পড়লেন।

ছেলে খুব বড় হতে চায় তিনি জানেন। কিন্তু সেটা যে কত বড় সে-সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা নেই। তাই একবার তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, ভালো কাজের জন্য আরো কি-সব পরীক্ষা-টরীক্ষা আছে শুনেছি, এই চাকরি করতে করতেও সে-সব কিছু দেওয়া যায় কি না খোঁজ খবর করে দেখ না।

শশিশেখর হেসেছিল। কিন্তু আসলে সে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল। বড় চাকরির চেষ্টা এই বিদ্যে নিয়েও হতে পারে—বড় চাকরির পরীক্ষাও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু চাকরি করে কত বড় হওয়া যায়। কল্পনার সেই প্রচণ্ড বড় শশিশেখরের সঙ্গে শত বড় চাকুরে শশিশেখরেরও মুখের আদল কিছুমাত্র মিলবে না। সেই প্রচণ্ড বড়র রাস্তাটা কি, শশিশেখরের জানা নেই। জানা থাকলে ঝাঁপ দিতই। নেই বলেই এত তাপ ক্ষোভ অসহিষ্ণুতা।

বিরক্ত উল্টে মা-ই এক-একদিন হয়েছেন। বলেছেন, আমাদের তো দিব্বি ভালোভাবে চলে যাচ্ছে, ঠাকুরের অনেক দয়া, তুই খুশি না কেন?

শশিশেখর এর কি জবাব দেবে। বড় হওয়ার নেশায় মেতে ছেলেবেলা থেকে সেই অপরিসীম অনটন বাস্তবকেও উপেক্ষা করতে পেরেছে, সে এর কি জবাব দেবে? মায়ের উক্তিতে আতিশয্য নেই একটুও। যা ছিল তার তুলনায় অনেক হয়েছে তো বটেই। কলকাতার ওপর মস্ত বে-সরকারী কলেজে চাকরি করছে, ভালো মাইনে পাচ্ছে—সময় কাটে না বলে সপ্তাহে তিন দিন করে মোটা মাইনেয় বিজ্ঞানের দুটি খুব অবস্থাপন্ন ছাত্রকে পড়ায়। সস্তার দিন তখন, একটা চাকর সম্বলিত ছেলে আর মায়ের সংসার—কোনরকম অপচয় নেই, দুটো বছর না যেতে বেশ কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে। মায়ের চোখ দিয়ে দেখতে গেলে অনেক হয়েছে তো বটেই।

কিন্তু কল্পনায় যে অবুঝ চন্দ্র সূর্য গিলে বসে আছে, তার কতটুকু হয়েছে? তার ক্ষুধা এত সহজে মিটবে কেমন করে?)

এমন দিনে মামাতো ভাই দিব্যেন্দু বোসের সঙ্গে দেখা।

॥ পাঁচ ॥

বিধাতার যোগাযোগ, নইলে দেখা হবার কথা নয়।

শশিশেখরের সমবয়সী। দু'চার মাসের ছোট হয়ত। দু'চার বছরের বড় যারা ওর সামনাসামনি তাদেরও নিজেদের বড় বলে জাহির করতে বেগ পেতে হত। দু'চার মাসের বড়র দাবি নিয়ে শশিশেখর কোনদিন তার মুখোমুখি হয় নি। ছেলেবেলা থেকে কেউ যদি তাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে থাকে তো সেই, ওই মামাতো ভাই দিব্যেন্দু। ছেলেবেলায় এক-একসময় ওর ওপর রাগ হত শশিশেখরের। সব সময় মনে হত, ওর মধ্যে কিছু একটা প্রচ্ছন্ন শক্তি আছে যা তার নেই। পরীক্ষায় বরাবর শশিশেখরই প্রথম হত, দিব্যেন্দু নয়। প্রথম হওয়া দূরে থাক, পরীক্ষায় দিব্যেন্দু এক-একবার অনেক তলিয়ে গেছে। কিন্তু পরীক্ষার আগে বরাবরই শশিশেখরের মনে হয়েছে, যাবতীয় পাঠ্যবস্তু বুঝি শুধু ওরই খাস দখলে। অথচ পড়াশুনা নিয়ে একদিনের জন্যেও দিব্যেন্দু নিজের কেরামতি জাহির করে নি কখনো, শুধু নির্লিপ্ত আর নিশ্চিন্ত থেকেছে। প্রায় ঈর্ষা করার মতই এই সহজ নির্লিপ্ততা তার। পড়াশুনা নিয়ে শশিশেখরের দুশ্চিন্তা দেখে পরামর্শ দিয়েছে, এটা পড়ে রাখিস, এটার জবাব এইভাবে লিখলে হয়, এগুলো দেখে রাখলে হয়ত কাজ দেবে।

কাজ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় ওর সুপরামর্শ তো খুব কমই বিফল হয়েছে। পরীক্ষা দিতে দিতে শশিশেখরের মনে হয়েছিল, দিব্যেন্দু এবার হয়ত সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে। পরে শুনল, তার চিন্তা দেখে দিব্যেন্দু ওকে শুধু সৎ পরামর্শই দিয়েছিল—

নিজে ও-সব নিয়ে মাথা ঘামায় নি কিছু, মোটামুটি পাশ্ করে যাবার মত বইগুলো উল্টে পাল্টে দেখে গেছে।

শশিশেখরও এক-একসময় ওকে যে উপদেশ দিতে না গেছে তা নয়। ওদের থেকেও দরিদ্র অবস্থা তার। সে-ও মধ্যবিত্ত দাদাদের সংসারে এক ছোট ভাই—প্রায় বোঝার মতই। অতি শৈশবে মা বাবা দুইই হারিয়েছিল। বাড়িতে দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক। ইস্কুল ফেরত প্রায় প্রত্যহ শশিশেখরের সঙ্গে ওদের বাড়ি চলে আসত। নিজেই বলত, চল্, পিসীর কাছ থেকে তোর খাবারের ভাগ মেরে আসি, বাড়ি গিয়ে খেতে চাইলে বউদিরা পোড়া কাঠ নিয়ে তাড়া করবে। অথচ বউদি বা দাদাদের নিন্দে করত না, বরং হাসি মুখে বলত, তাদের দোষ কি, এক খাওয়া ছাড়া বাড়ির লোকের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক রাখলে তারা নিশ্চয় আদরই করত—বাড়ির পোষা বিড়াল ক'টাকে তো করে—। এই নির্লিপ্ততার জোরেই ও মায়ের স্নেহও কেড়েছিল। ইস্কুলের পর মা-ই ওকে রোজ এখানে আসতে বলে দিয়েছিলেন। তাই শশিশেখরের মনে হত, ওর ভালো করে পড়াশুনা করা উচিত, নিজের ভবিষ্যৎ ভাবা উচিত। কিন্তু ওকে কিছু বলতে গেলেই শশিশেখরের নিজের কানেও সেটা কেমন অপরিণত উপদেশের মত শোনাতো।

দিব্যেন্দু তর্ক করত না, এমন কি যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টায় আত্ম-সমর্থনের সামান্য চেষ্টাও করত না। ডাগর দুই চোখ মেলে মুখের দিকে চেয়ে থাকত, শুনত। এই শোনার ব্যাপারে অসীম ধৈর্য তার। কিন্তু শুনতে শুনতে একটু হাসির আভাসে চোখের কোণ-দুটো যেন শুধু উপছে উঠত, ঠোঁটের ফাঁকে তা ধরা পড়ত কি পড়ত না। সেই ছেলেবেলা থেকেই ওইরকম। পরেও ওই একই রকম দেখেছে শশিশেখর। এই দুনিয়ায় ওর কাছে যেন সমস্যা বলে কিছু নেই। তুমি নির্লিপ্ত থাকলেই সব সমস্যা তোমার মন থেকে ঢিলে-ঢালা হয়ে খসে পড়ে যাবে। নির্লিপ্ত হবার এই সহজ কৌতুকে ওর জন্মগত অধিকার যেন।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের ছেলের প্রকৃতি কিছুটা উদাসীন হওয়াই স্বাভাবিক। তাই হয়ে উঠছিল। শশিশেখর এই পরিবর্তন অনুভব করত, দেখত। আর মনে মনে বিরূপ হত। এই চরিত্রের পাশে নিজের বুকের তলার আগুন অনেক সময় ফিকে হয়ে যেত। নিজেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট মনে হত। আরো বেশি হত, যখন দিব্যেন্দুর মধ্যেও সেই আগুনের তাপ ছড়াতে চেষ্টা করত। সেই কতকাল আগে—সবে তখন কলেজে ভর্তি হয়েছে দু'জনেই—দিব্যেন্দু ওই তাপের ওপর যেন বরফ-গলা জল ঢেলে দিয়েছিল একপ্রস্থ। মুখের দিকে চেয়ে শশিশেখরের মনের কথা শুনছিল, ওর নির্বাক নিবিষ্টতার ফলে শশিশেখরেরও উদ্দীপনা বাড়ছিল।

দিব্যেন্দু একসময় হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে নিরাসক্ত মন্তব্যের সুরে প্রশ্ন করেছিল, তুই অনেক বড় হতে চাস মানে অঢেল টাকা চাস, এই তো?

মন-খোলা উচ্ছ্বাসের মুখে এই স্থূল বিশ্লেষণ কটু লেগেছিল শশিশেখরের কানে। কিন্তু যুৎসই জবাব খুঁজে না পেয়ে ঈষৎ তপ্ত মুখে বলেছিল, চাই তো, একশবার চাই, কিচ্ছু না চেয়ে সন্ন্যেসী হতে বলিস নাকি?

দিব্যেন্দু হেসে উঠেছিল।—সেটা হওয়া তোর টাকা চাওয়ার থেকে সহজ মনে করিস তুই? ইচ্ছে করলেই হতে পারিস?

শশিশেখর তেতেই উঠেছিল, বলেছিল, না, চতুর্বর্গ লাভ করার জন্য তুই-ই এ রাস্তায় এবার ভালো করে পা বাড়া—

রাগের মাথায় বললেও উক্তিটা একেবারে তাৎপর্যশূন্য নয়। ওর উদাসীনতার মুখোমুখি বসে নিজের বাসনার যাতনা নিজের চোখেই বেমানান ঠেকত এক-একসময়। তাছাড়া দিব্যেন্দু তখন সত্যিই দূরে সরছে। ক্ষুধার তাড়নায় তখন আর কলেজ-ফেরতা অত ঘন ঘন তাদের বাড়ি আসে না। মা তিন দিন তাগিদ দিলে হয়ত একদিন আসে। শশিশেখর জানে সেটা বয়সোচিত কোনো সঙ্কোচ নয়। সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না ও। আসল

কথা, সত্যিই ও তখন দুই একজন পরমার্থ-সন্ধানীর কাছে ঘোরা-ফেরা করছে। শশিশেখর সেটা টের পেয়ে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে, ফাঁকির প্রলেপে আত্মতুষ্টির পথ খোঁজা বলে মন্তব্য করেছে। দিব্যেন্দু তর্ক করে নি, শুধু হেসেছে। জবাব ওই একদিনই দিয়েছিল।

এরপর দেখা গেল দিব্যেন্দু প্রায়ই কলেজ কামাই করে। জিজ্ঞাসা করলে পাঁচটা বাজে কথা বলে আসল কথা এড়িয়ে যায়। ওকে নিয়ে শশিশেখরের মনের ভিতরে একটা অস্বস্তি দানা পাকিয়ে উঠতে থাকে। দারিদ্র্যের তাড়নায় চাকরির খোঁজে ঘোরে কি না সেই সন্দেহও হয়। আবার মুখোমুখি কথা হলে সে-রকম মনে হয় না একবারও।

একদিন একেবারেই ডুব দিল দিব্যেন্দু বোস।

একটানা দিন কয়েক কলেজ কামাই হতে শশিশেখর তার বাড়িতে খোঁজ করতে গেল। কিন্তু বাড়ির সকলেই তার সম্বন্ধে আশাহত। তাই উদাসীন। কেউ খবর রাখে না কোথায় গেছে। তবে সন্ন্যাসী ফকীরদের পিছনে অনেক দিন ধরেই তো ঘোরাঘুরি করছিল, তাই ধারণা, তাদেরই কারো সঙ্গ ধরে কোথাও চলে গেছে। বৈরাগ্য কাটলেই আবার ফিরে আসবে।

মা শুনে কেঁদেছিলেন। শশিশেখর কাঁদে নি। কিন্তু তার এক ধরনের অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হচ্ছিল মনে আছে। কিছু না বলে এই ভাবে নিরুদিষ্ট হয়ে দিব্যেন্দু ওকে যেন অবজ্ঞা করে গেল। সে-যে বড় এটাই জাহির করে গেল। এরপর দুটো বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কেটেছে দিন কতক। একবার মনে হয়েছে, ভালই হয়েছে—নির্লিপ্ত উদাসীনতা দিয়ে দিব্যেন্দু যেন তাকে খানিকটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, প্রভাব বিস্তার করছিল ওর ওপর। সেটা গেল। তার বড় হবার উদগ্র ঝোঁকে ও-যেন পরোক্ষ বাধার মত হয়ে উঠছিল কতকটা। এবার সে নিজের কল্পনার মধ্যে ভালো করে নিবিষ্ট হতে পারবে।

এরকম মনে হত যখন, তখনই যাতনা বোধ করত বেশি। কারণ, এই অনুভূতি বড় হয়ে উঠলে নিজেকে ওর তুলনায় ছোট ভাবতে হয়। তার থেকে ও সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে বড় হওয়ার বাস্তবটা বরং অনেক জোরালা লাগে। এক এক সময় আবার ও নেই বলে বুকের ভিতরটা সত্যিই খালি খালি ঠেকে। কারণ, বাড়ির লোকের মত তার একবারও মনে হয় নি, বৈরাগ্য কাটলেই সে আবার সুড়সুড় করে ঘরে ফিরে আসবে। বৈরাগ্যের কারণে দিব্যেন্দু ঘর ছেড়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে—শশিশেখর তা আদৌ বিশ্বাস করে নি। ফকীরের সঙ্গে গেলেও না। আসলে, ও গেছে যে কোনো একটা অবলম্বন ধরে জীবনটাকে তলিয়ে খুঁটিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে। সেই দেখা হলে যদি ফিরে আসে।

কিন্তু শশিশেখর দত্তগুপ্তের চিন্তার আকাশ থেকে দিব্যেন্দু বোসের মিলিয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগে নি।

একে একে এরপর সাত বছর কেটে গেছে। কল্পনার বিপরীত পরিণতির একটা ছকে-বাঁধা মোহনায় এসে শশিশেখর বাইরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিল। জীবনের এই নদীতে বেগ নেই, স্রোত নেই, ঢেউ নেই। শুধু মৃত্যুর মত বেঁচে থাকা আছে।

কলেজ করে, ছেলে পড়ায়, দিন কাটে।

সেদিনও কলেজ থেকে ফিরে নিয়মিত চা জল খাবার খেয়ে বাইরের ঘরের চেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল।

কে একজন ঘরে ঢুকল। শশিশেখর মুখ থেকে কাগজ সরালো।

না, প্রথম দর্শনে শশিশেখর তাকে চিনতে পর্যন্ত পারে নি। এই একজনের অস্তিত্ব তার মাথা থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়েছিল কলেজের কোনো ছেলের গার্জেন বলে মনে হয়েছে। পরনে মোটা ধবধবে খদ্দরের কাপড়, জামার বদলে গায়ে খদ্দরের ফতুয়া—তার ওপর তেমনি ফর্সা খদ্দরের চাদর জড়ানো। মাথার

চুল আগাপাছতলা সমান এবং খুব ছোট করে ছাঁটা। কাছা-কোঁচা না থাকলে শ্বেত-বসন ব্রহ্মচারী-টারি ভাবত।

বসুন। এক নজর তাকিয়ে শশিশেখর হাতের কাগজ গুছিয়ে টেবিলে রাখতে রাখতে বক্তব্য শোনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

কিন্তু তার বদলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটি হাসছে মিটিমিটি। এই চেনা হাসিটুকুই এক মুহূর্তে সাত বছরের একটা পুরু পরদা হঠাৎ ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিশ্চিহ্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সাত বছরে বেশ বাসের পরিবর্তন হয়েছে, মাথার ঝাঁকড়া চুল গিয়ে কদম-ছাঁট হয়েছে, দেহ পরিপুষ্ট হয়েছে, মুখের কাঁচা আদল বদলে পরিণত ছাপ পড়েছে—কিন্তু ওই হাসি বদলায় নি। শশিশেখর যেন আচমকা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে হাঁ করে চেয়েছিল তার দিকে।

কি রে, একেবারে চিনতেই পারলি না ?

কি আশ্চর্য, দিবা, তুই !

সন্দেহ থাকে তো বল, উঠে পালাই।

একেবারে ছেলেমানুষের মত হৈ-চৈ চেঁচামিচি করে উঠেছিল শশিশেখর। জীবনের একটা অভাবিত পরম মুহূর্তই উপস্থিত যেন। একুশ বছর বয়সে শশিশেখর কলেজে ছেলে পড়াতে ঢুকেছে, একুশ থেকে তেইশ—এই দু'বছর মাস্টারী করছে—এরই মধ্যে একটা অসহিষ্ণু গাম্ভীর্য তার সুশ্রী মুখের ওপর ক্রমশ এঁটে বসছিল। সেই গাম্ভীর্যের খোলসটা হঠাৎ এক মুহূর্তেই যেন ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। তার এই আনন্দ অনেকদিন কেউ দেখে নি।

কলরব শুনে চকিত মহাদেও দোরে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দাদাবাবুর অমন সরব আনন্দের কারণ অনুভব করতে চেষ্টা করেছে, তারপর অবোধ চোখে আগন্তুককে নিরীক্ষণ করেছে।

মা-কে ডাক্ শিগগীর, কে এলো এসে দেখতে বল

দেখে মা-ও তেমনি অবাক, আর তেমনি খুশিও। আরো বেশি খুশি হয়ত ছেলের আনন্দ দেখে। শশিশেখরের প্রশ্নের বিরাম নেই, কোথায় ছিল এতকাল, কবে এলো, কোথা থেকে এলো, কোথায়ই বা আছে এখন, কিভাবে এতদিন কাটল,—হিমালয়ে না মরুভূমিতে, কোথায় কোথায় গেছে, কোন্ চতুর্বর্গ লাভ হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেশির ভাগই জবাব এড়িয়ে দিব্যেন্দু মৃদু মৃদু হেসেছে। শশিশেখরের তক্ষুনি আবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়েছে। শুধু এই জন্যেই ওর সত্তার প্রভাব অনেক সময় বড় মনে হত। কিন্তু সেদিন শশিশেখরের মনে ব্যক্তিত্বের পাল্লাটা একটুও উঁকিঝুঁকি দেয় নি। সে খুশি হয়েছে, নিজের কাছে আপাতত শুধু এটুকুই যেন আস্বাদনের বস্তু। মনের মত একজনকে পেয়ে একটা দুঃসহ গুমটের কাল বুঝি কেটে গেল।

তাই দেখে দিব্যেন্দু ঠাট্টা করেছে, তুই কলেজের মাস্টার না ছাত্র রে?

মাস্টার। কড়া মাস্টার। ছেলেরা কত ভয় করে জানিস? আগে তোর কথা বল, তুই তো সন্ন্যেসী হয়ে গেছলি?

জবাব না দিয়ে দিব্যেন্দু হাসে।

হোস্‌নি?

দিব্যেন্দু মাথা নাড়ে, হয় নি।

তাহলে কি করলি এতকাল?

সাগরেদি করলাম আর দেখলাম। দিন কয়েক হল তিন নম্বর গুরুজীর কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছি।

শশিশেখর অবাক, কেন? আসতে দেবে না?

এমনি আসতে চাইলে দিত হয়ত, কিন্তু ওই গুরুজীটির সঙ্গে একটু বিশ্বাসঘাতকতা করে আসতে হল—কিছু টাকা আর একটা মেয়ে নিয়ে পালিয়েছিলাম। ওঁর চেলা চামুণ্ডারা পেলে আমাকে ঠেঙিয়েই মেরে ফেলবে।

শশিশেখর হতভম্ব। ঘরে কেউ ঢুকল মনে হতে সচকিতও। না, মা নয়। একগাদা খাবার নিয়ে মহাদেও ঘরে ঢুকছে। ওর কানে গিয়ে থাকলেও মুখ দেখে সেটা বোঝা যাবে না। কিন্তু মহাদেওর পরে আবার মা এলেন। তিনি ঘর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত কৌতূহলে ছটফট করেছে শশিশেখর। মা সে দিনটা দিব্যেন্দুর থেকে যাওয়ার কথা বলতে এসেছিলেন। শশিশেখর উল্টে তাঁকেই তাড়া দিয়েছে। —হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কাজে যাও, আজ কাল পরশু তরশু—ও এখন অনেক দিন থাকবে এখানে। যেতে চাইলে ওর চেলা-ভাইদের মার বাঁচিয়ে ও এখন আমার হাতে মার খাবে।

তিনি কিছু না বুঝেই প্রস্থান করেছেন। শশিশেখর আবার জেরায় বসেছে। যা শুনল, অভিনব ব্যাপারই বটে। একে একে এ পর্যন্ত তিনবার গুরু-বদল করেছে দিব্যেন্দু। কোথাও খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে, কোথাও আচার অনুষ্ঠানের বেশি কড়াকড়ি। শেষের এই গুরুটির বেশ ফলাও কারবার তো বটেই, পাহাড় আর সমুদ্রে ঘেরা একখানা ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর যেন তিনি। নানা জায়গা থেকে কৃতী ভক্তরা অকৃপণ হাতে অর্থের যোগান দিয়ে থাকেন। গুরুজীর রাজ্যে বিধি নিষেধের অত কড়াকড়িও নেই। তোফা খাও-দাও আর নিশ্চিন্ত মনে সাধন ভজন করো। দিব্যেন্দু ছিল ভালো। কিন্তু ওপরঅলার অবিবেচনায় সুখ সইল না।

গুরুজীটি হঠাৎ একটি বাঙালী শিক্ষিতা বিধবা ভক্ত মহিলাকে পরকালের পথ দেখাতে গিয়ে তার ইহকালের দিকেই বড় বেশি নজর দিয়ে ফেললেন। তাতেও তেমন গোলযোগ হবার কথা নয়, কারণ, দিব্যেন্দু জানে গুরুজীর সুনজর ও-রকম আরো দুই একজনের ওপর পড়েছে এবং এখনো তাঁরা দিব্বি ভক্তিমতী হয়েই সেখানে বিরাজ করছেন। কিন্তু এই মেয়েটি অবুঝের মত বড় বেশি বেঁকে বসল আর বাঙালী দেখে শেষে দিব্যেন্দুর কাছেই কিনা মুক্তির জন্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। গুরুজী সমেত সেখানকার

বেশির ভাগ সাধকই অবাঙালী। সহজে কেউ গুরুকোপের ভাগীদার হতে রাজি হবে না জানে। তা'ছাড়া ওই বেষ্টনী থেকে গুরুর সুনজরের পাত্রীকে ছিনিয়ে আনাও সহজ কথা নয়। উল্টে ভয়ের কথা।

মেয়েটি খুব সুন্দরী? শশিশেখরের সবুর সয় না।

থাম্। সাধকের চোখে জীবমাত্রেই সুন্দর, তা'ছাড়া পরকীয়া চর্চার সঙ্গিনী অত সুন্দর অসুন্দর বাছতে গেলে চলে না, মনে ধরা নিয়ে কথা। সুন্দরী নয়, প্রায় আমার মতই বলতে পারিস।

শশিশেখর হেসে উঠেছিল। কিন্তু হাসতে গেলে শোনা হয় না।—তারপর তুই কি করলি?

কি আর করব, সঙ্গে নিয়ে পালালাম।

শশিশেখর আগ্রহে উন্মুখ, তোর সঙ্গেই আছে নাকি এখনো?

পাগল! আমার এক নম্বর গুরুজীর দরবারে চালান করে দিয়ে এসেছি।···ওই ভদ্রলোকের বয়স আশীর ওপর, কিছুটা ভরসা করা যায়। তারপর ওই মেয়ের বরাত আর মর্জি।

এই রোমাঞ্চশূন্য পরিণতিটা শশিশেখরের খুব মনঃপূত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। জেরা করেছে, মেয়েটা এত সহজে তোর কাঁধ থেকে নেমে গেল?

নামাতে না চাইলে কি করত বলা যায় না। যে টাকা হাতড়ে নিয়ে সরে পড়েছিলাম তাতে আমার কাঁধের জোর কতদিন থাকবে বুঝেই আর আপত্তি করে নি বোধহয়।

প্রয়োজন সত্ত্বেও টাকা চুরির বাস্তবটা শশিশেখরের তেমন ভালো লাগে নি।—চুরি করতে গেলি কেন, তোর হাতে কিছু ছিল না? এখনও না ফ্যাসাদে পড়িস।

দিব্যেন্দু নিশ্চিন্ত মনে মাথা নেড়েছে, চুরি নয়। যা নিয়েছে প্রাপ্য তার থেকে অনেক বেশি। প্রতিষ্ঠানে পাবলিসিটির কাজ করত, তার প্রচারের মাহাত্ম্যে ওদের বহু টাকা রোজগার হয়েছে। আর, ভয়েরও কিছু নেই, বাঙালী বাবুকে ওরা বেশি ঘাঁটাবে না। বাঙালী

বাবুর প্রচার কৌশলে অনেকবার দিনকে রাত আর রাতকে দিন হতে দেখেছে তারা।

দিব্যেন্দুর সঙ্গে আবার এই অপ্রত্যাশিত যোগটাই যে দিন-বদলের সূচনা, শশিশেখর সেটা তখনি উপলব্ধি না করলেও কিছুদিনের মধ্যেই করেছে। দিব্যেন্দুকে পর পর কয়েকদিনই আটকে রেখেছিল সে, নিজেও কলেজ কামাই করেছে। কলকাতার এক অভিজাত পাড়ায় একখানা ঘর ভাড়া করেছে দিব্যেন্দু, শশিশেখর তাই শুনে রাগ করেছে। ঘর ভাড়া আর থাকা খাওয়া বাবদ গৃহস্বামীকে মাসে দু'শ টাকার ওপর গুণে দিতে হবে। এ টাকা দিব্যেন্দু কোথায় পাবে শশিশেখর ভেবে পায় না। জিজ্ঞাসা করলে দিব্যেন্দু হাসে। বলে, দেখা যাক, যতদিন চলে চলুক না, না চললে পালাবার রাস্তা তো খোলাই আছে।

এই খোলা রাস্তাই যে ধরতে হবে দিব্যেন্দুর কথাবার্তায় তাও মনে হয় না। ওর ধারণা, চেষ্টা করলে কলকাতার শহরে টাকা রোজগার করাটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। শুধু দিব্যেন্দুর বেলাতেই ধারণাটা উড়িয়ে দিতে পারে না শশিশেখর। সকলে যা পারে না দিব্যেন্দু তাই পারে এ-রকম একটা অনুভূতি ছেলেবেলা থেকে বদ্ধমূল। ওই দিনে মাসে দুশ টাকা অনেক টাকা। কিন্তু দিব্যেন্দুর কাছে সেটা বড় কিছু সমস্যাই নয়।

মা শুনে ধমকে উঠেছিলেন, তুই অন্য জায়গায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে তারপর এখানে এলি দেখা করতে ?

কারণ দেখালে বা কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করলে তর্ক করা চলে, জোর করা চলে। কিন্তু নিরুত্তরে অপরাধ স্বীকার করে শুধু হাসে যে, তার ইচ্ছার প্রাধান্যটাই তখন বড় হয়ে ওঠে। মা তবু বলেছেন, ভাল চাস তো তোর জিনিস পত্র নিয়ে শিগগীর এখানে চলে আয়—

কিন্তু দিব্যেন্দুর কথা না শোনার রীতি অন্যরকম।—দিনকতক

নিজের মুরোদটা দেখে নিই না পিসী, তারপর এ-দরজা তো খোলাই আছে। এক্ষুনি চলে আসতে গেলে অসুবিধে হবে।

মা চলে যেতেই শশিশেখর ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল।—তোর কি অসুবিধে, সাধু সঙ্গ করে গাঁজা-টাজা ধরেছিস নাকি?

দিব্যেন্দুর হাসির ব্যতিক্রম নেই। জবাবও তেমনি।—ধরিনি, অন্যকে ধরাবার তালে আছি।

বড় হওয়ার বাসনার যে ব্যর্থ তাপ আজও বুকের তলায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, শশিশেখর চট করে সেটা দিব্যেন্দুর কাছে প্রকাশ করে নি। তার কেমন মনে হয়েছে, এতদিনের নিরুদ্দেশের পরেও ওই নিঃস্ব দিব্যেন্দুই কেমন করে যেন তার থেকে অনেক বেশি শক্তি নিয়ে ফিরেছে। তাই তার কাছে নিজের ব্যর্থতা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ। শশিশেখর ওর এ ক'বছরের অনেক হাস্যকর অভিজ্ঞতার কথা শুনেছে—শুনে হেসেছে। কিন্তু তার মধ্যেও ওর প্রচ্ছন্ন শক্তির দিকটাই অনুভব করেছে। সেটা বোধহয় নিজেকে ভোলার, নিজেকে ছাড়িয়ে ওঠার শক্তি। কিন্তু শক্তির রূপে বিভেদ নেই খুব।

সে দিনও একটা হালকা কথা প্রসঙ্গে ওর এই প্রচ্ছন্ন শক্তির দিকটাই অনুভব করেছিল শশিশেখর। কলেজের এই ছেলে পড়ানোর চাকরি বেশিদিন করার ইচ্ছে নেই সেই গোছের কিছু একটা মনোভাব ব্যক্ত করেছিল। দিব্যেন্দু বলল, চাকরি ছাড়বি কিরে, বিয়ে থা করতে হবে না?

ওর মুখে এ কথা শুনে শশিশেখর অবাক হয়েছিল। দিব্যেন্দু আবার বলল, পিসী তো তোর সুন্দর বউয়ের আশায় দিন গুণছে মনে হল।

নিজের বিয়ের প্রসঙ্গে শশিশেখর এ পর্যন্ত খুব একটা মাথা ঘামায় নি। মায়ের ইচ্ছে জানে। আজ হোক কাল হোক বিয়ে একটা করবে হয়ত। কিন্তু যে সাফল্য বা সার্থকতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো এক সুদর্শনার বাঞ্ছিত পদার্পণ চিন্তার রাজ্যে মধুময় হয়ে

উঠতে পারে—মনের দিক থেকে সেখানে অনেক ঘাটতি বলেই এই নিয়ে তেমন উষ্ণ কল্পনা কিছু দানা পাকিয়ে উঠতে পারে নি। রূপের ওপর রূপোর দখল। শশিশেখর রূপো নিয়ে যত ভেবেছে রূপ নিয়ে তার সিকিও ভাবে নি।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গ তার মনে ওর সম্বন্ধে একটা ভিন্ন কৌতূহলের উদ্রেক করেছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ওপর সংযমের বর্ম যে যেমন শক্ত করেই এঁটে বসে থাক, যৌবন-বাস্তবের তাড়না একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব বলে তার মনে হয় না। যে সময় দিব্যেন্দু ঘর ছেড়েছিল, সেটা এই তাড়না প্রতিরোধের পরিণত সময় নয়। কিন্তু যে সময়ে সে ফিরে এলো, সেটা নিভৃতের দোসর খোঁজারই লগ্ন। চেষ্টা করে এই লগ্নের চোখে ধুলো দিয়ে কাল কাটানো চলে, কিন্তু একে অস্বীকার করা চলে না।

এতদিন ছন্নছাড়ার মত কাটালেও দিব্যেন্দু কি বাসনার এই দিকটা জয় করে ফেলেছে বলবে?

আমি তো একদিন না একদিন বিয়ে করবই, কিন্তু তুই কি করবি?

দিব্যেন্দু দু'চোখ বড় বড় করে তাকালো তার দিকে, আমি কি করব, বিয়ে!

সাধুসঙ্গ করে একেবারে জিতেন্দ্রিয় হয়ে গেছিস বলছিস?

সহজ কৌতুকে দিব্যেন্দু জবাব দেয়, সাধু সাধু করিস কেন, আমি যে সব সাধুসঙ্গ করেছি তারা সকলেই যে স্ত্রীসঙ্গ বর্জিত নয় শুনেছিস তো। কিন্তু বিয়ে করতে হলে তো আর একজনকে চাই—কোথা পাব?

শশিশেখর মাথা নাড়ল, পাওয়া না পাওয়ার কথা বলছি না, তোর কোনোসময় কষ্ট হয় কি না?

হাসিমুখে দিব্যেন্দু খানিক চেয়েই থাকে তার দিকে। তারপর হঠাৎ বাঁ হাতটা উল্টে তার চোখের সামনে তুলে ধরে। হাতের উল্টো দিকে কব্জির কাছটায় মস্ত একটা দগদগে পোড়া

দাগ—একটা রূপোর টাকার দ্বিগুণ। ঘা টা সবে শুকিয়েছে মনে হয়।

শশিশেখরের মুখে কথা সরে নি খানিকক্ষণ। দিব্যেন্দুর যেন তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েই গেছে, সে মুচকি হাসছে।

কি করে হল? কাউকে ধরতে গেছলি ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিয়েছে? ওই যে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়েছিলি সে-ই নয় তো?

সে-ই উপলক্ষ্য বটে, কিন্তু ছ্যাঁকা সে লাগায় নি, লাগিয়েছি আমি নিজেই।

ঢিমেতালের উক্তি শুনে শশিশেখর বিরক্ত। তবু ধীরে সুস্থে দিব্যেন্দু কৌতুকের ছলেই ব্যক্ত করেছে ঘটনাটা। মেয়েটি সুরূপা না হলেও স্বাস্থ্যবতী। আর ওই বয়সে শিক্ষা আর রুচির দিকটাও রূপের দিক ঘেঁষেই লোকে ওজন করে থাকে। এখন, ওই বয়সের এক বিধবা মেয়ে আর সব দিক ছেড়ে কেন এই ধর্ম-কর্মের রাস্তাটাই সচরাচর আশ্রয় করে সে-সম্বন্ধে দিব্যেন্দুর ধারণা বড় বেশি স্পষ্ট। আসলে ভোগের আকর্ষণ নির্মূল করার জন্যেই এই আশ্রয় নেয় তারা। অঘটন না ঘটলে আশ্রয়টা মন্দ নয়, কিন্তু অঘটন ঘটলে বা ঘটার উপক্রম হলে সমস্যার দিকটা বড় বেশি অনাবৃত হয়ে পড়বে—সেটা আর এমন কি আশ্চর্য! মেয়েটিকে কেন যে পালাতে হল, সেটা দিব্যেন্দুই বা ভুলবে কি করে, আর ওই মেয়েই বা ভুলবে কি করে?

জাহাজে তারা মাদ্রাজে এসে উঠেছিল। সেখান থেকে কোথায় যাবে মেয়েটি জানে না কিন্তু দিব্যেন্দু জানে। সেই গন্তব্যস্থলের গাড়ি পরদিন বেলাবেলি। বিকেল এবং রাতটা কাটাবার জন্যে তাকে নিয়ে একটা হোটেলে এসে উঠেছে। হোটেলে অনেকের দৃষ্টি তাদের প্রতি উৎসুক হয়ে উঠতে দেখেছে। মেয়েটির তো বিধবার বেশ, আর তার এই সাদা পোশাকেও তখন কাছা-কোঁচা চলত না। কিন্তু দিব্যেন্দু কারো কোনো ঔৎসুক্যের ধার ধারে নি। হোটেলে দুটো আলাদা ঘর নিতে পারত, তাও নেয় নি। এক

রাতের ব্যাপার, বাইরের বেঞ্চিতেই শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে। প্রত্যেকটি টাকা বড় মূল্যবান তখন।

জাহাজে একরকম উপোসে কেটেছে মেয়েটির। এখানেও সকাল থেকে প্রায় অনাহারে। দিব্যেন্দু এ নিয়ে বিশেষ অনুরোধ উপরোধ করে নি, নির্লিপ্ত থাকতে চেষ্টা করেছে আর যতটুকু কর্তব্য ততটুকুই করেছে। রান্নার সরঞ্জাম এনে দিয়েছে। মেয়েটির সঙ্গের ছোট ঝুপড়িতে রান্নার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু রাতেও সে নিজের জন্য কিছু করল না দেখে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। দিনের বেলার মত নিচে গিয়ে হোটেলে খেয়ে আসতে পারল না। ওদিকে রাত বাড়ছে।

শেষে নিজেই তার ঝুপড়ি টেনে ব্যবস্থায় বসল। খানকতক রুটি করে আর দুধটা জাল দিয়ে দিলেই হবে। গুরুদের কৃপায় এর থেকে অনেক বেশি করার অভ্যেস আছে। কিন্তু রুটি বানাতে বসে কি একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি একেবারে কোন্ অদৃশ্য নিভৃত থেকে ক্রমশ ওপর দিকে ঠেলে উঠতে লাগল। মেয়েটির প্রায় নিরম্বু উপোস চলছে বলে যে অস্বস্তি সে-রকমটা নয় এক ধরনের ভালো লাগার অনুভূতি যেন কোন্ অলক্ষ্য থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকল; আর সেটা কেমন বাড়তেই থাকল। ওদিকে সন্ধ্যে পেরুলেই গোটা মাদ্রাজের চোখে বুঝি ঘুম নেমে আসে। হোটেলেও এর ব্যতিক্রম নেই খুব। অথচ দিব্যেন্দুর সামনে এই রাতটাই বুঝি কি এক প্রতীক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সামান্য কয়েকখানা রুটি বানাতেও দেরি হতে লাগল, রাত বাড়তে লাগল। মেয়েটিও বোধহয় তার মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। দিব্যেন্দু বার কয়েক ফিরে দেখেছে তাকে। মেয়েটির চোখও তখন ওর দিকে পড়েছে। সে তেমনি চুপচাপ বসেই ছিল বটে, কিন্তু চাউনিটা বোধহয় ঈষৎ চকিত হয়েছিল।

দিব্যেন্দুর হঠাৎ মনে হল, রাত পোহালে যেখানে যাবে বলে স্থির করেছে, না বলে কয়ে বা অনুমতি না নিয়ে হুট করে সেখানে

গিয়ে হাজির হওয়া ঠিক হবে না। মেয়েটির যদি সেখানে আশ্রয় না মেলে বিড়ম্বনার একশেষ হবে। তার থেকে আগামী কাল সেখানকার প্রতিষ্ঠান কর্তাকে খোলাখুলি চিঠি লিখে অনুমতি ভিক্ষা করা যুক্তি-যুক্ত। অনুমতির প্রত্যাশায় দিন তিন-চার তাহলে এই হোটেলেই থাকতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে নানা হাঙ্গামা আর কৈফিয়তের মধ্যে পড়ার থেকে এই ব্যবস্থাই ভালো বোধহয়।

ঘুরে বসে দিব্যেন্দু আলোচনার ছলে মেয়েটির কাছে এই ভালো প্রস্তাবটাই পেশ করল। তার চোখে চোখ রেখে মেয়েটি শুনল। এই দীর্ঘ সময় পেয়ে তার উত্তেজনা গেছে। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া হিসেব-নিকেশের অনেক সময় পেয়েছে। মানুষ কোনো অবস্থাতেই অবলম্বনশূন্য হতে চায় না। এখন দিব্যেন্দু অবলম্বন তার। আত্মত্যাগের একটা বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে বলেই এই অবলম্বনটুকু আঁকড়ে ধরতে খুব বেশি আপত্তি হবে না হয়ত তার। যে অঘটনের ভয়ে পালানো, দরদের বুননি থাকলে অবস্থা বিশেষে এবং ব্যক্তিবিশেষে সেই অঘটনের সঙ্গে অপোস করাও একেবারে অসম্ভব হয় না বোধহয়। মেয়েটি মুখে জবাব দেয় নি। মুখের দিকে চেয়ে থেকে শেষে মাথা নেড়েছিল শুধু, অর্থাৎ তাই হোক। দিব্যেন্দুর মনে হয়েছিল, মুখের দিকে চেয়ে শেষ পর্যন্ত যোগ্য অবলম্বনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল সে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার চোখের কোণে একটুখানি হাসির ছটা ঝিকমিকিয়ে উঠতে দেখেছিল কি?

দেখুক না দেখুক, দিব্যেন্দুর মনে হয়েছিল দেখেছে।

তার পরেই বিচিত্র বিপরীত অনুভূতির চাবুক একটা। না—বিবেক, নীতি—এ-সব বড় বড় কিছুর তাড়না নয়। নিজেকে একটা প্রবৃত্তির স্থূল শিকলে না জড়ানোর তাড়না। এই শিকলটা ভেঙে দিয়ে নিজের ওপর একটা বড় রকমের আধিপত্য বিস্তারের তাড়না। নিজের শক্তি উপলব্ধির তাড়না।

কিন্তু এটুকু পারা যে কত কঠিন, দিব্যেন্দু সেই রাতে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। সেই চেষ্টা করতে গিয়ে হাড় পাঁজর সুদ্ধু দুমড়ে দুমড়ে যাচ্ছিল। সে পিছন ফিরে বসেছিল, মেয়েটি দেখে নি। দিব্যেন্দুর ওই হাতটা লোহার গনগনে চাটুর উল্টো দিকে লেগে আছে—চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। যাতনায় নিঃশব্দে আর্তনাদ করেছে, তবু হাত সরায় নি, তবু একটা শব্দ বার করে নি গলা দিয়ে। যতক্ষণ না আর একটা তাপ নিঃশেষে পুড়ে গিয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে দগ্ধেছে দিব্যেন্দু।

তারপর পোড়া হাতের যাতনাই প্রহরা দিয়েছে সমস্ত রাত।

পরদিন মেয়েটির কাছে কোনো জবাবদিহি না করেই তাকে নিয়ে সকালের ট্রেনে উঠে বসেছে।

দিব্যেন্দু হাসিমুখে শশিশেখরের প্রশ্নের জবাবটা দিয়েছে। বলেছে, সেই থেকে আর ওসব কষ্ট-টষ্ট হয় না।

শশিশেখর ঠাট্টা করেছে, মেয়েটি তেমন সুন্দরী হলে দিব্যেন্দু কি করত সেই সন্দেহও প্রকাশ করেছে। কিন্তু মনে মনে ওর শক্তির দিকটা উপলব্ধি না করে পারে নি। এই গোছের একটা জোর যদি তারও থাকত তাহলে অনেক কষ্টের লাঘব হত বোধ হয়।

আরো একটা তুচ্ছ ব্যাপারেও তার এই সহজাত জোরের দিকটা অনুভব করতে হয়েছে। তিন-চার দিন পরেই দিব্যেন্দু তার নিজের ডেরায় ফিরে গেছে। তবু বিকেলের দিকে প্রায় রোজই আসে, রোজই দেখা হয়। ছুটির দিনে সকালেই আসে। না এলে শশিশেখর ওর ওখানে হানা দেয়, গিয়ে ধরে নিয়ে আসে। সেখানে এক-তলার মেঝেয় ওর ভূমিশয্যা দেখে শশিশেখর নিজে একটা চৌকি কিনে ওর ঘরে পেতে দিয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে বিছানা বালিশও কিনেছে। ধপধপে শয্যা রচনা হতে তাই নিয়ে তরল হাসি ঠাট্টাও বাদ যায় নি।

কিন্তু ক'দিন পরে হঠাৎ একদিন দুপুরে ওর ঘরে উপস্থিত হয়ে

সে অবাক হয়ে দেখে ও তেমনি ভূমি-শয্যায় শয়ান। এমন কি মাথায় একটা বালিশও নেই। কম্বলের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে কি একটা পড়ছে। সেই মুহূর্তে বিছানাটার দিকে চেয়ে শশিশেখরের মনে হল, ওই শয্যা একদিনের জন্যও ব্যবহার করা হয় নি, যেমন পাতা হয়েছিল তেমনি আছে।

মাটিতে শুয়ে আছিস যে?

অপ্রস্তুত হয়ে দিব্যেন্দু মিটি মিটি হাসছে।—তুই এখন এসে হাজির হবি কে জানত!

তার মানে ওতে শোয়া চলবে না?

চালালেই চলবে। আসলে ব্যাপার কি জানিস, হাতের মুঠোর জিনিস ওভাবে ছেড়ে দেওয়া অভ্যেস করতে পারলে নিজের ওপর দখল বাড়ে—তাতে করে হাতে আসেও সহজে, আবার না এলেও কষ্ট হয় না। ওর মজাটা তো কখনো এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখলি না, তুই বুঝবি কি?

শশিশেখর না দেখুক, অনুভব ঠিকই করেছে।

...দীর্ঘকাল ধরেই করেছে। একটু একটু করে দিন বদলেছে তাদের। না একটু একটু করে নয়, কমলার প্রসন্ন কৌতুক হঠাৎই বুঝি ওদের প্রতি উপছে উঠছিল। শশিশেখরের বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে। দিব্যেন্দুরও হয়েছে। কিন্তু শশিশেখর একাই যেন শুধু স্বর্ণমৃগর সন্ধানে অবিরাম ছোটাছুটি করেছে। উত্তরকালে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তারা। কিন্তু দিব্যেন্দু বোসের চরিত্র বদলায় নি খুব। অন্তত সেই রকমই ধারণা ছিল শশিশেখরের। শক্ত মুঠো ভরে সব নিয়েও সেই মুঠোটা অনায়াসে আলগা করে দিতে পারে।...মোটা সেই খদ্দরের কাপড় পরে, জামার বদলে সেই খদ্দরের ফতুয়া গায় দেয়—তার ওপর সেই খদ্দরের চাদর। মাথার চুলও তেমনি ছোট করে ছাঁটে।

আচার আচারণে দিব্যেন্দু বোস তেমনি আছে। এতবড় ব্যবসার কড়াক্রান্তি হিসেব তার নখদর্পণে। অথচ তেমনি নির্লিপ্ত

উদাসীন। ঠাট্টা করলে হাসে, নিবিষ্ট মনে যখন কাজ করে তখনো মনে হয় হাসছে।

দিব্যেন্দু আসার পর মাস দুই বলতে গেলে শুধু আড্ডা দিয়েই কেটেছিল। এরই মধ্যে সে কি করবে সেই চিন্তা শশিশেখর অনেকবার করেছে। আর এই চিন্তার ফাঁকেই নিজের ভিতরের অশান্ত ক্ষোভটা একটু একটু করে প্রকাশও হয়ে গেছে তার কাছে। তার এই মন দিব্যেন্দু জানতই। সে সকৌতুকে হেসেছে, বলেছে, তুই খুব বদলাস নি দেখছি, তেমনি আছিস।

শশিশেখর জানত সে বদলায় নি। বদলানো মানে তো এক পলায়নী মনকে আশ্রয় করে ব্যর্থতার চোখে ধুলো দেওয়া। নিজেকে অনাবৃত করতে পেরে শশিশেখরের দ্বিধা গেছে। সে তর্ক করেছে, পুরুষকারের কথা বলেছে। কিন্তু এই থেকে তার বহুদিনের জমাট বাঁধা হতাশার রূপটাই বেশ ভালো করে দেখে নিয়েছে দিব্যেন্দু।

হঠাৎ একদিন সে প্রস্তাব করল, ব্যবসা করবি ?

শশিশেখর সচকিত।—কি ব্যবসা ?

কত রকম আছে, দেখে শুনে একটা কিছুতে লেগে গেলে হয়। শুধু বাতাসে মাথা ঠুকলে কেউ তো আর তোকে রাজা উজীর বানিয়ে দেবে না।

শশিশেখর কি এই চেয়েছিল। নইলে এই সামান্য ক'টা কথায় পুঞ্জীভূত উদ্দীপনার উৎসটাতে এ-ভাবে নাড়া পড়েছিল কেন ? কিছু না করে কিছু হতে চাওয়া হাস্যকরই তো বটে। তবু অনিশ্চয়তার চৌ-রাস্তায় এসে দাঁড়ালে হঠাৎ সংশয়ের দিকটাই যেমন বড় হয়ে ওঠে, তেমনি একটা অজ্ঞাত দুর্বলতা উঁকিঝুঁকি দিল প্রথমেই।

চাকরি ছাড়তে হবে ?

এখন চাকরি ছাড়বি কেন, ছাড়ার দরকার হলে তখন ছাড়বি।

একটা চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল শশিশেখর। দিব্যেন্দু কাপুরুষ ভাবে নি তাকে, বাস্তব চিন্তা করেছে। এবারে সন্তর্পণে সব থেকে বড় বাধার সম্মুখীন হল সে।—ব্যবসায় নামতে হলে টাকা তো অনেক লাগবে।

অনেক আর কোত্থেকে আসবে। কিছু লাগবে। একটু চিন্তা করে দিব্যেন্দু বলল, অল্প অল্প করে পাঁচসাত দশ হাজার পর্যন্ত লাগতে পারে। তোর কত আছে?

হাজার আষ্টেক···

ওতেই হবে। ভেবে ছাখ্—

ভাবার জন্যে বেশি সময় নেয় নি শশিশেখর। পাঁচ মিনিটও ভেবেছিল কিনা সন্দেহ। এরই মধ্যে বহু কষ্টে সঞ্চিত টাকার পাস বইয়ের পাতাটা চোখের সামনে একেবারে সাদা হয়েছে বার দুই। অনিশ্চয়তার চৌ-মাথার সব ক'টা দিকই বড় বেশি ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাকরি না ছাড়ার নিরাপত্তা বোধটুকু বিপরীত উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে। টাকাটা যদি লোকসানই হয় কি এমন ক্ষতি হবে? না-ই যদি হয় কিছু, তার থেকেও দিব্যেন্দুর পরাজয় অনেক বেশি। তার পরাজিত মুখখানা দেখার জন্যেও শশিশেখর আট হাজার টাকা লোকসান দিতে পারে।

ভাবা হয়েছে। আমি রাজি। কিন্তু একটা শর্তে—

দিব্যেন্দু তার দিকেই চেয়েছিল। দু'চোখ ঈষৎ উৎসুক এবার।

টাকা দিচ্ছি মা জানবে না।

দিব্যেন্দুর চোখে মুখে আবার নির্লিপ্ততার ছায়া পড়তে শশিশেখরের মনে হল যা সে বলতে চেয়েছে তা বলা হয় নি। অন্তত, দিব্যেন্দুর প্রতি মায়ের অবিশ্বাসের কোনরকম ইঙ্গিত সে করতে চায় নি। তাই তাড়াতাড়ি জবাবদিহি করল, আমার এই বড় হওয়ার ইচ্ছেটা মায়ের খুব ভালো লাগে না, তার মতে এই দিব্বি ভালো আছি। কিছু করতে পারলে তখন তো জানবেই, মিছিমিছি আগে থাকতে তার অশান্তি বাড়াতে চাই না।

শুনে দিব্যেন্দু মুচকি হাসল শুধু। কোনরকম মন্তব্য করল না। শশিশেখরের জেরার ফলে কি ব্যবসায় নামা যেতে পারে সেই আলোচনাও হল। কিন্তু তার শর্তে সে রাজি হল কিনা, অথবা সত্যিই কিছু ব্যবসা ফেঁদে বসবে কিনা সেটা সঠিক বোঝা গেল না।

এর ঠিক দুদিন বাদে শশিশেখর কলেজ থেকে ফিরে দেখে দিব্যেন্দু মায়ের সঙ্গে গল্পে মশগুল। এ-রকম অনেক দিনই দেখেছে। হাত মুখ ধুয়ে সে এসে বসতেই দিব্যেন্দু সাদা মুখে বলে বসল, আমরা দু'জনে ব্যবসায় নামছি পিসী—

শোনামাত্র শশিশেখরের মনে হল সেদিনের পরিকল্পনাটা দিব্যেন্দু মন থেকে ছেঁটে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা উষ্ণ হয়ে উঠেছিল কিন্তু ওর পরের উক্তি শুনে হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করল। সঠিক না বুঝে মা দুজনের দিকেই চোখ ঘোরালেন, তারপর বললেন, ওর তো কিছুতেই মন ওঠে না, তুই আবার ওর সঙ্গে জুড়লি কেন ?

এখনো জুড়িনি, জুড়ব কিনা ভাবছি। আমার এক কপর্দকও নেই—শশির আট হাজার টাকা আছে, ও তাই নিয়ে আমার সঙ্গে ব্যবসায় নেমে পড়তে রাজি—তবে গোপনে, তোমাকে কিছু জানানো চলবে না।

মায়ের ঈষৎ বিস্ময়ভরা দৃষ্টিটা ছেলের দিকে ফিরল। শশিশেখর বিড়ম্বিত, ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধও। দিব্যেন্দু হাসছে। কিন্তু পরিস্থিতি সে-ই সামলালো। বলল, আমরা বড় লোক হতে চেষ্টা করি এ নাকি তুমি চাও না, সেই ভয়ে তোমাকে গোপন। একেবারে রাজপ্রাসাদে ঢোকার পর জানতে পারো, তখন তো আর তোমার ভয়-ভাবনা কিছু থাকবে না।

ব্যাপারটা ঠাট্টা কি না মা তখনো ভালো করে বুঝে ওঠেন নি। দিব্যেন্দুর পরের কথাতেই বুঝলেন। এবারে দিব্যেন্দুর মুখে চপলতার লেশমাত্রও নেই। বলল, কিন্তু আমি আবার ও-রকম

শর্তে রাজি নই, শশীর মন বুঝে তুমি যদি চেষ্টা করে দেখতে বলো, আর, অতগুলো টাকার ব্যাপার···আমাকেও যদি খানিকটা বিশ্বাস করতে পারো, তা'হলে একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখা যেতে পারে কি হয়।

মা কয়েক মুহূর্ত চুপ একেবারে। চুপ করে থেকে প্রসঙ্গের গুরুত্বটাই উপলব্ধি করে নিলেন হয়ত। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তোকে বিশ্বাস করব না কেন, তুই থাকলেই ভরসা। কিন্তু ও বড় হলেই কি ঠাকুর ওর মনে শান্তি দেবে, ওর ভিতরটাই যে অশান্ত।

শশিশেখরের বুক থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। দিব্যেন্দু তার দিকে ফিরে বলল, কি রে, এ-ই ভালো হল কিনা বল্, এবারে নির্ভয়ে আট হাজার টাকা ওড়ানো যাবে—

রাগতে গিয়েও শশিশেখর হেসেই ফেলেছিল। মা-কে গোপন করার থেকে এই যে ভালো হল সেটা তার মনই বলে দিয়েছে। চোখ পাকিয়ে বলেছে, তুই এক নম্বরের বিশ্বাসঘাতক—

চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ—জীবন থেকে এই তিনটি বছর ছেঁটে দিতে পারলে কালের আয়নায় শশিশেখর দত্তগুপ্তর আজকের চেহারাটা একেবারে অন্যরকম দেখাতো। এই শশিশেখরকে সে নিজেই চিনতেও পারত না। আজ যা হয়েছে তার কিছুই হত না। কিন্তু ওই তিনটে বছর ঠিক তেমনি করেই এসেছে আর তেমনি করেই গেছে, যে ভাবে এলে আর গেলে জীবনের প্রবল প্রখর প্রাপ্তির বন্যাও শেষে হৃদয়ের মরুপথে এমনি করেই ধারা হারায়। যে-ভাগ্য সকলের ঈর্ষার বস্তু—শশিখেরের আবাল্য স্বপ্নের সেই ভাগ্যই তো বড় বিস্ময়কর ভাবে এসে হাজির হয়েছিল জীবনে। বিত্তরূপে এসেছিল, জায়ারূপে এসেছিল, সাফল্যের রূপে এসেছিল। কিন্তু ঘাতক রূপেও যে আসতে পারে সে সম্ভাবনা সে কল্পনাও করে নি।

করলে কালের আয়নায় আজকের শশিশেখরকে ঠিক এমনটা

দেখাতো না হয়ত। শশিশেখর কি করবে? ভাগ্যকে দুষবে?

তারই মূলধন নিয়ে ব্যবসায় নেমেছে দিব্যেন্দু। সেই ব্যবসায় সেও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে. শশিশেখর শঙ্কিত দ্রষ্টা মাত্র। সবই দিব্যেন্দু করেছে। মাল কেনা বেচার ব্যবসা। সেই ব্যবসার গতি শুরুতেই এত প্রখর নয় যে, শশিশেখর স্বপ্নের জাল বুনতে বসতে পারে। বরং আশা করতে ভয় হত। দিব্যেন্দুর নির্বিকার মুখের দিকে চেয়ে বড় রকমের কিছু উদ্দীপনার আলো দেখত না।

কিন্তু পাকা শিকারীর মতই স্নায়ু ঠাণ্ডা দিব্যেন্দুর। সে জানে কোন্‌বার কি দান ফেলেছে সে। এর ওপর তার অপরিসীম আস্থা। এদিকে অঙ্কের মাথাটা কাঁচা নয় শশিশেখরের। সে অঙ্ক বোঝে। এক-একটা চুক্তি মিটে যাবার পর কি গেলো আর কি এলো সে-হিসেবটা দিব্যেন্দু তার চোখের সামনে খোলাই ফেলে রাখে। এ যেন দুই মুখো চৌবাচ্চার সেই জলের হিসেব। এক মুখ দিয়ে এত জল বেরিয়ে যাচ্ছে আর এক মুখ দিয়ে এত আসছে—আসার পরিমাণ বেশি হলে চৌবাচ্চাটা কোনো এক ভবিষ্যতে যে ভরবেই সে-রকম এক আস্থা শশিশেখরের মনেও আসছে ক্রমশ!

আর ঠিক তখন থেকেই দিব্যেন্দুর পাশে নিজেকে কেমন নিষ্প্রভ মনে হত তার। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মুখ বুজে অমানুষিক পরিশ্রম করছে দিব্যেন্দু। বিনিময়ে খাওয়া-পরার খরচাটুকুই শুধু রাখে সে। তার বেশি এক কপর্দকও না। আর শশিশেখর কি করে? কলেজে চাকরি করে। নিশ্চিন্ত দিনাতিপাত। সন্ধ্যার দিকে বা রাত্রিতে শুধু আলোচনা হয় দিব্যেন্দুর সঙ্গে। শশিশেখরের ধারণা, মূলধন তার বলেই এটুকু করে দিব্যেন্দু। নইলে পরামর্শেরও কোনো দরকার ছিল না।

চাকরি ছাড়ার চিন্তাটা ক্রমশ পুষ্ট হচ্ছে শশিশেখরের। দেয়ার

স্থড বি নো বোট টু রিটার্ন—কোথায় যেন পড়েছিল। লক্ষ্যকে জয় করতে চাও তো ফেরার নৌকোটা আগেই নিশ্চিহ্ন করে দাও। তার এই চাকরির নৌকোটাই ফেরার নৌকো, সংশয়ের নৌকো। এটাই শশিশেখরকে যেন দুর্বল করে ফেলছে।

এক বছরের মধ্যেই শশিশেখর চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব করেছিল। দিব্যেন্দু বাধা দিয়েছে, কখনো ধমক দিয়েছে, ছাড়বি'খন দরকার হলেই ছাড়বি, এখন তোর জন্যে আটকে আছে কিছু?

আটকে না থাকাটাই অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। অথচ দিব্যেন্দুর যুক্তি অতি ছেলে মানুষেরও বোঝবার কথা। সংসার খরচ একটা আছেই। ব্যবসায় যেটুকু লাভ হচ্ছে সেটুকু ওতেই ঢালা হচ্ছে আবার। সেটুকু টেনে নিলে চেষ্টার মূলে ঘা পড়বে।

এই এক বছরে ব্যবসার ফসল আলাদা করে ব্যাঙ্কে রাখার মত উদ্বৃত্ত কিছু হয় নি। যে-টাকা এসেছে তা ঘরেই থেকেছে, দু'দশ দিনের মধ্যে আবার সেটা কাজে খাটানো হয়েছে। বছর খানেক বাদে দিব্যেন্দু একবার হাজার তিনেক টাকা এনে তার হাতে দিল। বলল, এ টাকাটা চট করে দরকার হবে না হয়ত, তোর অ্যাকাউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা করে দে, দরকার মত তুলে দিবি।

এই থেকেই চকিতে একটা সহজ বাস্তবের দিক মনে পড়ে গেল শশিশেখরের। ব্যবসার নামকরণ বা কোনো আনুষ্ঠানিক দলিল-পত্র হয় নি। শশিশেখর প্রবল আপত্তি জানালো, কেন, ব্যবসার টাকা আমার অ্যাকাউণ্টে থাকবে কেন?

তোর ব্যবসার টাকা আবার কার অ্যাকাউণ্টে থাকবে?

আমার! শশিশেখর যেমন বিস্মিত তেমনি আহত।—তোর নয়?

ওর হাসি দেখে শশিশেখরের গা জ্বলেছে সেদিন। দিব্যেন্দু বলেছে, আমার আবার কি, আর আমি টাকা দিয়ে কি-ই বা করব।

হিমালয়ের মাথায় বসে গাঁজা খাবি। বাজে কথা বলবি তো সব দেব এখানেই শেষ করে।

দিব্যেন্দু হেসে তর্ক করেছে, কিন্তু টাকা তো সব তুই দিয়েছিস—

আর কাজ তো সব তুই করেছিস। দয়া করে তুই আমার হয়ে কিছু টাকা রোজগার করে দিবি—কেমন?

দিব্যেন্দু লেখা-পড়ায় রাজি না হলে সেদিনই হয়ত সব চুকে-বুকে যেত। শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি হতে হয়েছিল। দু'জনে সমান অংশীদার। টাকা নেই বলে দিব্যেন্দুকে অনুকম্পা দেখাতে চেষ্টা করবে না শশিশেখর! মূলধনের আট হাজার টাকার অর্ধেক চার হাজার টাকা ব্যবসা দাঁড়ালে নিজের অংশ থেকে দিব্যেন্দু তাকে শোধ করে দেবে। তাহলে আর সমস্যা কিছু থাকল না—দু'জনের সমান মালিকানা।

দত্তগুপ্ত অ্যাণ্ড বোস ঃ পার্টনারস্—এই নামই রেজিস্ট্রি হয়েছে, এই নামেই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খোলা হয়েছে। এই ছোট পরিকল্পনাই দু'জনের যুক্ত ইচ্ছার বেগে একদিন প্রকাণ্ড মহীরুহের মত শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে। অবশ্য ওই প্রথম তিন বছরেই তা হয় নি—ওপরে ওঠার সোপানগুলো শক্তপোক্ত হয়েছে তখন—স্বর্ণাভ প্রতিশ্রুতির স্পষ্ট ঝিকিমিকি দেখা গেছে।

যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গ্রাসে দুনিয়ার কতখানি খোয়া গেছে, শশিশেখর সেই হিসেব জানে না। কিন্তু তার হৃদয় দুনিয়ায় যে রাতারাতি একটা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভাগ্যোদয়ের প্রবল বন্যায় এক এক সময় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার দাখিল। ভালোমত যুদ্ধ বাধার আগেই খোলামকুঁচির মত চাকরি ছুঁড়ে ফেলে দিব্যেন্দুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা তাদের—এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস। যুদ্ধের সময় আমদানী নেই—থাকবে না যে সেই পূর্ব নিশানা দিব্যেন্দু আগেই দেখে রেখে ছিল। তাই আমদানীর পর্বটা

সময়ে মেরে রেখেছিল। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে ব্যবসার অস্তিত্ব ঘুচে যেতে পারত। কিন্তু তার বিনিময়ে বহুগুণ ঘরে এসেছে। যুদ্ধের সময় আরো দশ রকমের ব্যবসা করেছে। ধুলো মুঠি ধরলে সোনা হয়েছে। টাকা টাকা টাকা—এমন মুষলধারে টাকার বৃষ্টি শশিশেখর বাস্তবে কখনো কল্পনা করে নি।

॥ ছয় ॥

এই সাফল্যের নয়, গোড়ার ওই তিন বছরের প্রতিশ্রুতির অধ্যায়ে শশিশেখরের যৌবন বাস্তবেও বড় রকমের ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল একটা।

হয়েছিল অলকা নন্দীকে কেন্দ্র করে।

জীবন ধারণের মূল সমস্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস হাস্যকর বোধহয়। সে-কথা ভেবে আজ শশিশেখর হাসতেও পারে। কিন্তু সেদিন হাসি ছিল না। এতদিনের লক্ষ্য-বর্তিকাটাও যেন দূরে সরে যাচ্ছিল সেদিন। শশিশেখর বিড়ম্বিত বোধ করেছে, নিজের ওপর বিরক্ত হয়েছে, বার বার এক সম্ভাব্য উষ্ণ বিস্মৃতি সবলে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। ভেবেছে সার্থকতার চূড়ায় উঠে দাঁড়ালে অমন অনেক অলকা নন্দীর দেখা মিলবে।

কিন্তু শেষে হার মেনেছে। হার মেনে বাসনার তটের দিকে সংগোপনে পা বাড়িয়েছে। সমস্যা কাকে বলবে শশিশেখর? জীবনের কোন্ চাহিদাটা না মিটলে চলে? বহুজনের স্তুতির পিঞ্জর থেকে অলকা নন্দীর সীমন্তে অলকা দত্তগুপ্তর ছাপ মেরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে আসতে না পারলে বস্তুতন্ত্রীয় বৈভব-প্রতিশ্রুতির শেষ ধাপে দাঁড়িয়েও সব ছেড়েছুড়ে শশিশেখরই বিবাগী হত কিনা কে জানে?

কিন্তু অলকাকে সে টেনে আনে নি, দিব্যেন্দুই তাকে ওর

ঘরে এনে পৌঁছে দিয়েছিল। দিব্যেন্দু পারে। দিব্যেন্দুর পারার ভুলকূল নেই।...বুকের কোন্ অজ্ঞাত কোণ থেকে একটা অসহ্য ব্যথা যেন অবুঝের মত আক্রমণ করতে আসছে শশিশেখরকে। তার সঙ্গে যোঝার চেষ্টায় সমস্ত মুখ বিকৃত হয়ে উঠল বারকতক।

কিন্তু এই রকমই হবার ছিল। যা হবার ছিল তাই হয়েছে। নইলে এত বড় দুনিয়ায় একজন অলকা নন্দীর সঙ্গে একজন শশিশেখর দত্তগুপ্তর এই যোগাযোগ ঘটত না। ব্যক্তি জীবনের সব যোগাযোগই এমনি বিচিত্র হয়ত। কিন্তু আসলে ভবিতব্যের খুব স্বাভাবিক সুতো এগুলো।

দিব্যেন্দুর ঘরে শশিশেখর হামেশাই আসত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটত সেখানে। এই সময় আট দশটা বাড়ির পরে রাস্তার মোড়ের ওপর একটা বড় বাড়ির দিকে প্রায়ই চোখ পড়ত তার। ওখানে বিকেলের দিকে অনেক সুশ্রী তরুণের আনাগোনা দেখত। কারণ বুঝতে দেরি হয় নি। বুঝতে কেন, স্বচক্ষেই দেখেছে। কারণ একটি মেয়ে। রূপসী মেয়েই বটে। গাড়ি চড়ে বেরুতে দেখে, ফিরতে দেখে। কখনো কখনো দোতলার বারান্দার সামনের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে। যে দৃষ্টি নিজের সম্বন্ধে সচেতন, অপর রূপ-রসিকের সম্বন্ধেও। সচেতন, কিন্তু অকরুণ নয়।

এই অলকা নন্দী।

দিব্যেন্দুর মুখে এই মেয়ের সম্বন্ধে হালকা খবর শুনেছে কিছু কিছু। এদিকের অভিজাত ক্লাবের ছেলেদের মধ্যে তাকে নিয়ে বেশ সূক্ষ্ম অথচ রুচিসম্পন্ন রেষারেষির মজাদার ঘটনা শুনেছে দুই একটা। ক্লাবের কালচারাল ফাংশানে মেয়েটি নাকি ভালো অভিনয় করে। দিব্যেন্দুকে একবার ওদের পাল্লায় পড়ে মোটা টাকার টিকিট কাটতে হয়েছিল—সে নিজের চোখেই দেখেছে।

শশিশেখর বার কয়েক খুব কাছের থেকেও দেখেছে অলকাকে।

নন্দীকে। এখানে আসা-যাওয়ার মুখে এক-একদিন গাড়িতে উঠতে দেখেছে, নয়তো গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে. দোতলার রেলিংয়েও দেখেছে। এমনি দেখার ফলে দিব্যেন্দুকে একদিন বলেছিল, মেয়েটি সত্যি সুন্দরী তো, কাছের থেকে দেখলাম।

দিব্যেন্দু কি একটা হিসেব দেখছিল। গম্ভীর দৃষ্টিটা তার দিকে ফেরালো।—কত কাছ থেকে?

আসার সময় দেখলাম, মোটর থেকে নামল।

আর দেখিস না, অনেক জোড়া চোখ তাকে ছেঁকে আছে।

শশিশেখর আরো অনেকবারই দেখেছে, দিব্যেন্দুকে আর বলে নি শুধু। ওটার রস-কস কত খুব জানা আছে, নইলে এক মেয়ে নিয়ে পালিয়ে বিবেকের দংশনে নিজের হাত পোড়ায়! দিব্যেন্দুর কাছে আসা দরকার বলেই আসত শশিশেখর। কিন্তু এই আসার পিছনে একটা প্রায় অগোচরের ভালো লাগার আমেজ লাগত। মোড়ের কাছে আসার আগে থেকেই অবাধ্য চোখ দুটো একটাই বাড়ির দোতলার রেলিংয়ের দিকে ছুটত। সেখানটা ফাঁকা দেখলে রাস্তাটা পেরিয়ে এই ফুটপাতে আসাটা দরকার হয়ে পড়ত। জানলাটা পেরিয়ে ভিতরের ঘরেও তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়—বসে হাসি মুখে কারো সঙ্গে গল্প গুজব করছে।

অতনু-র বক্ষস্থলে কতটা বিদ্ধ হয়েছে শশিশেখর নিজেও তখন ভালো করে জানত না।

বিধাতা সদয় ছিল। জানার মত যোগাযোগ ঘটেছিল।

যুদ্ধের মধ্য অবস্থা তখন। দু'জনে দিবারাত্র পরিশ্রম করে। অভাবিত টাকা আসছে, কিন্তু দত্তগুপ্ত অ্যাণ্ড বোসের বনিয়াদ পাকা করতে আর পরিধি বিস্তার করতে পলকে সেই টাকা বেরিয়েও যাচ্ছে আবার। ভাগ্যটা তখন যেন বাজীর দান ফেলে জয় করে নেবার বস্তু। যত বড় করে দান ফেলবে, ততোগুণ হয়ে ফিরে আসবে। আসবেই—এরকম একটা আস্থা বদ্ধমূল দু'জনের।

অতএব সঞ্চয়ের দিকে না তাকিয়ে বড় বড় আরো বড়—অনেক বড় দান ফেলার উদ্দীপনায় মেতে ছিল দু'জনে। বড় কণ্ট্রাক্ট ধরেছে, কিন্তু সেটা সম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে আর ততো বড়. মনে হয় নি, আরো বড় চাই। অতএব টাকা ঢালো, দরকার হলে সব সঞ্চয় ঢালো, দরকার হলে যা আছে তার দ্বিগুণ সংগ্রহ করে এনে ঢেলে দাও।

প্রকাশ্যে এই বেপরোয়া উদ্দীপনা দিব্যেন্দুর থেকেও শশিশেখরের অনেক বেশি। অবশ্য তারও সায় না থাকলে শশিশেখর নিশ্চয় এতটা ভরসা পেত না। কিন্তু ভাগ্যোদয়ের সব থেকে বড় সন্ধিক্ষণেই শশিশেখরের চালচলনের কেমন একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করল দিব্যেন্দু। তার কাজের গতিতে কেমন ছেদ পড়ছে, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কোথায় একটু টান ধরেছে।

বিধাতা সদয় ছিল বলেই বোঝা গেল, কোথায়।

কলকাতায় বোমা পড়েছে। এতদিনের রুদ্ধ আতঙ্কটা হঠাৎ বুঝি আকাশ ফেটে শহরের বুকে ভেঙে পড়েছে। একদল মানুষ জীবন নিয়ে পালাতে শুরু করেছে। দিব্যেন্দু যে বাড়িতে থাকত সেই বাড়ির বাসিন্দারাও সেই হিড়িকে নাম লেখাল। তারা বাড়ি ছেড়ে পশ্চিমে কোথায় চলে গেল। এর আগেও বাড়ি পাওয়া এত দুর্লভ ছিল না—আর সেই পালানোর প্রহসনে তো বাড়ি রক্ষা করা নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্কট। শশিশেখরের সঙ্গে পরামর্শ করে দিব্যেন্দু সস্তায় গোটা বাড়িটাই ভাড়া নিয়ে ফেলল। কাজের চাপের দরুন দু'জনের একসঙ্গে থাকা দরকার—তাছাড়া বাড়িতেও একটা অফিসের মত থাকলে সুবিধে। মাল রাখার মত বড় পরিসরও প্রায়ই দরকার হয়।

মা-কে আর মহাদেওকে নিয়ে শশিশেখর সানন্দে এই বাড়িতে উঠে এলো।

এবং সেই থেকে এক বাড়ির দিকে এতদিনের বিক্ষিপ্ত লক্ষ্যটা কেন্দ্রীভূত হয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকল। শশিশেখরের

মনে হয়, কি একটা লোভনীয় অনুভূতি বুঝি অনেক দিন ধরে চুপিসারে তার পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তারপর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কখন সেটা এগিয়ে এসেছে—শশিশেখর তখনো তাকে উপেক্ষা করেছে। কর্মব্যস্ততার আড়াল নিয়েছে। কিন্তু শশিশেখর বিড়ম্বিত, যখন দেখা গেল ওই অনুভূতিটা গোটাগুটি দখল নিতে আসছে। তার অমোঘ লক্ষ্য, অব্যর্থ সন্ধান।

এই অনুভূতির সবটাই অলকা নন্দীকে ঘিরে।

কাছাকাছি এক বাড়ি থেকে একজনের এই নতুন মনোযোগ অলকা একেবারে লক্ষ্য করে নি তা নয়। যেতে আসতে দুই একবার দৃষ্টি বিনিময় ঘটেছে। দোতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়েও দূরের জানলার ধারে তাকে ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান দেখেছে। দেখেও কোনদিন হয়ত অলকা তেমনি দাঁড়িয়েই থেকেছে। পুরুষের এই মনোযোগ দেখে সে অভ্যস্ত। কি করতে পারে সে, বনে জঙ্গলে তো আর পালিয়ে যেতে পারে না। আর, পালানোর দরকারই বা কি। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখলে সে বরং নির্দোষ কৌতুক অনুভব করে, অকরুণ হয় না।

ক'দিন না যেতে শশিশেখর তার এই কৌতুকের দিকটা টের পেয়ে গেল। অলকা বারান্দার রেলিংয়ে দাঁড়িয়েছিল—পাশে আর একটি মেয়ে। তার বান্ধবী স্থানীয় কেউ হবে হয়ত। শশিশেখর সচকিত হঠাৎ। মনে হল, অলকা নন্দী ইশারায় পার্শ্ববর্তিনীকে এই জানলার দিকটাই দেখিয়ে দিল। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি জানলার গরাদ ভেদ করে দৃষ্টি চালিয়ে দিল। তারপর দু'জনের হাসি-হাসি মুখে কি কথা-বার্তা হল শশিশেখর শুধু অনুমানই করতে পারে।

আত্মাভিমান কম নয় তারও। পুরুষকার বোধও আছে। সেই দিনই সে জানলা পরিত্যাগ করল। আর সেই দিনই সন্ধ্যায় ওদের অভিজাত ক্লাবে হানা দিল। মুরুব্বি সদস্যদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এবং মোটা চাঁদা দিয়ে সভ্য হল। তার পরের সন্ধ্যায়

অলকা নন্দীর সঙ্গে সামনাসামনি আলাপ। অন্যের মারফত আলাপ হওয়ার আগে পর্যন্ত সকলকে উপেক্ষা করে নতুন সদস্যদের গম্ভীর মনোযোগ যে তারই প্রতি সন্ন্যস্ত সেটা অলকা বারকয়েক অনুভব করেছে। জানলায় বসে চুরি করে দেখার ধার ধারে না এটাই যেন বুঝিয়ে দিতে চায়।

আলাপ হতে অলকা বলল, আপনি তো আমাদের বাড়ির কাছেই থাকেন।

হ্যাঁ, খুব কাছে।

জবাব শুনেও অলকা কৌতুক অনুভব করেছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে চায় নি।

এর পর শশিশেখরের আচরণে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। সে-যে এখানকার সকলের একজন নয় সেটা প্রমাণ করার তাগিদ ছিল। জানলার ধারে আর বসে থাকে নি, রোজ ক্লাবে যায় নি, যাতায়াতের পথে অবাধ্য ঘাড়টাকে শাসন করেছে, সংযত করেছে, আর এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও একদিনও তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে নি। এই সবই অলকার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায়। কিন্তু তাতে সফল কতটুকু হয়েছে নিজেরই সংশয়। যত সংশয় ততো যাতনা। রমণীর কাল্পনিক হৃদয়-দাক্ষিণ্যে যৌবন সাম্রাজ্যের কতটুকু আর বিস্তার সম্ভব? কল্পনায় কতক্ষণ আর বাস্তবের তাপ যোগানো চলে?

বিড়ম্বনার একশেষ শশিশেখরের। তার মনের আঙিনায় সর্বদা যে নারী ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে বাস্তবে যে সে নাগালের ধারে কাছে নেই এই সত্যটা কত আর উপেক্ষা করে থাকবে! ফলে, একটা যাতনাই শুধু হাড় পাঁজরের ভিতর দিয়ে অবিরাম ওঠা-নামা করতে থাকে। এই যাতনার রীতি শশিশেখরের জানা ছিল না।

দিব্যেন্দু সদা ব্যস্ত। অবশ্য ওর ব্যস্ততা বোঝার উপায় নেই। ওর দিকে চেয়ে দুনিয়ায় কোনো কিছুর জন্যে তাড়া বা তাগিদ আছে মনে হয় না। তবু শশিশেখর জোরালো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার

সময় নেই। জেনে নিশ্চিন্ত ছিল। সদ্য বর্তমানের এই নোঙর ছাড়া, মনটাকে শুধু ওর কাছ থেকেই আড়াল করতে চেয়েছিল শশিশেখর। কিন্তু এরই মধ্যে ওর অদৃশ্য দুটো চোখ যে এভাবে আগলে আছে তাকে ভাববে কি করে।

সেদিন ধরা পড়ে নাজেহাল। নিরুপায় শশিশেখর শেষে হেসেই ফেলেছিল। আর মনে মনে তারপর ওর ওপরেই নির্ভর করেছিল।

দিব্যেন্দু ব্যবসা-সংক্রান্ত একটা জরুরী কাজের ভার দিয়েছিল তাকে। দিন তিনেক বাদে ওমুক সন্ধ্যায় ওমুক লোকের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে কোনো একটা ব্যাপারের ফয়সালা করে আসতে হবে। দিব্যেন্দুর নিজের তখন অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে—তাই সে নিজে পারবে না।

দরকারী কাজের ভার পেয়ে শশিশেখর হঠাৎ যে খুশি হয়ে উঠেছিল তার ভিন্ন কারণ। এটা যোগাযোগ ভেবেছে, নইলে এত দিন থাকতে ওই দিনই তার ওপর জরুরী কাজের ভার পড়ল কেন? আত্মাভিমানে ওই সন্ধ্যাটার থেকেই তো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অনেক যুঝেছে সে।

ক্লাবের ত্রৈমাসিক অভিনয় রজনী সেটা। শৌখিন অভিনয় হলেও এ অভিনয়ের নাম আছে বাজারে। নামজাদা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করা হয় এজন্যে। টিকিটের দাম চড়া। কিন্তু একটি আসনও খালি পড়ে থাকে না। মোটা ডোনেশানও দেন অনেকেই। অলকা নন্দী চাঁদার খাতা নিয়ে বেরুলে তো কথাই নেই। আর অলকাই বা বেরুবে না কেন? এ-তো আর পেশাদারী অভিনয় নয়। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে টাকা যা থাকে—সব তো পরহিতেই দিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ক্লাবের সুনাম বাড়ে, এই যা। অভিনয় হবে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী। শশিশেখর শুনেছে আরো চার পাঁচবার এই একই নাটকের জমজমাট অভিনয় হয়েছে। কাগজে বিজ্ঞাপন পড়লে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক এসে টিকিট না পেয়ে

হতাশ হয়ে ফেরে। অলকা—নন্দিনী। অত্যুৎসাহী সভ্যদের হাব-ভাবে মনে হয় নন্দিনীর ভূমিকায় অলকা নন্দীর জুড়ি নেই।

সায়েন্স পড়া শশিশেখর দত্তগুপ্তর তখনো রক্তকরবী পড়াই হয় নি। লজ্জা গোপন করে নাটকটা চুপি চুপি পড়ে নিল সে। পড়ে খুব যে একটা দাগ কেটে বসল মনে তা নয়। কি রকম যেন অদ্ভুত লাগল।

পুরনো নাটক অভিনয় করতে হলে রিহার্সাল খুব বেশি দরকার হয় না। কে কোন্ ভূমিকায় নামবে জানা, পার্টও প্রায় মুখস্থ। তবু অল্প-স্বল্প রিহার্সাল যা হল তা দেখে শশিশেখরের অভিনব কিছু লাগল না। তাও একটানা রিহার্সাল নয়। পরিচালকের নির্দেশ মত মাঝের এক একটা দিক ঝালিয়ে নেওয়া। তার মধ্যেও সভ্যদের হাস্য কৌতুক টীকা টিপ্পনীর ছেদ। শশিশেখরের তখনো ধারণা, আসলে অলকা নন্দীই আকর্ষণ—নন্দিনী নয়। তা সে রক্ত-করবীই হোক আর শ্বেত করবীই হোক।

সে-যে টিকিট কাটে নি, স্ফীত অঙ্কের ডোনেশান দিয়েছে তা কি অলকাও জেনেছিল? এর পর সভ্যরা তাকে অবশ্য একটু বেশি খাতির করেছিল, আর অলকাও খুশি মুখে কথা কয়েছিল তার সঙ্গে।

আপনি এর আগে আমাদের রক্তকরবী দেখেন নি তো?

শশিশেখর মাথা নেড়েছে, বলেছে, দেখা হয়ে উঠে নি।

আপনি খুব ব্যস্ত থাকেন বুঝি, ক্লাবেও তো খুব কমই আসেন।

শশিশেখর নিজের সুবিবেচনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে তা'হলে। দৃষ্টির নাগালে বাড়ি—অথচ একদিনও যে যায় নি এও খেয়াল করে নি শশিশেখরের মনে হল না। জবাবে সে হেসেছিল শুধু। কিন্তু এই অন্তরতুষ্টি বেশিক্ষণ থাকে নি। বাড়ি ফিরে নিজেকে কেমন নির্বোধ মনে হয়েছে।

এরপর হঠাৎ সে স্থির করেছে, অভিনয় দেখতে যাবে না। যাবে কি যাবে না এই নিয়েই নিজের সঙ্গে যোঝাযুঝি। মনে

মনে আবার সেই নির্বুদ্ধিতার মধ্যেই মাথা গলালো সে।...মোটা টাকা ডোনেশান দিয়েও থিয়েটারে গেল না এটা সকলেই এক সময় খেয়াল করবে। একটা দৃশ্যও কল্পনা করতে পারছে। যে দৃশ্যের নায়ক শশিশেখর নিজে।...রক্তকরবীর প্রশংসায়, নন্দিনীর প্রশংসায়—অর্থাৎ অলকা নন্দীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে। সে-ই শুধু নীরব। এই নীরবতা মনঃপূত হবে না অলকা নন্দীর। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করবে, কি আপনি চুপচাপ যে, আপনার ভালো লাগে নি বুঝি?

শশিশেখর সত্য গোপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে সপ্রতিভ জবাব দেবে, তা কেন...সকলেই তো ভালো বলছে।

অলকা ভ্রূকুটি করবে। যখন হাসে না তখনো তার ভ্রূ-ভঙ্গিটুকু সুন্দর। বলবে, সকলের কথা ছেড়ে দিন, আপনার কেমন লাগল বলুন।

শশিশেখর এইবার ধরা পড়বে। নিরুপায় হাসি টেনে সত্য স্বীকার করবে।—আমার হয়ে উঠল না, কাজে আটকে গেলাম, তাই ভয়ে ভয়ে চুপ করে আছি। এঁরা যে রকম প্রশংসা করছেন বড় আফশোষ হচ্ছে...

অলকার কাছে অভাবিতই লাগবে হয়ত। অবাক হয়ে বলবে, কি আশ্চর্য আপনি থিয়েটারে আসেন নি মোটে!

নিজের মনেই শশিশেখর হাসছিল মৃদু মৃদু। সে যেন সামনে দেখছে অলকা নন্দী মনে মনে আহত হয়েছে। তার ধারণা সুরূপা রমণী পুরুষের নির্লিপ্ততা সইতে পারে না। তখন সে আঘাত দেবার জন্যেও কাছে আসে। কাছে এসে ধরাও দেয়। ধরা দিয়ে হার মানায়। দৃশ্য সম্পূর্ণ হবার পরে আবারও কেমন নির্বোধ মনে হতে থাকে নিজেকে। তবু গোঁ চেপে বসে কেমন। যাবেই না। অথচ চোখের তৃষ্ণা বার বার এই সংকল্পটা বাতিল করে দিতে চাইছে। না গেলে পাবে কি? বাস্তবে অলকা নন্দীকে এমন নিবিড় করে দেখার সুযোগ আর কবে পাবে?

এরই মধ্যে দিব্যেন্দু কাজের ভার চাপাতে সে যেন বেঁচে গেল। না, শশিশেখর ইচ্ছে করে কিছু ছেলেমানুষি করছে না—সত্যিই তো কাজ আছে। তার কাজের থেকেও অলকা নন্দীর থিয়েটার বড় নাকি!

কিন্তু সেই দিনটা যখন এলো, শশিশেখর কাজের কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। দিব্যেন্দুও আর মনে করিয়ে দেয় নি। তেমন জরুরী হলে নিশ্চয় দিত। সভ্যদের চোখে মুখে এক ধরনের চাপা চঞ্চলতা দেখেছে শশিশেখর। সেই চঞ্চলতা অলকা নন্দীকে ঘিরে। ওই দিন সে যেন নিজের ওপর থেকে একটা নিষেধের পরদা সরিয়ে দিয়ে সকলের সামনে এসে দাঁড়াবে—কারো দৃষ্টি-ভোজে বাধা পড়বে না। সকলের চোখে মুখে সেই আমন্ত্রণ লগ্নের প্রতীক্ষা।

রঙ্গমঞ্চে একেবারে সামনে আসন নিয়েছে শশিশেখর। তারপর একসময় নাটক শুরু হতে স্থান কাল ভুলেছে।

এই রক্তকরবীই সে পড়েছিল কিনা জানে না। মোট কথা, নিভৃতের আবেগের দিকটা তখন আর এক জায়গায় বাঁধা পড়ে ছিল বলেই নাটক পড়ার মধ্য দিয়ে প্রাণের স্পর্শ মেলে নি। কিন্তু চোখের সামনে সেই প্রাণের তরঙ্গ দেখে শশিশেখর অভিভূত হয়ে বসে রইল সারাক্ষণ। এখানে অলকা নন্দীর বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নেই। দূরের আকাশ যেমন সমুদ্রে মিশে আছে মনে হয়, অলকা নন্দী যেন তেমনি করেই ছড়িয়ে নন্দিনীতে এসে মিশেছে। অলকার হাসি, অলকার সরলতা, অলকার বেদনা, অলকার ফুলসাজ—এই সব কিছু নিয়েই সে নন্দিনীকে দেখেছে—অলকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। আর, দেখেছে বড় কাছের থেকে। মঞ্চ সংলগ্ন চড়া মাশুলে আসন নিয়েছে বলে কাছে নয়, যে-সহজ স্বতোৎসারিত মাধুর্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ, সেই কাছের থেকে। নারীর যে মাধুর্য আর মহিমা পুরুষের হাতে গড়া বহু অবরোধ ভেঙে দিয়ে অনায়াসে হৃদয়ের অন্তঃপুরে

প্রবেশ করতে পারে—অলকা নন্দী বুঝি সেই মাধুর্য আর মহিমা নিয়ে এই সন্ধ্যায় তার সামনে দাঁড়িয়ে। নন্দিনীর সাজে অলকা নন্দীকেই যেন বড় সম্পূর্ণ করে দেখে নিল সে।

প্রাক্ বিশ্রামের ড্রপ পড়তে পরিচিত মুগ্ধ দর্শকরা আসন ছেড়ে গ্রীন রুমের দিকে ছুটল তাকে অভিনন্দন জানাতে। নিজের অগোচরে শশিশেখরও উঠল। অভিনন্দন জানাতে নয়, কিছু বলতেও নয়—শুধু অলকাকে একবার দেখতে।

দেখল। অলকার হাসিমুখ ঈষৎ শ্রান্ত। সোৎসাহে যারা বাহবা দিচ্ছে তাদের দলে ভেড়ে নি। তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে তেমন সচেতনও নয়। অদূরে একা দাঁড়িয়ে সে নিঃশব্দেই দেখছিল। যে-দেখার নাম সৃষ্টি—সেই সৃষ্টির এক নীরব প্রতিক্রিয়া চলছিল শশিশেখরের ভিতরে ভিতরে।

অলকার চোখ গেল তার দিকে। এই একজনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলার চেষ্টাটা সে আগেও উপভোগ করেছে। হাসি মুখে কাছে এগিয়ে এলো। পুরনো স্তুতির থেকে নতুন স্তুতির আকর্ষণ বেশি। শশিশেখর নতুন। অলকা বলল, আপনার কেমন লাগছে বলছেন না তো?

অলকা কিছু না বললেই ভালো হত বোধ হয়। ওই শ্রান্ত হাসি হাসি মুখেই শুধু তার দিকে চেয়ে থাকত যদি—শশিশেখরের মানসিক অবস্থাটুকুর সঙ্গে ভারি মিলত। তার বদলে এই প্রশ্নটা সচেতন করল তাকে। যে-অলকা এতক্ষণ নন্দিনীতে মিশে ছিল সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি। তার সামনে যে এসে দাঁড়াল, যে কথা বলল, তার সবটাই এখন অলকা নন্দী। যার দেহের রেখায় রেখায় আমন্ত্রণ আছে, সূক্ষ্ম ইশারা আছে, আবার নিষেধও আছে। যে দেহকে কেন্দ্র করে শশিশেখর এক দুর্বহ যাতনা ভোগ করে চলেছে। দুর্বহ অথচ নিরুপায় পুরুষের যাতনা।

শশিশেখর হাসতে চেষ্টা করল। মাথা নেড়ে অস্ফুট স্তুতি জানাতেই চেষ্টা করল।—খুব ভালো।

কিন্তু তার চোখে চোখ রেখে অলকা কি হঠাৎ একটু অস্বস্তি বোধ করেছে? হাসি মুখখানা কি পলকের জন্য সচকিত হয়েছিল একটু। সহজ মুখেই সে অবশ্য আর এক দিকে চলে গেছে, তবু শশিশেখরের খটকা বাধল একটু। পুরুষের স্তুতি সে অনেক শুনেছে। পুরুষের গোপন কামনার আঁচ সে কখনো টের পায় নি বললে শশিশেখরই হাসবে। কিন্তু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অলকা নন্দী কি তার দিকে চেয়ে পুরুষের অনাবৃত ক্ষুধার ধাক্কা খেয়ে গেল একটা? শশিশেখর জানে না। নিজের এই দুটো চোখের ওপর কয়েকটা মুহূর্তের জন্য অন্তত শশিশেখরের একটুও দখল ছিল না।

নিজের আসনে এসে বসেছে আবার। ড্রপ উঠেছে। অভিনয় শুরু হয়েছে। এরপর নন্দিনী আর অলকা নন্দীকে এক করে দেখতে শশিশেখরের সময় লেগেছে খানিক। তার তৃষ্ণার্ত দুই চোখ মঞ্চের দিকে চেয়ে যৌবনের রসদ খুঁজছে। যা খুঁজেছে তাই পেয়েছে। পেয়ে যাতনা বেড়েছে। কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্য নয়। অলকা নন্দীর থেকে নন্দিনীর দাক্ষিণ্যের মহিমা অনেক—অনেক বড়। শশিশেখরের আবার বিস্মৃতি এসেছে, আবার দু'জনে এক হয়ে গেছে কখন। শশিশেখর আবার তন্ময় হয়ে গেছে।

অন্যমনস্কের মতই বাড়ি ফিরেছিল। তার ভিতরের মানুষটা তখনো অভিভূত। সোজা হল একটু। শশিশেখর জামা-কাপড় বদলে হাত-মুখ ধুয়ে না আসা পর্যন্ত দিব্যেন্দু একটা কথাও বলল না। শুধু অলস চোখে লক্ষ্য করে গেল তাকে। শশিশেখর সেটুকু অনুভব করেছে, করে অস্বস্তি বোধ করেছে, তবু কাজের কথাটা একবারও মনে পড়ে নি তার। হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বসতে সময় নিয়েছে, এই ফাঁকে খানিক আগের তন্ময়তা থেকে নিজেকে টেনে তুলতে চেষ্টাও করেছে। পারে নি। বরং মনে হয়েছে, যে রূপের জোয়ারে মন-প্রাণ ঢেলে এতক্ষণ অবগাহন করে এলো, তার রেশ এখনই কেটে না গেলেই ভালো হত। ঘরে ফিরে দিব্যেন্দুকে না দেখলেই সে বোধকরি খুশি হত।

ফিরে এসে চৌকিতে বসতে দিব্যেন্দু খুব সাদাসিধে মুখে জিজ্ঞাসা করল, দেখা হল ?

শশিশেখর থতমত খেল কেমন।···কি ?

ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে কথা-বার্তা পাকা করে এলি না আবার টানা-হেঁচড়া চলবে ?

সেই মুহূর্তে মনে পড়ল সে কাজের ভার নিয়েছিল। দিব্যেন্দু তাকে কাজের ভার দিয়েছিল। এক বিপরীত ধাক্কায় শশিশেখর হঠাৎ যেন বাস্তব সম্বন্ধে সজাগ হল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর বিরূপ, কিছুটা দিব্যেন্দুর ওপরেও। গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল সে। মাথা নেড়ে কোন্ প্রশ্নের জবাব দিল নিজেও জানে না।

দেখা হয় নি ?

না।

গেছলি ?

শশিশেখর আবার মাথা নাড়ল, যায় নি।

সে আর কিছু বলবে ভেবেই দিব্যেন্দু অপেক্ষা করল একটু। বলল না দেখে আবার জিজ্ঞাসা করল, টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করেছিস তো, না তা-ও করিস নি ?

বিপাক এড়ানোর চেষ্টাটাই সম্ভবত অসহিষ্ণুতার কারণ হয়ে দাঁড়াল। প্রসঙ্গটা ছেঁটে দেবার মত করেই বলল, কিছুই করিনি, কাল গিয়ে দেখা করে আসব।

দিব্যেন্দুর গম্ভীর দৃষ্টিটা কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মুখের ওপর থমকালো। এর বেশি বিরক্তি প্রকাশ করে না সে। তারপর ঠাণ্ডা হল, শেষে নির্লিপ্ত।

শশিশেখর একবার মায়ের খোঁজে যাবে কিনা ভাবছে। দিব্যেন্দু হঠাৎ আলতো করে জিজ্ঞাসা করে বসল, থিয়েটারে গেছলি ?

শশিশেখর সচকিত। সে-ই যে বয়সে দু'মাসের বড় ওর থেকে সেটা চেষ্টা করে মনে রাখতে হচ্ছে। থিয়েটারের খবর অবশ্য

ক'দিন ধরেই কাগজের বিজ্ঞাপনে বেরুচ্ছিল। তবু বিস্ময়। মাথা নাড়ল। গিয়েছিল।

কেমন দেখলি?

মন্দ না।

ওর মুখের দিকে চেয়ে শশিশেখরের খটকা বাধল কেমন। মনে হল, এই নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যটা নকল। আসলে ভিতরে ভিতরে কিছু একটা কৌতুকই উপভোগ করছে। কিন্তু শশিশেখর নিরুপায়। নিজের ওপরেই ক্ষোভ বাড়ছে তার। এই ক্ষোভে যে প্রসঙ্গ এড়াতে চেয়েছিল সেই প্রসঙ্গেই ফিরে গেল আবার। জিজ্ঞাসা করল, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাল সকালে গিয়ে দেখা করলে খুব ক্ষতি হবে?

হতে পারত, নির্বিকার মুখে দিব্যেন্দু ইজিচেয়ারে মাথা রাখল, দিনকে দিন তোর যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে তোর ওপর ভরসা করে বসে থাকতে পারিনি, দেখাটা আমিই করে এসেছি।

শশিশেখর বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ তেতে উঠেও সামলে নিল। এরপর রাগ করাটা আরো ছেলেমানুষি হবে। একটা সংশয় উঁকিঝুঁকি দিল, আর একটু বাদেই বদ্ধমূল হল সেটা। আসলে ঠিক এই দিনে তাকে কাজের ভার দেওয়াটাই দিব্যেন্দুর মস্ত কৌতুক একটা। এ-রকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তার চোখে আঙুলের খোঁচা দেওয়াই উদ্দেশ্য।

দিব্যেন্দু আবার তেমনি আলতো করে বলল, ওদের ওই ক্লাবেও তো মাথা গলিয়েছিস, টাকাও মন্দ ঢালিস নি নিশ্চয়—কিছু সুবিধে-টুবিধে হল?

ভিতরে ভিতরে শশিশেখর ভালো-রকম নাড়াচাড়া খেয়ে উঠল এক প্রস্থ। এই বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে সময় লাগল।—তোকে এসব কে বলল?

দিব্যেন্দু জবাব দিল, আয়নায় কিছুকাল ধরে নিজের মুখখানা শুধু তুইই দেখছিস না বোধ হয়, অন্যরাও দেখছে। তা সুবিধে-টুবিধে কিছু হল কিনা বল্‌।

রাগতে গিয়ে শশিশেখর হেসে ফেলল এবার। হাসতে পেরে বাঁচল যেন। নিজের অগোচরে ওর ওপর একটু নির্ভরতাও উঁকিঝুঁকি দিল কি না বলা যায় না। মাথা নাড়ল। সুবিধে হয় নি বা হচ্ছে না।

এবারে স্পষ্ট বিরক্তির সুরে দিব্যেন্দু বলল, তোকে তো আগেই বারণ করেছিলাম, ওদিকে চোখ দিস না। এখন মরগে যা—

এই উক্তির মধ্যেও সমস্যার আভাস যতটুকু, ধার ততো নয়। শশিশেখরের অন্তত তাই মনে হল। ভিতরটা হাল্কা লাগছে। মানসিক বোঝার খানিকটা যেন ওর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া গেছে। তর্ক না করে শশিশেখর হাসছে অল্প অল্প।

মনে মনে দিব্যেন্দু কিছু বোধ হয় চিন্তা করে নিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, মেয়েটা দেখতে ভালো বলেই যে সব ভালো তার কি মানে আছে? কি রকম বুঝলি?

আর কেউ হলে সায়েন্স পড়া শশিশেখর দত্তগুপ্ত হয়ত কাব্য করেই বলত কিছু। যা বলল তাও কাব্যের থেকে খুব কম কিছু নয়। বলল, বুঝতে চেষ্টা করিনি, ও-রকম দেখতে যে তার ভেতরটা খারাপ হবার কথা নয়।

দু'চোখ ঈষৎ বড় করে দিব্যেন্দু আর একবার তাকে দেখে নিল। তারপর ক্ষুদ্র মন্তব্য করল, তোর হয়ে এসেছে।

দিব্যেন্দু কি করতে পারে অথবা কিছু করতে পারে কি না শশিশেখরের মাথায় আসে নি। তবু ভিতরে ভিতরে অনুকূল কিছুর প্রত্যাশা ছিল যেন।

প্রত্যাশাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু দিব্যেন্দু যে ভাবে এগলো তাতে বেপরোয়া শশিশেখরও রীতিমত শঙ্কা বোধ করেছে। বয়েস তখন দু'জনেরই সাতাশের বেশি নয়। সে যা করল তা ওই বয়সেই সম্ভব। আজ অসন্ন প্রৌঢ় লগ্নে সে-রকম প্রহসন ভাবতেও অস্বাভাবিক লাগে। কিন্তু ওই একটা বয়েস যা যুক্তির বড় ধার ধারে না। সম্ভব অসম্ভবের চুল-চেরা হিসেব কষে না। অথবা ওই

বয়সের যুক্তি বোধটাই আলাদা। হিসেবের ধরন-ধারণ ভিন্ন। আর ভাগ্যদেবীরও সময় সময় এই বয়সের যুক্তিশূন্য বে-হিসেবী গতির প্রতি বড় বিচিত্র পক্ষপাতিত্ব। তিনি স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়েন, শেকল পরেন।

প্রথম দিন পনের শশিশেখরের মনে হয়েছিল কাজের চাপে দিব্যেন্দু বুঝি তার এই দুঃসহ নিভৃতের প্রসঙ্গটা ভুলেই গেল। সঙ্কোচ গেছে যখন, এই নিয়ে আর কিছু না হোক দু'চারটা কথা-বার্তা হলেও ভালো লাগত। ফলে এক-এক সময় দিব্যেন্দুকে অকারণে নির্দয় মনে হয়েছে তার।

হঠাৎ সেদিন দিব্যেন্দু তাকে বলল, একটা গাড়ি কিনছি, সই সাবুদ করতে হবে, চল্—।

শশিশেখরের খুব বিস্মিত হবার কথা নয়। কারণ, কাজের সুবিধের জন্য ছোট-খাট একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কেনার কথা অনেক দিনই হয়েছে। দুই একটা গাড়ি এ পর্যন্ত দেখাও হয়েছে। কোনোটা পছন্দ হয় নি, কোনোটা দামে বনে নি। তবু শশিশেখর অবাক একটু হয়েছিল, কারণ, সব ঠিক করে ফেলে একেবারে সই-সাবুদ করতে ডাকা হচ্ছে তাকে, অথচ গাড়িটা একবার তাকে দেখানও হয় নি। কি গাড়ি বা কত দামের গাড়ি তা নিয়েও আলোচনা হয় নি।

শশিশেখর কৌতূহল প্রকাশ করতেও দিব্যেন্দু স্পষ্ট জবাব কিছু দিল না। বলল, চল্ না, দেখবিই তো।

গাড়ি দেখে শশিশেখর প্রায় নির্বাক। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি বটে, কিন্তু নামজাদা মার্কার ঝকঝকে তকতকে মস্ত দামী গাড়ি। এ রকম গাড়ি কেনার কথা শশিশেখর কল্পনাও করে নি। তাকে এতটা অবাক হতে দেখে দিব্যেন্দু তলায় তলায় হাসছে মনে হল। শশিশেখর এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ এই গাড়ি কিনে বসলি?

দিব্যেন্দু বিশদ করে কিছু বলল না। শুধু বলল, সুবিধেয় পেয়ে গেলাম—

গাড়ি কেনা হল। কিন্তু এ-যে কোনো এক লক্ষ্যের দিকে এগনোর প্রথম সূচনা সেটা বোঝা গেল পরদিনই। আর, তারপর থেকে একে একে অনেক কাণ্ডই করল দিব্যেন্দু। শশিশেখর কখনো বিড়ম্বিত, কখনো শঙ্কিত। এমন কি সে বাধাও দিতে চেষ্টা করেছে দুই একবার। বলেছে, এ কিন্তু তোর বাড়াবাড়ি হচ্ছে, শেষে সামলানো দায় হবে।

দিব্যেন্দু হেসেছে। বলেছে, দশ জনে যে ভাবে তোমার রমণীটিকে ঘিরে বসে আছে, ওপর থেকে হঠাৎ ছোঁ মারা ছাড়া আর উপায় কি। গলায় এনে ঝুলিয়ে দিলে দায়টুকুও সামলাতে পারবি না?

ওর এই ছোঁ মারার ইতিবৃত্ত আন্তরিকই বটে। শশিশেখর জেরা করে করে শুনেছে। কখনো হতভম্ব হয়েছে, কখনো অস্বস্তি বোধ করেছে। কখনো বা মনে হয়েছে দিব্যেন্দুর হাত থেকেই পালিয়ে বাঁচা দরকার। অঘটন-সম্ভাবনার বিচার বিশ্লেষণের তলায় তলায় আবার একটা আশাও পুষ্ট হয়েছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে নাটকীয় পতিগতিটা ঘটে যেতে সময় লাগে নি খুব।

মোটর নিয়ে দিব্যেন্দু পরদিনই নন্দী বাড়িতে হানা দিয়েছে। ও-রকম গাড়ির আরোহীকে একটু মর্যাদা সাধারণত সকলেই দিয়ে থাকেন। অলকার বাবা মিস্টার নন্দীও দিয়েছেন। কাছাকাছি বাড়িতে দুটি তরুণ ব্যবসায়ী থাকে এটুকু তিনি আগেই লক্ষ্য করেছিলেন, গাড়িটাই শুধু আগে কখনো দেখেন নি।

এত কাছে থেকেও এই গণ্যমান্য পড়শীর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয় নি বলে দিব্যেন্দু প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। তারপর নিজের পরিচয় দিয়েছে। না, কাঁপানো পরিচয় কিছু নয়। অমায়িক বিনয়ে নিজের পরিচয় যথাসম্ভব খাটো করার মধ্য দিয়ে শশিশেখরের পরিচয়টাই লোভনীয় করে তুলেছে।··· বলেছে ব্যবসার সে পার্টনার নয়, ওর একচ্ছত্র মালিক শশিশেখর

দত্তগুপ্ত—আর মামাতো ভাই এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের দরুনই লোকে তাকে পার্টনার ভাবে।

তারপরেই মিস্টার নন্দীর কাছে একটা আর্জি পেশ করেছে দিব্যেন্দু। গাড়িটা নিয়ে বিপদে পড়েছে তারা, বেপাড়ার এক গ্যারাজে রাখতে হয়, এখানে মিস্টার নন্দীর তুটো গ্যারাজের একটা তো খালিই পড়ে থাকতে দেখে, মিস্টার নন্দী যদি অনুগ্রহ করে ওটা তাদের ভাড়া দেন।

কিছুকাল আগেও মিস্টার নন্দীর তুটো গাড়ি ছিল দিব্যেন্দু জানে, আর একটা কেন বেচে দিতে হয়েছে তাও জানে। আগের দিন হলে মিস্টার নন্দীর হয়ত এই প্রস্তাবেই আত্মসম্মানে ঘা লাগত। এখনো গ্যারাজ ভাড়া দিয়ে ক'টা বাড়তি টাকা পাওয়ার আগ্রহ বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু এ-হেন পড়শীর সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।

মিস্টার নন্দীর হয়ত একটু খটকা লেগেছিল। এ-রকম একটা দামী গাড়ি ওই কাছের বাড়িতে আনা-গোনা করলেও চোখে পড়ার কথা। বললেন, আপনাদের এই গাড়িটা আগে লক্ষ্য করিনি—

দিব্যেন্দু হেসেছে। বলেছে, লক্ষ্য করার কথাও নয়। একে তো গ্যারাজ অন্যত্র, তায় ওটা মালিকের হলেও আসলে ওতে চড়ে দিব্যেন্দু নিজেই। মামাতো ভাই এ-সব ব্যাপারে সদা-[illegible] —হাতের কাছে কিছু একটা পেলেই হল, তা ট্যাক্সিই হোক আর ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসই হোক।

এই ফাঁকে শশিশেখরের অত্যুজ্জ্বল ছাত্রজীবন আর অধ্যাপনার জীবনের পরিচয় দেওয়া সারা। আর বংশের কোন্ অনমিত ঐতিহ্যের তাড়নায় গোলামী ছেড়ে এই ব্যবসায়ে পদার্পণ—দিব্যেন্দুর সেই বিস্তারও কান পেতে শোনার মত।

কিন্তু ইত্যবসরে এর থেকেও অনেক বড় তুরুপের তাস দিব্যেন্দু হাতে পেয়ে গেছে। মিস্টার নন্দীর মাথার কাছে একখানা সুদৃশ্য ফোটো টাঙানো। সেই ফোটোর মূর্তি দিব্যেন্দুর চেনা।

কোনো এক অধ্যাত্ম গুরু স্থানীয় ভদ্রলোক। বছর দুই হল তাঁর দেহান্ত হয়েছে। তাঁর অনেক মহিমার কথা শিষ্যদের মুখে মুখে ফেরে। দিব্যেন্দুর বিগত ভবঘুরে জীবনের সঙ্গে এই গুরুটির কোনো প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তখন এঁর প্রচার তার কানে আসত। এই নিয়ে গুরুতে গুরুতে অনেক মজার রেষারেষিও সে দেখেছে।

গভীর শ্রদ্ধায় দিব্যেন্দু ছবিটার প্রতি মিস্টার নন্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আপনি কি ওঁর শিষ্য নাকি?

ওই বয়সের এক ছেলের এই ভাব-পরিবর্তন দেখে মিস্টার নন্দী একটু অবাক হলেও মাথা নেড়েছেন। শিষ্যই ছিলেন···

না, দিব্যেন্দুর এবারের খুশিতে কোনো কৃত্রিমতা ধরা পড়ে নি। মিস্টার নন্দীর সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক আবিষ্কারের চাপা আনন্দে দিব্যেন্দু প্রায় স্থির, কিন্তু বিহ্বল। কারণ, উনি যে তারও গুরু, তারও সব। এবারে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে পারে মনে হতে নিজেকে আবেগ-গম্ভীর সংযমে বেঁধে নিজের ছন্নছাড়া জীবনের কথা বলেছে। কোথায় কত ঘাটে জল খেয়ে শেষে কোন্ আশ্চর্য যোগাযোগে এই গুরু লাভ হয়েছিল সে-কথা বলতে বলতে তার গলা ভারী হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে গুরুর যে-[redacted]আদেশ উপদেশ মহিমার কথা বলেছে সে-সব শিষ্যমাত্রেরই বিশ্বাস করার কথা। কারণ, এ-ব্যাপারে দিব্যেন্দুর এতটুকু ভুলের সম্ভাবনা নেই। অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যের পক্ষেই শুধু গুরুর আচার-আচরণ সম্পর্কে এতসব খুঁটিনাটি জানা সম্ভব। দেহান্ত হবার আগেই দিব্যেন্দুর ওপর নাকি গুরুর নির্দেশ ছিল, কর্মের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তাই না ফিরে করবে কি, শশিশেখরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গুরুর ইচ্ছাই পালন করছে সে।

মিস্টার নন্দীর দুর্বল মন আরো দুর্বল হতে সময় লাগে নি এর পরে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন তিনি। নিজে তিনি গুরুর সব ইচ্ছা পালন করেন নি, অথবা নিজের ভক্তি-বিশ্বাসে নিজেরই সংশয়

ছিল বলেও এই বড় নিঃশ্বাস পড়ে থাকতে পারে। বলেছেন, গুরুর গোলকধাম যাত্রার পর থেকেই তাঁর কিছু দুর্যোগ চলেছে। ভাগ্যদোষে গুরুর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে কিনা জানেন না। বিস্ময়ও প্রকাশ করেছেন, এই বয়সেই আপনার তো অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছে দেখছি!

দিব্যেন্দু লজ্জা পেয়েছে। আর সাদাসিধেভাবে বলেছে, এর পরে তাকে আর আপনি করে বলা মানায় না।

শশিশেখর বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, মিস্টার নন্দী খুশি মুখে একটা গ্যারাজ তাদের ছেড়ে দিয়েছেন—সেই দিন থেকেই। আর, ভাড়ার কথা তুলতে মাথা নেড়ে বলেছেন, গাড়ি রাখো তো এখন, ও-সব কথা পরে হবে। আর ওঠার আগে অনুরোধ করেছেন, মামাতো ভাইকে নিয়ে একদিন যেন আসে—আলাপ করবেন।

এইবার দিব্যেন্দু ঈষৎ বিস্ময়ই প্রকাশ করেছিল, আপনার সঙ্গে ওর আলাপই হয় নি এখনো! আপনার মেয়ে তো তাকে খুব চেনেন, ওঁদের ওই ক্লাবের মেম্বারও সে।

মিস্টার নন্দী এবারে একটু থমকেছিলেন মনে হল। কিন্তু দিব্যেন্দু কিছু ভাবার অবকাশ দেয় নি, বলেছে, আচ্ছা আমি আপনার কথা বলব তাকে, কিন্তু ওর সম্বন্ধে কথা দেওয়া মুশকিল, কোথাও যেতে বললে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

অর্থাৎ, মেয়ের আকর্ষণেও শশিশেখরকে চট করে এখানে আনা যাবে সেটা যেন তিনি না ভাবেন।

পরের আট দশ দিনের মধ্যে গাড়ি আনা আর রাখার অছিলায় দিব্যেন্দুর সঙ্গে মিস্টার নন্দীর বার কয়েক দেখা হয়েছে। ড্রাইভার গাড়ি বার করবে, কিন্তু হাতে সময় থাকলে সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে। দোতলার রেলিংয়ে অলকা নন্দীকেও দেখেছে কয়েকবার। সহজ দু'চারটে কথা-বার্তা মিস্টার নন্দীর সঙ্গেই শুধু হয়েছে। বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন কথায় কথায়

কেনার মত কোনো ভালো বাড়ি খোঁজে আছে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করেছে। এ-পাড়ায় মিস্টার নন্দী তো অনেক কাল আছেন, তাঁর জানা থাকা স্বাভাবিক। দিব্যেন্দুরা যে বাড়িতে আছে তার মালিকের সঙ্গেও কিছু কথা-বার্তা হয়েছে, কিন্তু ওই বাড়িটা শশিশেখরের খুব পছন্দ নয়। তাদের বাড়িটার মালিক যে মিস্টার নন্দীর পরিচিত, সে-খবর দিব্যেন্দুর জানা ছিল, এ-বাড়ির ড্রইং রুমে একাধিক দিন তাঁকে দেখা গেছে। কাজেই বাড়ি কিনুক আর না কিনুক, শশিশেখরের মুখপত্র হিসেবে মালিকের সঙ্গে কেনার আলোচনাটা দিব্যেন্দু আগেই করে রাখতে ভোলে নি। এর পরে এঁদের দুজনের মধ্যে আলোচনা হওয়াই স্বাভাবিক—হলে সত্যি মিথ্যে যাচাইয়ে গণ্ডগোল হবার আশঙ্কা নেই।

বড় অবস্থা ভাঙনের দিকে গড়ালে মানুষের বিচার বুদ্ধি যে বহুলাংশে লোপ পায় এ-রকম একটা বিশাস দিব্যেন্দুর বরাবরই ছিল। দুর্বল মন তখন সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছুই আঁকড়ে ধরতে চায়। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই দিব্যেন্দু আবার হঠাৎ একটা বড় ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এ-পর্যন্ত যুদ্ধকালীন শেয়ার বাজারের বিপর্যয়ের ক্ষতটা সামলে ওঠার চেষ্টা মিস্টার নন্দী অনেকভাবে করেছেন। পাঁকে-ডোবা মানুষের মত এই চেষ্টাটা তাঁকে ক্রমাগত নীচের দিকেই টেনেছে। বাড়ির লোক, এমন কি অলকা নন্দীও এই বিপর্যয়ের ফলাফল সম্বন্ধে কতটা সচেতন, দিব্যেন্দুর তাতেও সংশয়। অন্যথায় তাকে অমন নিশ্চিন্ত হাসি-খুশি দেখে কি করে ?

দিব্যেন্দুর অনুমান খুব মিথ্যে নয়। ভদ্রলোক ক্রমশ এক নিষ্প্রভ নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডুবছিলেন। ফলে কোনো শুভ অদৃশ্য শক্তির প্রতি তাঁর নির্ভরতা বাড়ছিল। হাতের দু' আঙুলে দুটো পাথরের আংটি দেখা গিয়েছিল—দিন দুই হ'ল আর একটা বেড়েছে লক্ষ্য করেছে। এর প্রত্যেকটাই কোনো না কোনো দুর্যোগ প্রতিরোধকল্পে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। কপালে দুই

একদিন ফোঁটা তিলক লক্ষ্য করেছে। আর, দিব্যেন্দুর ধারণা, তার সঙ্গে আলাপের পরেই গুরুর ফোটোতে নিত্য মালা উঠছে।

দিব্যেন্দু কোনদিন কথা বেশি বলে না। অপরকে আকৃষ্ট করার এটাই বোধহয় বড় গুণ তার। কিন্তু সে-দিন তার আচরণে মিস্টার নন্দীর মনে হয়েছিল, সে-যেন কিছু বলি বলি করেও বলে উঠতে পারছে না। শেষে তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবে?

দিব্যেন্দু মাথা নাড়ল, বলবে। গুরুর ফোটোখানার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে খুব শান্ত মুখে বলল, আপনি না কিছু মনে করেন, কিন্তু ক'দিন ধরে কথাটা আমার মনে হচ্ছে। আমার সামান্য ক্ষমতা, তবু আপনার যে-কোনো প্রয়োজনে দয়া করে আপনি আমাকেই আগে স্মরণ করবেন।

মিস্টার নন্দী কতটা বিস্মিত হতে পারেন জানাই ছিল। কিন্তু দিব্যেন্দুর দু'চোখ আবার গুরুর ফোটোতে আটকেছে। সে-দিকে দৃষ্টি রেখেই সে আবার বলল, অল্প ক'দিনের আলাপে আপনাকে এ-রকম বলা উচিত নয় জানি, কিন্তু এ-কথাটা ঠিক আমার কথাই নয় বোধহয়, কেন বলছি তাও জানি না···কেবলই মনে হয়েছে আপনাকে বলা দরকার।

মিস্টার নন্দী সচকিত হয়েছেন হঠাৎ। ঘাড় ফিরিয়ে গুরুর ফোটোর দিকে তাকিয়েছেন। একটা উদ্‌গত আবেগ দমন করতে চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক। তারপর হাত বাড়িয়ে দিব্যেন্দুর হাতখানা ধরলেন। সেই মুহূর্তে তিনি যেন অনেকখানিই পেলেন।

যে-লোক নিজের সমস্ত কৃতিত্ব মামাতো ভাইয়ের ওপর চাপিয়ে বেড়ায়, আর নিজেকে যে শুধু তার বিত্তের রক্ষক বলে ভাবে, তার কোন্ স্বার্থ মিস্টার নন্দীর শঙ্কার কারণ হতে পারে? অতএব, এ-রকম যোগাযোগ শুধু গুরুর কৃপা ছাড়া আর কি ভাববেন তিনি?

সেদিন তিনি দিব্যেন্দুকে না খাইয়ে ছাড়েন নি। অলকারও ঘরে ডাক পড়েছে। বাপের সঙ্গে এই লোকের ইদানীং কালের খাতিরটা সে লক্ষ্য করে নি এমনও মনে হল না। দুই ভাইয়ের

মধ্যে তাকে নিয়ে একটা রেষারেষি চলেছে, তার পক্ষে এ-রকম কিছু ভাবাও বিচিত্র নয় হয়তো। একজনের নিজের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা, আর একজনের হয়ত বাবার সুনজর লাভ করে। ভাবলেও অলকার দোষ দেওয়া যায় না, এ-পর্যন্ত পুরুষের অনেক বিচিত্র মনোভাবই দেখেছে সে।

আর, এর পর থেকে ক্লাবে গেলে শশিশেখরের মনে হয়েছে, অলকা নীরব কৌতুকে তাকায় তার দিকে। বাপের কাছে তাদের সম্বন্ধে হয়ত কিছু শুনে থাকবে।

শশিশেখর তখনো যায় নি, মিস্টার নন্দীই তাদের বাড়ি এসেছেন। না যাওয়ার জন্য নরম অনুযোগ করেছেন, তারপর বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন। এত লেখাপড়া শিখেও যে চাকরিতে বাঁধা পড়ে নি তার জন্য বাহবা দিয়েছেন। দিব্যেন্দুর মত এমন আত্মীয় পাওয়া ভাগ্যের কথা তা এক বাক্যে ঘোষণা করেছেন। বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন করে গেছেন দু'জনকে। এরপর কোনো উপলক্ষ উপস্থিত হলে দুপুরের অথবা রাতের আহারের নেমন্তন্নও পেয়েছে তারা। শশিশেখর প্রায়ই কোন না কোন অজুহাতে এড়াতে চেষ্টা করেছে। আবার গেছেও। কিন্তু অলকার সঙ্গে আলাপের গতিটা দু'জনের মধ্যে দিব্যেন্দুর সঙ্গেই সহজ হয়েছে। স্বাভাবিকও। শশিশেখরের ভিতরে ভিতরে প্রত্যাখানের সংশয়-জনিত আত্মাভিমান উঁকিঝুঁকি দেয়। প্রকাশ্যে না হোক, মনে মনে সে প্রার্থী। দিব্যেন্দুর নিজের জন্যে অন্তত কোনো প্রার্থনা নেই, ফলে সংশয়ও নেই।

এক একসময় শশিশেখরের উদ্দেশে সে ছদ্ম বিরক্তি প্রকাশ করেছে, দিন কে দিন তুই যে দেখি নিজের মর্যাদা নিয়েই অস্থির, বাদবাকি ব্যবস্থাটুকুও নিজে করে উঠতে পারবি না ?

অলকার সামনেও দিব্যেন্দু নিজের অস্তিত্ব প্রায় মুছেই ফেলতে চেষ্টা করে। শশিই সব। শশির ব্যবসা, শশির গাড়ি, শশির কাজের ব্যস্ততা, শশির বিদ্যেবুদ্ধি, শশির উদারতা, শশির

ভবিষ্যৎ—সব-কিছুর শেষ শশি-ময়। নিজের স্বার্থ কোথাও প্রকট হয়ে উঠলে এই স্তুতি চাটুকারিতার মতই স্থূল শোনাতো। কিন্তু নিঃস্বার্থ হৃদ্যতার এই উচ্ছ্বাসে মালিন্য চোখে পড়ার কথা নয়।

তবু এই উপলক্ষেই অলকা একদিন সামান্য একটু কৌতুক কটাক্ষ করে বসল, আর সেই সুতো ধরেই দিব্যেন্দু কপাল ঠুকে সরাসরি বক্তব্য পেশ করে বসল। অলকা বলেছিল, আপনাকে শশিবাবুর ম্যানেজার না বলে প্রচার সচিব বলা উচিত।

দিব্যেন্দু এক মুহূর্ত থমকেছিল হয়ত, তারপর হাসিমুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি সেটা বুঝতে পারেন ?

কোনটা ?

এ-ভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যটা ?

অলকা হাসিমুখেই থতমত খেল একপ্রস্থ, জিজ্ঞাসা করল, এর মধ্যে আবার উদ্দেশ্যও আছে নাকি কিছু ?

ষোল আনা। আমার এতদিনের সব চেষ্টা আপনার জন্যে আর ওর জন্যে। আমার ধারণা আপনিও সেটা জানেন। আমার প্রচারটা তা' বলে মিথ্যে নয়, স্বভাবে বিদ্যায় বুদ্ধিতে ওর মত লোক হয় না। আপনি তাকে যেমন চুপচাপ দেখেন আদৌ সে-রকম নয়। যেমন জেদ তেমনি আত্মাভিমান—নইলে বড় হবে আর গোলামী করবে না এই সঙ্কল্প নিয়ে অমন নিশ্চিন্ত আরামের প্রোফেসারির চাকরি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসত না। এখন আবার আপনার জন্যে সব ছেড়ে ছুড়ে বিবাগী হয়ে গেলেও আমি অন্তত খুব অবাক হব না। যাক সে-কথা, আপনি আর কতকাল ওকে এ-ভাবে ভোগাবেন বলুন।

এ-যাবৎ অলকা নন্দী পুরুষের একান্ত জীবনে পদার্পণের অনেক রকম আমন্ত্রণ লাভ করে অভ্যস্ত। আভাসে, ইঙ্গিতে, এমন কি সবিনয় প্রস্তাবেও অনেক জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু এমন বেপরোয়া প্রস্তাবের সম্মুখীন কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। এ-সব ব্যাপারে যা হয় না তাই হল। অলকা নন্দী হকচকিয়ে গেল প্রথম,

তারপর কপালের রক্তিম টিপের আভা অকস্মাৎ সমস্ত গালে মুখে ছড়ালো।

পরের সমাচার সংক্ষিপ্ত এবং প্রত্যাশিত। এরপর শশিশেখর ক্লাবে একটু বেশি গেছে। তার সংশয় তখনো একেবারে ঘোচে নি, দিব্যেন্দু কি কাণ্ড বাধিয়েছে ঠিক কি। কিন্তু অলকার কৌতুক কটাক্ষ তাকে কিছুটা আশ্বস্ত করেছে। সামনাসামনি হতে আসল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছে দু'জনেই। কিন্তু সে মাত্র কয়েকদিন। অলকার ছদ্ম গাম্ভীর্য টেঁকে নি। ফাঁক পেয়ে একদিন ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে বলে বসেছে, তার দূতটি বড় কঠিন লোক—একেবারে চোখ-কান কাটা। সাগরেদ যার এমন গুরু না জানি আবার কেমন।

দূতের গৌরবে শশিশেখর নির্দ্বিধায় গৌরব বোধ করেছে। বলেছে দূত অবধ্য বলেই রক্ষা, কিন্তু দূতের মালিকের সেই নিশ্চিন্ততা কই?

প্রস্তাবটা অনাড়ম্বর কৌশলে মিস্টার নন্দীর কাছে দিব্যেন্দুই পেশ করেছে। মেয়ের অমত নেই প্রকারান্তরে এই আভাসও দিয়েছে। মিস্টার নন্দী খুব বেশি চিন্তা করেন নি। মেয়ে যদি মত দিয়ে থাকে তাহলে আর বেশি চিন্তা করার কি আছে। এ-রকম যে হতে পারে সেটা কিছুদিন ধরে তাঁর মনেও এসেছে। কিন্তু বেশি চিন্তা না করার হেতু হয়ত মেয়ের সম্মতির দরুনই নয়। জামাই করা যেতে পারে এ-রকম একটা নামের তালিকা তাঁর মনে মনে ছিল। সেই তালিকার অনেকবার ছাঁটাই-বাছাই হয়েছে। তাঁর অবস্থা না পড়লে মেয়ের বিয়ে এতদিনে হয়েও যেতে পারত। একটানা মানসিক অশান্তির দরুনই এ ব্যাপারে তাঁর তৎপরতা দেখা যায় নি।

এই নামের তালিকায় শশিশেখর দত্তগুপ্ত একেবারে শেষের একজন হলেও এই যোগাযোগটা তিনি কিছুটা গুরুর কৃপা বলে ধরে নিয়েছেন। প্রয়োজন মাত্রে দিব্যেন্দু বোস আগে তাকে

জানাতে বলেছে, সে প্রয়োজন এখনো হয় নি। কিন্তু সে-রকম প্রয়োজন হবার আগে আত্মীয়তার দিকটা পুষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া শশিশেখরের ক্ষেত্রে কোনরকম জটিলতা নেই। নিজের অভিভাবক নিজে, পাঁচজন আত্মীয় পরিজন নিয়ে কারবার নয়। জামাই নিজেই সর্বেসর্বা। এরকমটা বড় জোটে না। দিব্যেন্দু মুখে স্বীকার না করলেও শশিশেখরের ধারণা প্রস্তাব পেশ করার আগে আভাসে ইঙ্গিতে কারবারের চিত্রটা ভদ্রলোকের সামনে সে বেশ স্ফীত করেই তুলে ধরেছে। এমন কি, কোনো উপলক্ষে সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা পড়লেও দিব্যেন্দুর পক্ষে কৌশলে তাঁকে পাশ বইটা দেখিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। মোট কথা, এ দিকটা ভালো করে বুঝে না নিয়ে মেয়ের কাছে যে তিনি তাদের সম্বন্ধে অত প্রশংসা করেছেন বলে মনে হয় না। বাবা যে তাদের খুব প্রশংসা করেন এ-খবর দিব্যেন্দুকে অলকাই বলেছে।

বিয়ে হয়ে গেল।

আর, তার পরেই দিব্যেন্দু হাসি মুখে পরামর্শ দিল, হনি-মুনের নাম করে এবারে তুই বউ নিয়ে গা-ঢাকা দে, আর আমিও অন্যত্র বাড়ির খোঁজ করি।

বউ দেখে মা আনন্দে আটখানা, কিন্তু ওদের কথা-বার্তা হাসি ঠাট্টা কানে যেতেই তিনি কেমন শঙ্কা বোধ করেছেন। বুঝতে চেষ্টা করেছেন ওরা কি বলে। কিন্তু সঠিক বোঝেন নি নিশ্চয়।

বিয়ের দু'দিনের মধ্যে অলকা জেনেছে দিব্যেন্দু কারবারের ম্যানেজার নয়, সমান অংশীদার। শশিশেখরই বলেছে। না বলাটা অকৃতজ্ঞতা হবে ভেবেছে। মহৎ উদ্দেশ্যে এই মিথ্যাচারটুকু হাসির কারণ হয়েছে। অলকা সহাস্যে দিব্যেন্দুর উদ্দেশ্যে টিপ্পনী কেটেছে, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় তুমি কম আত্মত্যাগ করো নি দেখছি, বাবা জানলে দেবেখ'ন এরপরে।

দিব্যেন্দু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, ওর অবস্থা দেখে আরো কত কাণ্ড করতে হয়েছে ক্রমশ জানবে। শশিশেখরকে বলেছে,

প্রথম শুভ দৃষ্টি থেকে শুরু করে এই বিয়ে ঘটানো পর্যন্ত সবই তো আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে গেছে, তোর জন্য একেবারে বিয়েটা করে আনতে হয় নি এই রক্ষা।

দিব্যেন্দুর তাড়াতেই শশিশেখর দিন কতকের জন্য সত্যিই অলকাকে নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। সেই নিভৃতের সমর্পণে শশিশেখর শুধু অলকাকে পায় নি, তাকে জয়ও করেছিল। নইলে দিব্যেন্দুর সব ছলা কলা কৌশল ফাঁস হবার পরেও অলকা অত হাসতে পেরেছিল কি করে? হাসতে হাসতে হুমড়ে পড়ার দাখিল। শেষে চোখ পাকিয়ে বলেছে, আমার জন্যে বাবার সঙ্গে এই কাণ্ড করেছ তোমরা—দাঁড়াও, ফিরে গিয়ে দিব্যেন্দুকে মজা দেখাচ্ছি।

ফিরে এসেও মজাটা মজাতেই শেষ হয়েছে। ছদ্ম তর্জন আর হাসিখুশিতে ঘর ভরপুর। এই আনন্দের এক-একসময় ছন্দপতন ঘটিয়েছে গুরুগম্ভীর মূর্তি মহাদেও। তার চকিত আবির্ভাব আর প্রস্থানও অনেক সময় হাসির খোরাক জুগিয়েছে।

অলকার বাবা মিস্টার নন্দীর কাছেও খুব বেশিদিন সত্য গোপন থাকে নি। গোড়ায় গোড়ায় জামাইয়ের সামান্য সাহায্য তিনি পেয়েছেন। সেই সাহায্যও শশিশেখর করতে চেষ্টা করেছে অলকাকে গোপন করে। কিন্তু গোপন থাকে নি। অলকাই সরাসরি একদিন বাবাকে জানিয়েছিল, বিত্তের কথা তিনি যতটা শুনেছেন ততটা ঠিক নয়। বাকিটুকু তিনি নিজেই বুঝে নিয়েছেন। শোনার পরেও মেয়ের মুখ দেখেই তাঁর নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা। সেই মুখে কোনো অভিযোগ যে ছিল না তাতে শশিশেখরেরও বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু জামাইয়ের ওপর বিরূপ হয়েছিলেন মিস্টার নন্দী। আর দিব্যেন্দুকে মনে মনে হয়ত ভস্মই করেছিলেন। নিজের প্রবঞ্চনার দিকটা সহজে তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি।

কিন্তু শশিশেখরের কোথাও লেগেছিল হয়ত। অলকাকে বলেছিল, তোমার বাবার মন আবার ফিরবে দেখে নিও, যতটা

আছে ভেবেছিলেন তিনি, তার থেকেও বেশি হবে, খুব বেশি সময় লাগবে না।

ছদ্ম ত্রাসে দুই চোখ টান করে অলকা খানিক দেখেছিল তাকে। তারপর বলেছিল, ওই বেশির ধাক্কায় পড়ে আমিও আবার বেশি হয়ে যাব না তো তোমার কাছে···দেখো বাপু, অত বেশি শুনলে ভয় করে, দিন রাত বেশির স্বপ্ন দেখে দেখে মায়ের মুখে তোমার যা অবুঝপনার গল্প শুনেছি।

হঠাৎ এ-কি হল! ধড়ফড় করে সচেতন হল শশিশেখর। তার হাঁড়পাজরগুলো আবার কে যেন মটমট করে ভাঙছে ধরে ধরে। শূন্য প্রাসাদের এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সে। ইচ্ছে হল, মহাদেওকেই চিৎকার করে ডাকে একবার। না, শশিশেখর এখন কলকাতায় বসে নেই, ভাঙার মত আর কিছু অবশিষ্টও নেই। সে এখন সাঁওতাল পরগণার এই চার্বাকে বসে আছে। এই ফুলবাগে।

শশিশেখর দত্তগুপ্ত এখন শুধু রাত্রির প্রতীক্ষায় আছে। রাতের নিভৃত লগ্নে কেউ যেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার কাছে। কেউ বুঝি তাকে কথা দিয়ে গেছে, সেই প্রতিশ্রুতি সেই কথার রেশ এখনো কানে লেগে আছে। উৎকর্ণ শশিশেখর নিজের বুকের কোথাও কান পাতল। শোনা যাচ্ছে।

···আবার আমি আসব।

রাত্রি।

সন্ধ্যার পরেই ফুলবাগের রাত্রি ঘন হতে থাকে। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে না পড়লে এ জায়গার নীরবতা বুকের ওপর চেপে বসে—সেই চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। গত ক'টা দিন শশিশেখর রাতের আহারের পরেই বিস্মৃতির ব্যাকুলতায় শয্যা নিয়েছিল। কিন্তু ঘুম যেন ওই কটা দিনই লুকোচুরি খেলেছে তার সঙ্গে। হার মেনে শশিশেখর উঠে পড়েছে, পায়চারি করেছে। ইচ্ছে করে জুতোর শব্দ করেছে। মনে হয়েছে

মহাদেও জেগে থাকলে মন্দ হত না। আভিজাত্যের খোলস সিকেয় তুলে রেখে সুখ দুঃখের বন্ধুর মত মুখোমুখি বসে দুটো সাধারণ কথা কওয়া যেত।

কিন্তু আজ শশিশেখর মহাদেওর ঘুমের অপেক্ষায় আছে।

রাত বাড়ছে।

তার শোবার ঘরের বাইরেই বড় ডাইনিং হলটায় মহাদেও শোয়। পা-টিপে শশিশেখর একবার দেখে গেল। সুপ্তির ঘন নিঃশ্বাস কানে এলো। কিন্তু তবু যেন ঠিক সময় হয় নি। রাত আরো ঘন হোক, গভীর হোক, রহস্যময়ী হোক।

শশিশেখর ঘড়ি দেখে নি। এ বাড়িটায় ঘড়ি বেমানান। অ্যাশপটে পাঁচ-সাতটা সিগারেটের টুকরো জমেছে। হঠাৎ মনে হল দেরি হয়ে যাচ্ছে। চকিতে উঠে দাঁড়াল। ঘুমের পোশাকের ওপরেই ঝকমকে ড্রেসিং গাউন চাপাল। তার পর মহাদেওর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নীচে নেমে এলো।

লাইব্রেরির দরজা জানলা তেমনি খোলা। চুরির ভয় নেই। কেউ বলে দেয় নি, তবু শশিশেখর জানে রাতে কেউ এখানে ঢুকবে না।

ঘরটায় আলোর বন্যা ছুটেছে। জোরালো ইলেকট্রিক আলো নেভে। আর টেবিলের ওপরের ঝাড়লণ্ঠনটা জ্বলছে। বিকেলে মহাদেওকে বলে রেখেছিল ওটা যেন জ্বালানোর ব্যবস্থা হয়। কি করতে হবে বা কি করে ব্যবস্থা হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হয় নি। মহাদেওকে নির্দেশ দেওয়ার এই এক সুবিধে। মুখের কথা খসলে সে কাজে লেগে যাবে। বিকেলের মধ্যে মিস্ত্রী ডেকে বাতির খুপরিগুলোর মধ্যে ছোট ছোট বালব্ ফীট করিয়ে নিয়েছে। প্রায় পঁচিশ-তিরিশটা হবে। আগে বোধহয় ওতে মোমবাতি জ্বলত।

শশিশেখর প্রশস্ত টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র, বইয়ের আলমারিগুলো, দেয়ালের ছবিগুলো,

এমন কি ওই মসৃণ কালো চামড়ায় মোড়া পাণ্ডুলি পিটাও যেন তার অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণছিল। তার অপেক্ষায়? না ইন্দ্র বিশ্বাসের অপেক্ষায়? ইন্দ্র বিশ্বাস কে? আর শশিশেখর দত্তগুপ্তই বা কে?

এগারো যুগ আগে ইন্দ্র বিশ্বাস নামে একজন ডাক সাইটে লোক ছিল শশিশেখর জানে। তার ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল দুটি। সেই মেয়ের ঘরের বংশ তালিকা বিশ্লেষণে বসলে শশিশেখর দত্তগুপ্ত নামের হদিসও মিলবে হয়ত। মিললেও এই দুই নামের মাঝে দুস্তর ব্যবধান। কেউ এই নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় নি। শশিশেখর নিজেও না। অথচ কেউ যেন এই ব্যবধানের সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যেই এই মহামৌন রাতের স্তব্ধতায় তাকে টেনে এনেছে।

কালো চামড়ায় মোড়া এই পাণ্ডুলিপিটাই যেন সেই কালের সমুদ্র। জোরালো আলোয় ওটা আরো চিকচিক করছে। দুর্বার আকর্ষণে টানছে তাকে, হাতছানি দিচ্ছে। বলছে, আমার প্রতিশ্রুতি আমি রাখব। আবার আমি আসব...।

শশিশেখর চেয়ার টেনে বসল। ঘরের হাওয়ায় একটা পরিচিত স্পর্শ লাগল যেন! মুখ তুলে খুব ধীর শান্ত মুখে চারদিকে তাকালো একবার।

আলমারির ওই বইগুলো কয়েক যুগ ধরে মানুষের হাতের ছোঁয়া পায় নি একবারও মনে হচ্ছে না। কেউ যেন হামেশাই নাড়াচাড়া করে ওগুলো নিয়ে। দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকালো। বিকেলের থেকে অনেক বেশি সজীব লাগছে। যৌবনভারে উচ্ছল লাস্যময়ী নারী-মূর্তিরা তার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে! তারা তাকে রসাতলের পথ দেখাচ্ছে। আনন্দ সৌন্দর্য আর উজ্জ্বলতার প্রতিরূপিণীরা কামোন্মত্ত কিউপিডের মনোভাব বুঝে তার কাছে নালিশ জানাতে গিয়ে সশঙ্কে দেখেছে ওই গোপনচারী দেবতাটির বসতি তারই দেহদেউলের নিভৃতে।

পলিক্সিনা। আর স্যাভাইন কন্যাদের হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে দেখেও শশিশেখরের এতটুকু সহানুভূতির উদ্রেক হচ্ছে না কেন? ডানদিকে ঘাড় ফিরিয়েই ধমনীর রক্ত টগবগিয়ে উঠল হঠাৎ। দয়া নয়, মায়া নয়, পরাজিত শত্রু মার্সিয়াসের গায়ের ছাল চামড়া অ্যাপলো এবার ছাড়িয়ে নেবেই।···কিন্তু নিয়তি? নিয়তিকে ঠেকাবে কেমন করে? দেহের সমস্ত রক্ত সিরসিরিয়ে নেমে যাচ্ছে, পিঠের ওপর পশুরাজের একটা থাবা বসে আছে, আধ-চেরা নিয়তি-রূপিণী গাছটা তার অমিত-বিক্রম হাতখানা আটকে রেখেছে। সকল গর্বের, সকল দর্পের অবসান। কিন্তু একেবারে অবসান কী? না। সকল দর্প, সকল নগ্নতা, সকল ব্যভিচার অপগত হবে। বৃহস্পতি আছেন। আর মাধুর্যময়ী শাশ্বতী নারীসত্তাটিও রমণীর বুকের তলাতেই আছে কোথাও। তাদের মিলনের সন্তান আসছে। আসবে। সুন্দরের জন্ম হবে। তার আলোর ছটায় সব কালো মুছে যাবে।

ফুসফুসের মধ্যে পাহাড়ের মত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন স্তূপীকৃত হয়েছিল। সেটা নির্গত হল। না, ছবির ওই মানুষেরা সে নয়। সে ইন্দ্র বিশ্বাসও নয়। সে এই বিজ্ঞানযুগের শশিশেখর। ব্যবসায়ী শশিশেখর দত্তগুপ্ত। সিগারেট ধরাল একটা।

তারপর টেবিল থেকে কালো চামড়ায় মোড়া পাণ্ডুলিপিটা টেনে নিল। খুলল। টানা অক্ষরগুলো তার চোখের ঘায়ে যেন এক প্রস্থ নাড়াচাড়া খেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হল আবার।

॥ সাত ॥

ইন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস। নামের মালিক নিজেই নামটাকে ছেঁটে ছোট করেছিলেন। ইন্দ্র বিশ্বাস। চালু নামও, পোশাকী নামও।

কিন্তু কোনো কিছু ছাঁট-কাট করার দিন নয় সেটা। বিশেষ করে রক্ষণশীল বনেদী পরিবারে সকল রকমের আতিশয্য আঁকড়ে ধরার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল তখন। কারণ নতুন যুগের হাওয়ায় শতাব্দী-কালের সংস্কার-বটের শিকড়সুদ্ধ নড়েচড়ে উঠেছিল। একটা নতুন যুগের পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছিল। আর পুরনো যুগের ছায়াটা আরো ঘোরালো ধারালো হয়ে যুগের বুক কেটে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিল। তাই অতি তুচ্ছ সংস্কারও তুচ্ছ ভাবা সহজ ছিল না সেদিন।

ইন্দ্র আর বিশ্বাসের মাঝে নারায়ণকে বিদায় করাও আদৌ তুচ্ছ ভাবে নি পরিবারের কেউ। বরং এটুকু পরিবর্তনের মধ্যেই একটা প্রবল অনিয়মের সূচনা দেখেছিলেন প্রবল প্রতাপ শম্ভুনারায়ণ বিশ্বাস। বহুদিন ধরেই ছেলের সঙ্গে একটা নীরব বিরোধ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর। বিরোধের বড় রকমের প্রত্যক্ষ হেতু নেই। সেদিনে একজন দুর্দম স্বাধীনচেতা পুরুষ আর একজনের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারার মধ্যেই আপন পৌরুষের জলুস দেখত। বিশ্বাস পরিবারের বংশ বংশ ধরে ছেলেদের নাম আর পদবীর মাঝখানে নারায়ণ বিরাজ করছিলেন। ফলে এক ছেলের এই বর্জনটুকু নিজের অপমান আর বংশের অপমান বলে ধরে নিয়েছিলেন শম্ভুনারায়ণ। দম্ভ ভেবেছিলেন। আত্মগর্বে ছেলে পিতৃধারা অস্বীকার করতে চায়, তাঁর ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

—নারায়ণ। নারায়ণ।

গুরুগম্ভীর ডাক শুনে ধারে কাছে যারা ছিল অনেকেই সচকিত, বিভ্রান্ত। কর্তাবাবু কাকে তলব করছেন কারোরই বোধগম্য হয় নি। বাইরে থেকে অন্দর মহলের দিকে চলেছিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস। বাইরের ঘরে মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আলবোলায় তামাক টানছিলেন শম্ভুনারায়ণ। তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন।

ইন্দ্র বিশ্বাস এগিয়ে এলেন।—কাকে ডাকছেন ?

তোমাকে। ওই নামে ডাকব। সাড়া দেবে।

দু জোড়া চোখ নিঃশব্দে পরস্পরের অন্তস্তলে বিচরণ করে নিল কয়েক মুহূর্ত।

কিছু বলবেন ?

কিছু বলব না। যাও।

বাড়ির সকলকে শুনিয়ে আর সকলকে সচকিত করে ওই নামে আরো অনেকবার ডেকেছেন তিনি। কিন্তু সাড়া মেলে নি। কেউ কাছে আসে নি। মা ভয়ে দিশাহারা—খোকা অপমান করিস ?

ছেলে গম্ভীর।—অপমান সেধে ডেকে নিলে আমি কি করব ?

স্ত্রী কাতর।—এত দুঃসাহস কেন তোমার ? আমার ভয় করে।

ইন্দ্র বিশ্বাস আরো গম্ভীর।—পঁচিশ বছর বয়সে আমি নতুন নামের লাগাম পরলে তোমার ভয় আরো বাড়বে বই কমবে না। পরক্ষণে উষ্ণ হয়ে উঠেছেন ইন্দ্র বিশ্বাস, তোমার সবেতে বাবাকে এত ভয় কেন ? বাবা কি করে আমার কাছ থেকে তোমাকে এতটা কেড়ে নিলেন ? বাবার কাছে কি আশা করো তুমি ?

হেমনলিনী জবাব দেন নি। মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু ভরসা করে সেটুকুও প্রকাশ করেন নি। ভয় তিনি শ্বশুরকে করেন না, ভয় তিনি আসলে স্বামীকেই করেন। খেয়ালী ভাবেন, স্বেচ্ছাচারী ভাবেন। শ্বশুরকে যেটুকু ভয় তাঁর, সে শুধু স্বামীর জন্যে। আসলে শ্বশুরের ছায়াটা বড় নিরাপদ ছায়া মনে করেন তিনি। ওই বৃদ্ধ তাঁকে বশীভূত করেছেন সত্যি কথা। কিন্তু তাতে মঙ্গল বই আর

কিছু ভাবেন না তিনি! এই শ্বশুরের মন পাওয়া ভাগ্যের কথা। তিনি ভাগ্যবতী।

গল্পে আছে, আগের কালের রাজ-রাজড়ারা অন্যায় বা বিদ্রোহের সূচনা দেখলে নিজের সন্তানকেও অনায়াসে শূলে চড়াতেন। নিজেদের নীতির কাছে তাঁরা অটল নির্মম। পরিবারের পোষ্যরা বৃদ্ধ গৃহস্বামীটির মধ্যে সেই রক্তের উষ্ণতা অনুভব করত। সর্বদা শঙ্কিত ত্রস্ত তারা। এ-যাবৎ অনেকবার সন্তান-নিপাতের বিভীষিকা দেখেছে, প্রমাদ গুনেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাড় কাঁপানো বিপর্যয় কিছু ঘটল না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

এই নাম নিয়ে বিরোধের পরিণতিও তেমন গুরুতর কিছুই হয় নি। ছেলের প্রসঙ্গে শম্ভুনারায়ণের মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া গাঢ়তর হত শুধু। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আরো সংক্ষিপ্ত হয়েছে! এর বেশি কিছু হয় নি। সকলের ধারণা, হতে পারত, হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল—হল না এই রক্ষা।

কিন্তু সম্ভব হলে শুধু নাম নয়, নামের মত অমন অনেক অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বরই নির্দ্বিধায় ছেঁটে দিতেন ইন্দ্র বিশ্বাস। কাউকে অপমান করার জন্য নয়, বংশের রীতি ওল্‌টানোর জন্যেও নয়। শুধু হাল্‌কা হবার জন্য, সহজ হবার জন্য। ছেলেবেলা থেকে বড় বিচিত্র আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়েছেন তিনি। বিভিন্ন বিপরীতধর্মী স্রোতের আঘাতে আঘাতে তাঁর মানসিক ধারা একটা নিজস্ব গতির মুখে চলেছে! এই গতিটাকেই বাড়ির লোকে খেয়াল বলে, গোঁয়ার্তুমি বলে, স্বেচ্ছাচারিতা বলে।

একদিকে বংশানুক্রমে অনেক আড়ম্বর দেখেছেন তিনি, চাকচিক্য দেখেছেন, অপচয় দেখেছেন। আড়াল থেকে প্রাসাদপুরীর বিলাসশালায় অনেক নর্তকীর নূপুরধ্বনি শুনেছেন, বাহুর মণিভূষণ জ্বলতে দেখেছেন, কটাক্ষে বিদ্যুৎ দেখেছেন। আহারে বিহারে ব্যসনে অনেক নব নব উত্তেজনার জোয়ার দেখেছেন, ভোগের নিত্য নতুন ক্লান্তি দেখেছেন। শুধু নিজেদের পরিবারে নয়,

সমপর্যায়ের সব পরিবারে উনিশ-বিশ একই কাঠামো, একই জীবন-যাত্রা।

কিন্তু আশ্চর্য, ভোগের আসন বদলে এঁরাই আবার উপাসনা সাধন ভজনের আসনে বসতেন। শুচিতার আড়ম্বরও তখন ঠিক তেমনিই উদ্‌বেলিত হয়ে উঠত। ছেলেবেলায় হাঁ করে ইন্দ্র বিশ্বাস অজস্রবার তাঁর বাবাকে রক্তপট্টাম্বর পরে আর কপালে রক্ততিলক টেনে কালীপূজা করতে দেখেছেন। নিজের হাতে তাঁকে ছাগ বলি দিতে দেখেছেন। দুর্গা পূজার ষষ্ঠী থেকে একাদশী—ছ'দিনের অবিরাম হৈ-হুল্লোড় বাদ্য-বাজনার পর তাঁর মনে হত কদিন ধরে ওই শব্দতরঙ্গের মধ্যেই ভাসছেন তিনি।

অন্তঃপুরের চেহারাটাও প্রায় সর্বত্র এক রকমই তখন। পুরুষের জীবন-কাব্যে মন্ত্রপড়া সাত পাকের অন্তঃপুরিকারা বেশির ভাগই উপেক্ষিতা। পুরুষের বহির্মুখী দৃষ্টির সঙ্গে রমণীদের অন্তর্মুখী দৃষ্টির শুভ বিনিময় কমই ঘটত। কিন্তু এ নিয়েও খেদ ছিল না খুব, অশান্তি ছিল না। প্রাসাদপুরীর অন্দরমহল কুলবতীদের বারো মাসের তেরো পার্বণে মুখরিত। আল্পনা এঁকে মঙ্গলঘট পেতে তাঁরা অন্তরীক্ষ দেবতাদের আশীর্বাদ ভিক্ষায় ব্রতিনী।

এই ঐতিহ্যের মধ্যেই বড় হয়েছেন ইন্দ্র বিশ্বাস। বংশের ধারা রক্তে মিশে থাকার কথা। তাঁর এই বেপরোয়া ব্যতিক্রম খুব স্বাভাবিক নয়। বরং আরো দুর্দম আরো প্রবল দাম্ভিক দ্বিতীয় শম্ভুনারায়ণ হয়ে বসাটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজের অগোচরে ছেলেবেলা থেকেই একটা বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেটা তিনি নিজে জানতেন না, পরিবারেরও কেউ জানতেন না। সেই বিপ্লবের ইন্ধন ছিল সেদিনের যুগের হাওয়ায়। বাইরের হাওয়ায়।

ইংরেজী স্কুলে পড়তেন ইন্দ্র বিশ্বাস। শম্ভুনারায়ণের মনস্তাপ, ওই শিক্ষাকেন্দ্রই ছেলের মাথাটি বেশ করে চিবিয়ে খেয়েছে। খুব মিথ্যে নয়। কারণ মনের ভিত রচনার প্রথম পর্যায়ে ঐতিহ্যের

ব্যূহ থেকে বেরিয়ে এসে মনটাকে নানাদিকে মেলে দেওয়া ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু তখনো তিনি ইন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস, শম্ভুনারায়ণের ক্ষুদে প্রতীক। তাই বাবার ধারণাটা খুব সত্যিও নয়। ইন্দ্র বিশ্বাসের সত্তায় আসল পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল যৌবনের সন্ধিক্ষণ থেকে।

উনিশ শতকের বাংলার সে যুগটাই যে কালান্তর ঘোষণার যুগ, সেটা শম্ভুনারায়ণের অন্তত উপলব্ধি করার কথা নয়।

ইন্দ্র বিশ্বাসের জন্মের পরের বছর মারা যান্ এদেশের ইংরেজ মনীষী হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ইন্দ্র বিশ্বাসের বয়স যখন দশ-বারো—ইংরেজি লিখতে পড়তে পারেন, তখনো ডিরোজিওর বোনা স্বাধীন চিন্তার বীজ ছাত্রদের মনের তলায় শাখায়-প্রশাখায় পল্লবিত। বারো বছরের কিশোর বাইশ বছরে ঝরে পড়া সেই কবি মনীষীর শোকে চোখের জল পর্যন্ত ফেলেছিল।

কিন্তু শম্ভুনারায়ণ ছেলের এই মনের খবরই রাখেন না। শুরু থেকেই তিনি শুধু একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। সুদক্ষ মালী যেমন নরম চারা দেখে ভবিষ্যতের মহীরুহের আঁচ পায়, তিনিও তখন সেই রকমই একটা আভাস শুধু পাচ্ছিলেন। ছেলের বাল্যের ধারাটা খুব চেনা মনে হত না সব সময়।

শম্ভুনারায়ণ প্রথম হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যখন, ছেলের বয়স তখনো তেরো পেরোয় নি। তিনি তখন নিজেকে সমাজ শাসকদের একজন মনে করতেন। বনেদী ঘরের বিত্তশালী সন্তানরা এ গৌরব নিজেরাই অর্জন করতেন। অন্য সকলের মত শম্ভুনারায়ণের বিবেচনায়ও দেশটা রসাতলে যাচ্ছে। ইংরেজী-পড়া ছেলে-ছোকরারা নিজেরাও অধঃপাতে যাচ্ছে, অন্যকেও সেই পথ দেখাচ্ছে।

তাদের অনাচারের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত। এর মধ্যে একজনের নাম প্রায়ই শোনা যাচ্ছিল তখন। সাগরদাঁড়ীর রাজনারায়ণের অর্বাচীন ছেলে মধুসূদন। পরিচিত মহলের ধারণা বাপের দোষেই ছেলে বিগড়েছে। কিন্তু কি একটা উপলক্ষে সেই

অনাচারী তরুণের প্রতি নিজের সাড়ে তেরো বছরের ছেলের বিশেষ একটা শ্রদ্ধাভাব আবিষ্কার করে শম্ভুনারায়ণ অবাক। মনে হল, ওই নামটা বালক মহলেও রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছে। এর কয়েক মাসের মধ্যেই হঠাৎ রক্ষণশীল সমাজে বেশ একটা আলোড়ন উঠল। রাজনারায়ণের সেই অর্বাচীন ছেলে খৃষ্টান হয়েছে। এই গোছের অঘটন ঘটতে পারে এ যেন জানাই ছিল সকলের।

কি ভেবে হঠাৎ ছেলের খোঁজ করলেন শম্ভুনারায়ণ। তাকে পেলেন না। তার মায়ের মুখে শুনলেন, দু'দিন ধরে সে কোথায় যে ছোটাছুটি করছে কেউ জানে না, নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত সিকেয় উঠেছে। এরপর ছেলের সঙ্গে যখন দেখা হল, ছেলের চাপা উত্তেজনাকে উদ্দীপনা বলে ভুল করলেন শম্ভুনারায়ণ। তিনি আদেশ করলেন, কাল থেকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না, বাড়িতে পণ্ডিত রেখে লেখাপড়া শেখা চলতে পারে, বাড়িতে ইংরেজি শিখলেও তাঁর আপত্তি নেই।

নেই ?

অন্য কিছু নয়, বালকের মুখে এরকম একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন শুনেই তিনি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। মুখের উপর এ রকম প্রশ্ন তাঁকে কেউ করতে পারে জানা ছিল না। ছেলের কচি মুখে সেই দিনই একটা বিদ্রোহের শিখা দেখেছিলেন তিনি।

জবাব দিয়েছেন. আমি বলছি, তাই—। আমার চাবুক দেখেছ? কিন্তু চাবুক দেখিয়েও কাজ হয় নি। সাত-পাঁচ ভেবে তাঁকে আদেশ প্রত্যাহার করতে হয়েছে। ইন্দ্র বিশ্বাস সেই সন্ধ্যায়ই পায়ে হেঁটে মামাবাড়ি চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে সংবাদ আসতে মায়ের কান্না বন্ধ হয়েছিল। মামা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। শম্ভুনারায়ণ বিশ্বাসকে তিনিই বুঝিয়েছিলেন, অমন তেজস্বী রত্ন ছেলেকে তিনি যেন বিপথে ঠেলে না দেন। তার থেকে অনেক বেশি লাভ হবে অমন ছেলেকে নিজের আয়ত্তে রাখতে পারলে। যে দিন কাল

আসছে তাতে ইস্কুলের লেখা-পড়া বন্ধ হলে তাঁর বংশের জ্যোতি বরং নিষ্প্রভ হবে।

এই উক্তির সঙ্গে শম্ভুনারায়ণ একমত নন। কিন্তু ছেলের বিপথগামী হবার আশঙ্কাটা মনে মনে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। একমাত্র ছেলের সঙ্গে এ-রকম রূঢ়তার ফল ভালো হবে না সেটা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন।

আদেশ তিনি প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু চাবুক দেখিয়ে যে ভুলটা তিনি করে রাখলেন, সেটার বীজ থেকেই গেল। ছেলেকে জানলে বুঝলে এ ভুল তিনি করতেন না। মধুসূদনের প্রতিভা চালচলন তাঁর বালক ছেলেকে মুগ্ধ করত, সত্যিকথা। যাদের চিন্তার বৈশিষ্ট্য ছিল, তাদেরই করত। তাই তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে একটা উত্তেজনার স্রোত বয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার পরে ওই বালক ইন্দ্র বিশ্বাসেরই নরম বুক যে ব্যথায় উদ্‌বেলিত হয়ে উঠেছিল, সে-খবর কেউ রাখে না। সেই ব্যথা বাবা-মায়ের ব্যথা—পিতা রাজনারায়ণ আর মা জাহ্নবীর ব্যথা। ইন্দ্র বিশ্বাস শুনেছিলেন, তাঁদের বুক একেবারে ভেঙে গেছে।

তাই যে ঘটনার ফলে শম্ভুনারায়ণ ছেলের অনেক কাছে আসতে পারতেন, ভুল করে তিনি তার বদলে অনেক দূরে সরে গেলেন।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ইন্দ্র বিশ্বাসের অন্তস্তলে নিজেরও অজ্ঞাতে নিঃশব্দে আরো কতজনের প্রভাব কতভাবে স্পর্শ করে গেছে ঠিক নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন সমাজচেতনার দণ্ডহাতে পূর্ণোদ্যমে জাগ্রত। সংস্কৃতির আকাশে মাইকেল মধুসূদন তখন বিদ্যুতের মতই মুহুর্মুহু ঝলসে উঠছেন। ওদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন ডিরোজিও-অনুরাগী স্থিরবুদ্ধি প্রৌঢ় চিন্তানায়ক রামতনু লাহিড়ী। ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত রাজনারায়ণ বসুর সংস্কারমূলক রচনা নিয়ে তখন সুদূর ইংলণ্ডে পর্যন্ত বহু আলোচনার সূত্রপাত হয়ে গেছে। ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে

যোগ দিয়ে সংস্কার-বিনাশী কুঠার হাতে নিয়েছেন তিনিও। প্রথম আধুনিক নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন ততদিনে নাট্কে রামনারায়ণ নামে বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। তাঁর কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটক সংস্কার-বটের শিকড় ধরে একপ্রস্থ টানাহেঁচড়া করেছে। আর, আপন আপন পরিবেশে সংহত শক্তির অমোঘ স্ফুরণ ঘটেছে ভাবীকালের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, কেশব সেনের মধ্যেও। এমন কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিশোর কালীপ্রসন্ন সিংহের নামও অপরিচিত নয়।

ইন্দ্র বিশ্বাস এঁদের কারো সঙ্গে হাত মেলান নি, কারো নীতি বা আচরণ নিজের জীবনে টেনে আনেন নি। কিন্তু একটা বিচ্ছিন্ন ব্যবধান থেকে সবই লক্ষ্য করেছেন, অনুভব করেছেন। প্রত্যক্ষ-ভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে এই যুগের প্রভাব তাঁর ওপরে ছিলই। আর কিছু না হোক, ভয় জিনিসটাকে তিনি জীবন থেকে ছেঁটে দিতে পেরেছিলেন। যুগের এই বহুমুখী প্রভাব থেকেই নিজস্ব একটা চারিত্রিক রূপ তাঁর ভিতরে ভিতরে সংহত হয়ে উঠেছিল। এই রূপটাকে চেনা জানা বোঝা তাঁর বাবার পক্ষে অন্তত সহজ ছিল না।

ছেলেবেলা থেকে আপন খেয়ালে মানুষ ইন্দ্র বিশ্বাস। ইংরেজি স্কুলে অভিজাত বাবু-ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ ঘরের ছেলেদের তেমন মনের মিল হত না। নাবালক মনেও তখন ঐশ্বর্যের ব্যবধান রেখাপাত করে যেত। ইন্দ্র বিশ্বাস খোলা মনে সতীর্থদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করতেন। কিছু না বুঝেই—আভিজাত্যের প্রতিক্রিয়া-শূন্য মন নিয়েই। কিন্তু সতীর্থদের আচরণে তফাত হতই। ফাঁক পেলে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করত। ইন্দ্র বিশ্বাস নিজেকে গুটিয়ে নিতেন। রাগে, অভিমানে। শিশুকাল থেকেই দুর্জয় অভিমান তাঁর। এই অভিমানই জীবনের সব থেকে বড় অবরোধ মানুষটার। কিন্তু বাল্য বা কিশোরকালের বন্ধুরা তা বুঝত না। দম্ভ ভাবত, আভিজাত্যের গর্ব ভাবত।

নিজের মনে, নিজের খেয়ালে থাকতেন তিনি। পড়াশুনা করতেন, পাখি শিকার করতেন, নিয়মিত ডন-বৈঠক-কুস্তি করতেন, পেস্তাবাদামের শরবত খেয়ে শরীর মজবুত রাখতেন। পনের বছর বয়সে বাবা তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। মহা আনন্দে ইন্দ্র বিশ্বাস বিয়ে করে ন বছরের চেলী পরা এক মেয়েকে ঘরে এনেছিলেন। তার পর তেমনি মহাবিস্ময়ে আবার একটা সজীব পুতুলকে নেড়ে-চেড়ে দেখেছিলেন। সেই একটু আধটু নাড়াচাড়া খেয়ে ছোট্ট মেয়েটা ভয়ে নীল। কাছে দেখলেই শাশুড়ীর কাছে এমন কি শ্বশুরের কাছেও ছুটে পালাতেন। বলতেন, ও আমাকে ধরে ঝাঁকানি দেয়। তাঁর হাতে পড়ে ন'বছরের চেলী পরা বউ ভ্যাঁ করে কেঁদেও ফেলেছেন অনেকদিন। ফলে মায়ের বকুনি, বাবার হুমকি। আবার তার ফলে নিরিবিলি অবকাশে বউয়ের ওপর দ্বিগুণ নির্যাতন।

কিন্তু বিয়ের বছর না ঘুরতে রাশভারী বাপের সঙ্গে অনমনীয় শ্বশুরের তুমুল বিরোধ বাধল কি নিয়ে। ঠিক কি নিয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস জানেন না। সম্ভবত আভিজাত্যের রেষারেষি নিয়ে। নয় তো কোনো স্ত্রীলোক নিয়ে। কেন বিরোধ তা নিয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস কখনো মাথা ঘামান নি। তিনি দেখলেন, বউকে কি এক অছিলায় বাপের বাড়ি নিয়ে গেল, আর আসতে দেওয়া হল না। তাঁর বাবা দূত পাঠালেন। কিন্তু বউ এলো না। বউয়ের মর্ম ইন্দ্র বিশ্বাস তখনো খুব ভাল বোঝেন নি। কিন্তু তাঁদের অপমান করে বউ আটকে রাখা হয়েছে সেটুকু খুব ভাল বুঝেছেন। প্রথমে ভাবলেন, বাবার আদেশ পেলেই আর একটা বিয়ে করে ফেলে শ্বশুরবাড়ির লোককে জব্দ করতে পারেন। কিন্তু সে-রকম আদেশ এলো না। পরে নিজেরও এটা পুরুষের ব্যবস্থা মনে হল না। তার থেকে বাবা হুকুম করলে দলবল নিয়ে তিনি বউটাকে অনায়াসে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারেন। জনাকয়েকের কিছু দাঁত উপড়ে দিয়ে আসতে পারেন, আর নাকের হাড় নরম করে দিয়ে আসতে পারেন।

সে-রকম হুকুমও না আসাতে প্রস্তাবটা নিজেই মায়ের কাছে করেছিলেন। বাবা কিছু বলেন নি, কিন্তু ছেলের প্রস্তাব কানে যেতে খুশি হয়েছেন মনে হয়েছে।

বছর চারেক বাদে, অর্থাৎ, ইন্দ্র বিশ্বাসের বয়েস যখন কুড়ি, তখন মা-ও ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করতে চেয়েছিলেন। বাবা হাঁ না কিছুই বলেন নি। ছেলে বিয়ে করলে উনি আপত্তিও করতেন না হয়তো। আপত্তি ইন্দ্র বিশ্বাসই করেছিলেন। চার বছরে মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পড়াশুনায় ঝোঁক বেড়েছে। কলেজে পড়েন। নিজের মধ্যে একটা সমাহিত শক্তি অনুভব করেন। বেশ আনন্দেই আছেন। এক-আধটি বারবনিতার সান্নিধ্যে এসেছেন—ভাল লাগে নি। নাচ-গানের আসরে যোগ দিয়েছেন—ভাল লাগে নি। বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেয়েছেন। কিন্তু সেটাও খুব আকর্ষণের বস্তু মনে হয় নি। একে একে এই বিস্মৃতির পথগুলো নিজেই বাতিল করেছেন।

বাবার সঙ্গে সর্বপ্রথম সোজাসুজি একটা সংঘাত বাধল আরো দুবছর বাদে। অর্থাৎ, তাঁর বাইশ বছর বয়সে।

কিন্তু এই সব-কিছুর মূলে যিনি তিনি আর একটি মানুষ। কৃষ্ণকুমার। বাবা আর ছেলের প্রথম সংঘাতের জন্য দায়ী তিনিই। শুধু এ-ব্যাপারে নয়, ইন্দ্র বিশ্বাসের পরবর্তী কালের জীবননাট্যেরও আসল নিয়ামক এই একজন।

ইন্দ্র বিশ্বাসের সমবয়সী। সহপাঠী। ছিপছিপে গড়ন, কালো। চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। মুখের দিকে চেয়ে যেন ভিতরসুদ্ধ দেখে নিতে পারেন। ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম। ইস্কুলে পড়তে প্রচণ্ড রেষারেষি হত তাঁর সঙ্গে। পরীক্ষায় বরাবর প্রথম স্থানটি যেন তার জন্যে পৃথক করা। কিন্তু রেষারেষির কারণ এটা নয়। কৃষ্ণকুমার কুটুমবাড়ির মানুষ—সম্পর্কে কুটুম্ব। কুটুম্বিতার সুতোটা অবশ্য নাগালের মধ্যে নয়। ইন্দ্র বিশ্বাসের খুড়শ্বশুরের শ্যালিকার ছেলে। অর্থাৎ, স্ত্রী হেমনলিনীর খুড়িমার বোনের ছেলে।

বিচারে তিনি ছেড়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কোনরকম প্রত্যক্ষ সম্পর্কের যোগ নেই। কিন্তু কাছে থাকলে সম্পর্ক অনাত্মীয় জনের সঙ্গেও গড়ে উঠতে পারে। তাই উঠেছিল। কৃষ্ণকুমারের বাবা পাঁচ বছরের ছেলে আর বউ ফেলে বিবাগী হয়েছিলেন। আর তাঁর সন্ধান মেলে নি। কৃষ্ণকুমারের মাও বেশিদিন বাঁচেন নি। ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর মাসী, অর্থাৎ হেমনলিনীর কাকিমা। হেমনলিনীর বাবা-কাকাদের যৌথ পরিবার। কাকা মারা যেতে হেমনলিনীর বাবাই তাঁর লেখাপড়ার ভার নেন। ছেলেটির চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ সম্ভবত তিনিও দেখেছিলেন, তাই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কোনরকম কার্পণ্য করেন নি। হেমনলিনী তাঁকে ডাকেন কৃষ্ণদাদা। কাকীমার বোনের ছেলেকে এছাড়া আর কি ডাকবেন তিনি ?

বউ বাপের আওতায় চলে যেতে এই একজনকে নাগালের মধ্যে পেয়েছিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস। বউয়ের প্রাপ্য ঝাঁকানি-টাকানিগুলো তার ওপর এসে পড়তে লাগল। কৃষ্ণকুমার সাক্ষাতে কখনো শত্রুতা না করুন, তিনি শত্রুপক্ষের একজন তো। তাঁকে নির্যাতন করতে পারলে সেটা যেন শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে পৌঁছুবে। এই এক অতি-সাধারণ ছেলের নাগাল ইস্কুলের লেখা-পড়ায় পেরে ওঠেন না, মনে মনে সেই অসহিষ্ণুতাও ছিল। ইস্কুলের অন্যান্য সহপাঠীদের সামনেই এই শালা, দূর শালা করতেন। রাগে কৃষ্ণকুমারের কালো মুখ আরো কালো হত। একদিন জবাব দিয়েছিলেন, বউ ঘরে আগলে রাখতে পারে না যে তার আবার শালা ডাকার সাধ !

ছেলে মহলে জানাজানি হয়ে গেল, ইন্দ্র বিশ্বাসের বউ ঘরে নেই—শ্বশুর তাঁদের আচ্ছা জব্দ করেছেন। ছেলের দল সামনা-সামনি ঠাট্টা-ঠিসারা করতে ভরসা পেত না, কিন্তু আড়ালের কানাকানি টীকাটিপ্পনী ঠেকানো গেল না। ফলে দুটো সবল হাতের নির্যাতনে কৃষ্ণকুমারের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

কিন্তু ক্ষীণশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীটি ভিতরে দুর্বল নন আদৌ। ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। অপরাধ স্বীকার করবেন না, ক্ষমা চাইবেন না। দৈহিক শক্তির জবাবে বিপক্ষকে বুদ্ধির ঘায়ে জব্দ করতে ছাড়তেন না। ওই রাতের পাল্লায় পড়ে চোখে জল তাঁর অনেকদিন এসেছে, কিন্তু সে জল গাল বেয়ে কখনো নামতে দেখা যায় নি। ইন্দ্র বিশ্বাস অনেকদিন আশা করেছেন, তাঁর অত্যাচারের জবাবে শ্বশুরবাড়িতে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। দেখা যেত না। মনে মনে তিনি খুব ভাল করেই জানতেন, এই নির্যাতনের খবর ছেলেটার আশ্রয়দাতাদের অন্দরে পৌঁছয় না। সেই জন্যেও রাগ তাঁর। এক-একদিনের বোঝাপড়ার পর ইন্দ্র বিশ্বাস এমনও ভেবেছেন, এবারে হয়তো নিরুপায় প্রতিদ্বন্দ্বীটি ইস্কুল পরিবর্তন করবেন। এ-কথা মনে হলে অবশ্য একটা অজ্ঞাত অশান্তি ভোগ করতেন। কিন্তু একদিন কি দুদিন পরেই ক্লাস-ঘরের নির্দিষ্ট আসনে প্রত্যাশিত মূর্তিটিকে আবার দেখা যেত।

একবারের কথা, কৃষ্ণকুমার তার বউ সংক্রান্ত কি একটা টিপ্পনী কাটতে ইন্দ্র বিশ্বাস হঠাৎ তার হাত মুচড়ে ধরেছিলেন। ফলে তার কব্জি আর কনুইয়ের কাছটা দুমড়ে যাচ্ছিল। যন্ত্রণায় মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইন্দ্র বিশ্বাসের তখন ঘাতকের মূর্তি।—আর বলবে?

মুখ দিয়ে না শব্দটা বার করলে, এমন কি মাথা নাড়লেও তিনি ছেড়ে দিতেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমার দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে রইলেন। অন্য ছেলেরা দূর থেকে তাকে ছাড়াতে চেষ্টা করলেন, টেনে ছাড়াবার সাহস নেই। মোচড় বাড়ছে, হাড় ভেঙে যাবার উপক্রম, যাতনায় কুঁকড়ে কৃষ্ণকুমার মাটিতে বসে পড়লেন—কিন্তু ইন্দ্র বিশ্বাসের মাথায় খুন চেপেছে।

শেষে কৃষ্ণকুমার মাটিতে শুয়ে পড়তে ছেড়ে দিলেন অবশ্য, কিন্তু ততক্ষণে ছেলেদের মধ্যে ছোটাছুটি পড়ে গেছে। কেউ গেছেন

জল আনতে, কেউ বা মাস্টারমশায়ের কাছে নালিশ করতে। কৃষ্ণকুমারের সুস্থ হতে সময় লেগেছে, যাতনায় তখনো সমস্ত মুখ বিবর্ণ, বিকৃত। কিন্তু উঠেই বলেছেন, ষাঁড়ের খপ্পরে পড়লে মানুষ আঘাত পায় বটে, তা'বলে কখনো ষাঁড়কে বলে না আর করব না। ছেলেরা ঘিরে না থাকলে ইন্দ্র বিশ্বাস আবারও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন হয়ত।

পরদিন কৃষ্ণকুমার ইস্কুলে অনুপস্থিত। তারপর পর পর আরো কয়েক দিন। ওদিকে তাকে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে নানা জটলা শুরু হয়ে গেছে। কেউ বলছেন, কৃষ্ণকুমারের হাড় ভেঙে গেছে— কাঠের গপ্পি লাগাতে হয়েছে হাতে, কারো সংবাদ, আঘাতের ফলে কৃষ্ণকুমারের একশ পাঁচ জ্বর। একটি ছেলে আবার বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করলেন, ইন্দ্র বিশ্বাসের বউয়ের আব্দার রাখতে কৃষ্ণকুমার ভাঙা হাতে সাঁতরে পদ্মফুল আনতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মারা গেছে। তাঁদের বাড়িতে হৈ-চৈ কান্নাকাটি চলছে।

হাড় ভাঙার খবরে ইন্দ্র বিশ্বাস গুম হয়ে ছিলেন, একশ পাঁচ জ্বর শুনেও মন অশান্ত হয়েছিল। দুর্বলকে এর পর থেকে তিনি ক্ষমাই করে যাবেন স্থির করেছিলেন। সুস্থ হয়ে কৃষ্ণকুমার আর এই ইস্কুলে না আসতে পারে মনে হতে নিজের অনুগত কাউকে দূত পাঠাবেন কিনা ভাবছিলেন। বলবেন, ননীর পুতুলকে গিয়ে বলে এসো ইন্দ্র বিশ্বাস ঠিক করেছে মরদ ছাড়া এরপর আর কারো গায়ে হাত তুলবে না। কিন্তু জলে ডোবার কথা শুনে তাঁর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। প্রথমে নিজের ওপরেই মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়েছেন পরে বউয়ের ওপর। খবর সত্যি হলে আর একটা খুনই তিনি করবেন তাতে কোনো ভুল নেই। সত্যি নয়, তা অবশ্য অচিরেই জেনেছেন।

কিছুদিন যেতে কৃষ্ণকুমার আগের মতই হাসি-হাসি মুখে ইস্কুলে হাজির। সকলে ছেঁকে ধরতে বিশেষ করে একজনকেই শুনিয়ে বললেন, বাড়ির সকলে মিলে দিন-কতক বাইরে থেকে

হাওয়া খেয়ে এলেন। হাতের ব্যথা? সে তো দু'দিনেই সেরে গেছে। সারবে না কেন, একজনের বউ দিন রাত দাসীর মত তার সেবা-যত্ন করল, হাত টিপল, পা টিপল, হুকুম তামিল করল···।

সঙ্কল্প ভুলে মনে মনে ইন্দ্র বিশ্বাস সেই মুহূর্তে আবার তার প্রাণ সংহারে উদ্যত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই আসুরিক রেষারেষি অবশ্য ছিল না। কিন্তু রেষারেষি ছিলই। ইন্দ্র বিশ্বাস সর্বদাই একটা বিপরীত আকর্ষণ অনুভব করতেন তাঁর প্রতি। দুদিন না দেখলে ভাল লাগত না। অথচ দেখা হলেই তর্ক হত, বুদ্ধির লড়াই বেধে যেত, একজন আর একজনকে জব্দ করার ফিকির খুঁজতেন। ইস্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ার সময়ও এইভাবেই চলেছে। কলেজ ছাড়ার সময় হয়ে এলো—তখনো দুটি মনের ভিতরের পরিবর্তন খুব হয় নি।

বয়েসকালে শ্বশুরবাড়ির লোককে অন্যভাবে শিক্ষা দেবার পন্থাও অবলম্বন করে দেখেছেন ইন্দ্র বিশ্বাস। সেই ন' বছরের বউয়ের প্রতি আকর্ষণ একটুও ছিল না—থাকার কথাও নয়। শ্বশুরবাড়ির সকলে তাঁর আর তাঁর বাবার কাছে মাথা নত করুক, এই শুধু চেয়েছিলেন। হঠাৎ এক-একদিন কৃষ্ণকুমারকে বগলদাবা করে যেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সেটা হয়তো কোন বাঈজী-বাড়ি। নাচ-গান হয়েছে, সঙ্গীকে দেখিয়ে আনন্দে মত্ত হয়েছেন ইন্দ্র বিশ্বাস, মদ খেয়ে ফুর্তি করেছেন। কিন্তু সঙ্গী সকৌতুকে নিরীক্ষণ করেছেন সব, বাধা দেন নি, মন্দ কথা বলেন নি, হিতোপদেশও দেন নি। এর পরের ক'দিন ইন্দ্র বিশ্বাসের লক্ষ্য করার পালা তাঁকে। কিন্তু দারুণ ক্ষোভে নিঃসংশয় তিনি, জামাইয়ের অধঃপাতে পা-বাড়ানোর সংবাদও শ্বশুরালয়ের কারো কানে ওঠে নি। অথচ মুখ ফুটে বলতেও পারেন না, এ-সব খবরের মত খবর তুমি যথাস্থানে জানাও না কেন?

সত্যিকারের একটা পরিবর্তনের সূচনা ঘটল তাঁর বাইশ বছরের মাথায়।

কিন্তু এর জন্য ইন্দ্র বিশ্বাস প্রস্তুত ছিলেন না আদৌ। তখন একটা নেশা তাঁর ধমনীর রক্তে মিশছিল। সেটা জুয়ার নেশা, বাজীর নেশা। কড়ির জুয়া, তাসের জুয়া, পাশার জুয়া, ঘোড়ার জুয়া। তাকে তাতিয়ে দিতে পারলেই কথায় কথায় বাজী ধরতেন। হারলে খেসারত দিতেন, জিতলে বিজিতকে শর্তানুযায়ী নাজেহাল করতেন। কথায় কথায় সাংস্কৃতিক আলোচনার ধোঁয়া উঠত সেদিন। এই থেকেও বিতর্ক উপস্থিত হত, বাজি ধরাধরি চলত।

এমনি এক তুচ্ছ উপলক্ষে একটা বড় রকমের ব্যাপার ঘটে গেল। গঙ্গার ঘাটে বসে কথায় কথায় বৈদেশিক প্রসঙ্গের আলোচনা উঠেছিল। শিক্ষিতদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড নিয়ে আলোচনা প্রায় পুরনো হয়ে এসেছে। কথা হচ্ছিল আমেরিকা নিয়ে। কিছুদিন ধরে ওই দেশটার সমাচার সংগ্রহ করছিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস। ১৭৭৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রসঙ্গে হঠাৎ থেমে জিজ্ঞাসা করে বসেছিলেন, ওই বছরটিতে এ-দেশেও এক বিষম অঘটন ঘটেছিল, কি বল তো?

কৃষ্ণকুমার ভাবলেন একটু, তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, এ-দেশে মানে কি?

এ-দেশে মানে বাংলা দেশে।

কৃষ্ণকুমার আবারও ভাবলেন, তারপর মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ স্মরণ হচ্ছে না।

ইন্দ্র বিশ্বাস সবিস্ময়ে ব্যঙ্গ করে উঠলেন, সে কি হে! মগজে বিদ্যে বোঝাই তোমার, আর এই জবাবটা দিতে পারলে না! মনে করিয়ে দেব?···এখানে তখন কার্টিয়ার সাহেব কোম্পানীর গভর্নর —রেজা খাঁ তাঁর রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী, মনে পড়ছে?

কৃষ্ণকুমার নির্বোধের মত হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

ইন্দ্র বিশ্বাস হেসে উঠলেন, আঃ-হা, *দেশের এমন সুসন্তান* তোমরা, তবু মনে পড়ছে না। আরো বলব?···দেশে অজন্মা হল, মড়ক লাগল, তিনভাগের এক-ভাগ লোক মারা গেল, যারা আধমরা হয়ে বেঁচে রইল রেজা খাঁ তাদের বুকে পাথর গুঁড়িয়ে রাজস্ব আদায় করে বেড়ালে···মনে পড়ছে?

শুনতে শুনতে কৃষ্ণকুমারের দু চোখে চাপা বিদ্রূপ উপচে উঠতে লাগল। বলল, রেজা খাঁর ওই কাজটি তো বংশ বংশ ধরে তোমরাও করে এসেছ, তাই সন তারিখ ঘুলিয়ে গেছে। আমাকে বলেছ বলেছ, আর কারো কাছে এই বিদ্যে জাহির করে হাসিয়ে মেরো না—এর থেকে অজন্মা মড়কে মরা ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা ঘোরালো হয়ে উঠেছিল ইন্দ্র বিশ্বাসের।—তার মানে?

তার মানে তোমার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১৭৭৬ সালের ব্যাপার নয়।

নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসেছেন ইন্দ্র বিশ্বাস। উদ্ধত আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাহলে বাজী হয়ে যাক একটা, কি বল? হারলে পর পর সাতদিন আমার হুকুম তামিল করে চলতে হবে—রাজী?

রাজী। আর জিতলে?

ইন্দ্র বিশ্বাস জ্বলজ্বলে দু চোখ মেলে প্রতীক্ষা করলেন। তাঁর হারার আশঙ্কা নেই, যে-কোনো শর্ত শুনতেও আপত্তি নেই।

কৃষ্ণকুমার ভাবলেন একটু, তার পর ঠাট্টা করে বললেন, তুমি এত বড় বনেদী ঘরের ছেলে, তোমাকে আর সাত দিন ধরে হুকুম তামিল করাই কি করে। একদিন, চব্বিশ ঘণ্টা আমার হুকুম মত চললেই খুশি হব।

ইন্দ্র বিশ্বাস নিজের উরুদেশে সদম্ভে চাপড় বসালেন একটা। অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ হলেন তিনি। এই একজনের সঙ্গে অনেকবার অনেক বাজীতে হেরেছেন। জেতার তাড়নায় বিপরীত সম্ভাবনাটা তাই তলিয়ে দেখেন না বড়।

কৃষ্ণকুমারকে খুঁজছেন তিনিও, কিন্তু সেই থেকে তাঁর কোনো পাত্তা নেই।

ইন্দ্র বিশ্বাস গম্ভীর মুখে জানালেন, তাঁর খাবার বাসনা নেই। কৃষ্ণকুমারকে ডেকে দিন, নয় তো তাকে জিজ্ঞাসা করুন আর কতক্ষণ আমাকে এখানে থাকতে হবে।

কৃষ্ণকুমারের খোঁজে চারদিকে লোক ছুটল। খানিক বাদে কৃষ্ণকুমার এলেন। তেমনি নির্বিকার। অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে হাসছেন মৃদু মৃদু। ধীরে সুস্থে বসলেন সামনে। বললেন, কাল বিকেল পর্যন্ত মিয়াদ. তোমার বাড়িতে মিছিমিছি ভাববেন সকলে, তাই তোমার বাবাকে একটা খবর দিয়ে এলাম।

দেহের রক্ত চলাচলও বুঝি থেমে রইল খানিকক্ষণ। তার পর ঝাঁকে ঝাঁকে রক্তকণাগুলো মুখের দিকে ধাওয়া করল। একটি কথাও বললেন না, নিষ্পলক চেয়ে আছেন তাঁর দিকে।

কৃষ্ণকুমার বড়সড় হাই তুললেন একটা। বললেন, ঘুম পাচ্ছে, আর রাত করো না, তাড়াতাড়ি খাওয়া সারো।

শাশুড়ী আর শাশুড়ীস্থানীয়ারা অবাক। এতক্ষণের সাধ্য-সাধনায় আর নীরব মিনতিতে যা হয় নি, এবারে তাই হল। জামাই উঠলেন, আসনে বসলেন, তার পর ধীর গম্ভীর মুখে আহারও সম্পন্ন করে উঠলেন।

কৃষ্ণকুমার এর পর তাঁকে আর একঘরে নিয়ে এলেন। সেটা শয়নঘর, পরিপাটী আরামের শয্যা বিন্যস্ত। কৃষ্ণকুমার ইঙ্গিতে বিছানা দেখিয়ে বললেন, বোসো—।

ইন্দ্র বিশ্বাস বসলেন। চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। কৃষ্ণকুমার হাসলেন একটু। তার পর গম্ভীর হঠাৎ। আবারও বললেন, কাল বিকেলের আগে আমার হুকুমের মিয়াদ ফুরোবে না। সকালে তোমার আচরণের খবর অজানা থাকবে না। তখন সকলের সামনে কারো পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়ার হুকুম করতে বাধ্য করো না আমাকে।

চলে গেলেন। ইন্দ্র বিশ্বাসের ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে

নিয়ে আসেন। চুক্তি অলাঙ্গুলি দিয়ে দুটো হাতে করেই দেহ থেকে মাথাটা ছিঁড়ে আনেন। কিন্তু কিছুই করলেন না তিনি। নিস্পন্দের মত বসে রইলেন শুধু।

এবারে যাঁর আসার কথা তিনি এলেন অনেকক্ষণ বাদে।

বধূ হেমনলিনী।

চিবুক পর্যন্ত ঘোমটা টানা। সর্বাঙ্গে ফুল-সাজ। মনে হল বাইরে থেকে গুটিকয়েক রমণী একরকম জোর করেই তাঁকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে দরজা টেনে দিল। কিন্তু ন' বছরের মেয়ের বদলে ঘরের মধ্যে এই একজনকে দেখে ইন্দ্র বিশ্বাসও হকচকিয়ে গেলেন কেমন। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছেন। মুখ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু হঠাৎ মনে হল ওই মুখে অনেক কিছু দেখার আছে। ন' বছরের যে মেয়েটা তাঁর লোহার মত দুটো হাতের ঝাঁকুনির ভয়ে নীল হয়ে যেত, এই সাত বছরের ব্যবধানে সেই মুখ কতটা বদলেছে দেখার লোভ হল। কিন্তু পরক্ষণে বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল, অপমানের কথা মনে পড়ল। বিস্ময় গিয়ে মুখে কঠিন রেখা পড়তে লাগল আবার।

হেমনলিনী দ জার কাছে দাঁড়িয়ে। ঘোমটায় মুখ-ঢাকা পটের মূর্তি যেন।

ন্দ্র বিশ্বাস অস্ফুট স্বরে ডাকলেন, এদিকে এসো।

যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে এলেন।

বোসো।

বসলেন।

ঝকমকে গহনা থেকে, ঝলমলে বসন থেকে জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে। এগুলোর আড়ালে বধূ আগের মতই ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ইন্দ্র বিশ্বাসের দেখার লোভ। সাত বছর বাদের দেখা। সাত বছরে নিজের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে ধারণা নেই। কিন্তু সামনে বসে যে, তাঁর মধ্যে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন অনুভব করছেন।

হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘোমটাটা সরিয়ে দিলেন। তার পর নির্বাক খানিকক্ষণ। বধূর দৃষ্টি আনত, মুখখানা শুকনো। কিন্তু চট করে দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না ইন্দ্র বিশ্বাস। মান-মর্যাদার কথা মনে পড়ল আবারও। বাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কাল, তাও মনে পড়ল। বললেন, কেন এখানে এসেছি জান ?

হেমনলিনী মাথা তুললেন আস্তে আস্তে। কালো টানা দুটি চোখ মুহূর্তের জন্য মুখের ওপর সংবদ্ধ হল। তার পর মুখ নামিয়ে মাথা নাড়লেন। জানেন।

কৃষ্ণকুমার বলেছে ?

নিরুত্তর।

কৃষ্ণকুমারই বলেছে, নইলে কেন এসেছে এ আর জানবে কি করে। ইন্দ্র বিশ্বাস গম্ভীর মুখে বললেন, এই দুঃসাহসের জবাব তাকে দিতে হবে।

হেমনলিনী সভয়ে তাকালেন আবারও। তার পর অস্ফুট মৃদুস্বরে বললেন, তোমার থাকতে ইচ্ছে না হলে তুমি চলে যাও।

এই রাতে যাব কি করে ?

বাবাকে বলে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

চকিতে কি-যেন মনে হল ইন্দ্র বিশ্বাসের। কি, নিজের কাছে স্পষ্ট নয় খুব। বললেন, কৃষ্ণকুমারের জন্য তোমার ভয় হচ্ছে ?

একটু চুপ করে থেকে তেমনি অস্ফুটস্বরে বললেন, কৃষ্ণদাদা কাউকে ভয় করেন না।

ইন্দ্র বিশ্বাস থমকালেন একটু।—আমি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছি।

নিরুত্তর।

ইন্দ্র বিশ্বাস আবার বললেন, কাল বিকেল পর্যন্ত তার হুকুম তামিল করার চুক্তি। চুক্তির বাইরে গেলে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে বলে শাসিয়ে গেছে সে।

ষোড়শীর দৃষ্টিটা আবার তাঁর মুখের ওপর সচকিত হল একবার। তাড়াতাড়ি বললেন, তাঁর কথায় কেউ দোষ ধরে না, আমি তাঁকে বলে দেব, তিনি তোমাকে আর কিছু বলবেন না।

তোমার কথা সে শুনবে?

হেমনলিনী নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ালেন, শুনবে। এতটুকু সংশয় থাকলেও কেউ এ-ভাবে মাথা নাড়ে না।

ইন্দ্র বিশ্বাস তাঁর ষোড়শী বধূকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। ভালো লাগছে। সেই ভালো লাগার সঙ্গে কি একটু যাতনাও চিন চিন করে উঠছে। মনে হচ্ছিল, অনেকগুলো দিন বৃথা নষ্ট হয়েছে। কি নিয়ে বিবাদ বাবার সঙ্গে শ্বশুর মশাইয়ের স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন। ঠিক স্মরণ হল না। তাঁর সামনে যে বসে সেও হয়তো জানে না। মর্যাদার একটা শুকনো রশি যেন ঢিলে হয়ে যেতে লাগল। কাছে এলেন, কাছে টানলেন একটু। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমাকে ভয় কর?

হেমনলিনী মুখের দিকে তাকালেন। সলজ্জে হাসতেও চেষ্টা করলেন। মুখখানা ঘেমে উঠেছে। বলতে চেষ্টা করলেন, ভয় করেন না। কিন্তু ভয় যে করেন সেটা তাঁর দুই চোখের গম্ভীরে স্পষ্ট।

কৃষ্ণকুমারকে ভয় কর?

প্রথম প্রশ্নের জবাব এড়াতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন হেমনলিনী। তক্ষুনি মাথা নাড়লেন। অস্ফুটস্বরে বললেন, কৃষ্ণদাদাকে ভয় করব কেন?

তা হলে আমি চলেই যাই, কি বল?

হেমনলিনীর মুখ রাঙাল। সলজ্জ দৃষ্টিটা মুখের ওপর রাখলেন একটু, তার পর মাথা নোয়ালেন। অর্থাৎ আগে যা বলেছিলেন তা নিছক ভয়েই বলেছিলেলেন।

কিন্তু পরেও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বধূর ভয় কাটে নি। উঠে আলো নিবিয়ে দিয়েছিলেন। কে কোথায় আড়ি পেতে আছে ঠিক নেই। তার পর খুব ধীরে সুস্থে একটি রমণীর

দেহ অধিকার করেছিলেন তিনি। তাঁর দুই বাহুর মধ্যে এক অসহায় অবলার থরথর শিহরণ অনুভব করেছেন। কিন্তু তাঁর এই অধিকারে মায়া ছিল না খুব, মমতা ছিল না। ক্রমশ বরং এক ধরনের নির্মম উত্তেজনায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে। বাহু-বন্দিনীর কাঁপুনি থেমে গিয়েছিল টের পেয়েছেন, মুহূর্তগুলি আর কোনো নিবিড় প্রত্যাশায় মূর্ত হয়ে উঠছে না তাও টের পেয়েছেন। আলো জ্বাললে কি দেখতেন জানেন। ভয়ে দিশেহারা ভীত ত্রস্ত পাংশু-মূর্তি দেখতেন একটি।

বাড়ি ফিরেছেন পরদিন বিকেলে। কৃষ্ণকুমার ঘড়ি ধরে ছেড়েছেন তাঁকে। হেসে হেসে ঠাট্টা করেছেন, আবারও বাজী ধরে হারতে রাজী আছেন কিনা।

বাড়ির হাওয়া থমথমে গম্ভীর। মায়ের চোখে ভয়। পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পরিচারকরা পর্যন্ত ত্রস্ত। কিছু একটা ঘটবে। এবং সেটা খুব ছোট-খাট কিছু নয়। সেই নিশ্চিত অঘটনের পূর্বাভাস যেন বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বাবার ঘরে ডাক পড়ল সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে। ইন্দ্র বিশ্বাস প্রস্তুত ছিলেন। প্রস্তুত হয়েই এলেন।

কাল সমস্ত রাত কোথায় ছিলে?

আপনি খবর পেয়েছেন শুনেছি।

প্রায় অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়েই ছেলের দিকে তাকালেন শম্ভু-নারায়ণ।—কথাটা তা হলে সত্যি? শ্বশুরবাড়িতে ছিলে?

ছেলে নির্বাক।

কিন্তু তাঁরা আমাদের অপমান করেছিলেন, অপমান করে বউমাকেও পাঠান নি, তোমার সে-কথা মনে ছিল না বোধ হয়?

ইন্দ্র বিশ্বাস জবাব দেন নি।

ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে গুড়গুড় করে খানিকক্ষণ তামাক টানলেন শম্ভুনারায়ণ, তারপর তামাকের নল নামিয়ে বললেন, আচ্ছা যাও।

সংক্ষিপ্ত উক্তিটুকুর ওখানেই যে শেষ নয়, তা অন্য সকলে যেমন জানতেন, ইন্দ্র বিশ্বাসও তেমনি জানতেন। কিন্তু নিজের জন্য তিনি একটুও উতলা হন নি। তাঁর খারাপ লেগেছে মায়ের দিকে চেয়ে। মা যেন সর্বদাই চকিত, তাঁর চোখে মিনতি। সম্ভব হলে তিনি ছেলেকে কিছু অনুরোধ করতেন, হাত ধরে হয়ত কান্নাকাটি করতেন। ফলে ইন্দ্র বিশ্বাস মনে মনে বাবার ওপর আরো বেশি বিরূপ।...আর বিরূপ হয়ত শুধু বাড়ির এই আবহাওয়া আর মায়ের শঙ্কার দরুনই নয়। তাঁর মনে হয়েছে, অন্তত এখন হচ্ছে, বাবার এ-রকম মেজাজের ফলে আর একটা মেয়ের প্রতি খুব সুবিচার করা হয় নি।

বাবার ঘরে আবার তাঁর ডাক পড়ল ঠিক দুদিন বাদে। দিনের বেলায়। সোনার তারে রুপোর তারে মোড়ানো আলবোলার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, অনেকদিন ধরেই তোমার বিয়ের কথা ভাবছিলাম। মোটামুটি কথাবার্তাও এগিয়েছে এক জায়গায়। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল শুনেছি।

খুব ধীর সংযতস্বরে ছেলে জবাব দিলেন, আমার দ্বারা আর বিয়ে করা সম্ভব নয়, এতদিন যাঁর ওপর অবিচার করা হয়েছে, আপনি সসম্মানে তাকেই আনার ব্যবস্থা করুন।

এই গোছেরই জবাব পাবেন তা যেন জানতেন। আয়েস করে আরো কয়েক বার তামাক টেনে বললেন, তোমার বাপ-ঠাকুরদার মান-অপমানের দিকটা ভাবার দরকার আছে বলে মনে কর না তা হলে?

করি। অপমান কেউ যদি করে থাকেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনরকম সংশ্রব রাখার দরকার নেই।

ও...। তামাক টানছেন।—বউমাকে নিয়ে আসতেই বলছ তা হলে?

মৌন থেকে ছেলে বুঝিয়ে দিলেন, সে-রকমই ইচ্ছে তাঁর। তিনি বললেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

এই ভেবে দেখায় অনেকরকম আশঙ্কা থিতিয়ে ছিল বাড়িতে কয়েকটা দিন। কিন্তু যথার্থ ভেবেই দেখলেন তিনি। তাঁর বিচক্ষণতা কম নয়। ছেলে বড় কিছু সংঘাতের জন্যে মনে মনে প্রস্তুত এটুকু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ছেলেকে তিনি চিনতেন, কিন্তু এতটা চিনতেন না হয়তো। বাইরের মান অপমানের ফয়সালার ঝোঁকে নিজের ছেলে আয়ত্তের বাইরে চলে যাক, এ তিনি চান নি। বংশানুগত অপচয় সত্ত্বেও তাঁর বিত্তের পরিমাণ অঢেল। এর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় মমতা ছিল।, তাই কূটনীতিজ্ঞের মত একমাত্র বংশধরটিকে তিনি আগলে রাখাই সমীচীন বোধ করলেন।

বেয়াইয়ের কাছে বিনীত পত্র-দূত পাঠালেন। তাঁর এবং গৃহিণীর বয়েস হয়েছে। বউমাকে এখন নিজের ঘর-সংসার বুঝে নিতে হবে। অতএব অনুগ্রহ করে অবিলম্বে তিনি যেন বউমাকে পাঠিয়ে দেন।

চিঠি পেয়ে ততোধিক বিনয়ে বেয়াই কন্যাকে তাঁর শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বহুদিন বাদে একটা প্রায় অকারণ বিবাদের সহজ মীমাংসা হয়ে গেল। দুই পরিবারের লৌকিকতায় আর সৌজন্য-বিনিময়ে বাধা থাকল না।

কিন্তু রাশভারী শম্ভুনারায়ণ বিশ্বাসের বুকের সঙ্গোপনে ছেলের প্রতি কিছুটা ক্রূর অভিমান জমাট বেঁধে থাকল, সে-খবর কেউ রাখে না।

এদিকে হেমনলিনী সংসার করতে এলেন বটে, কিন্তু অনুভূতির প্রথম কৈশোরে যাঁকে ভয় আর বিভীষিকার চোখে দেখেছিলেন— সেই অনুভূতিটাও তাঁর মধ্যে বাসা বেঁধেই থাকল। স্বামীর সকল ব্যাপারে তাঁর অকারণ ভয়টা খুব গোপন থাকত না। অনেক নিরিবিলি প্রগল্‌ভ অবকাশে ইন্দ্র বিশ্বাস রীতিমত বিস্মিত হয়েছেন। স্ত্রীর চোখে মুখে অজ্ঞাত ভয়ের ছায়া দেখেছেন। শ্বশুরবাড়িতে সেই রাতটার কথা মনে পড়তে নিজেই লজ্জা বোধ

করেছেন। দেহ-দেউলের সেই প্রথম আরতি যেমন স্থূল তেমনি কলাকৌশলবর্জিত। কিন্তু কিছুকাল বাদেও স্ত্রীর নিভৃতের এই ভয়ের ছায়াটা খুব স্বাভাবিক মনে হয় নি ইন্দ্র বিশ্বাসের।

হেমনলিনী স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মনের কথা বুঝতে পারেন, বলার আগে মনোমত কাজ করে দেন। তবু ইন্দ্র বিশ্বাসের মনে হয়, এই আনুগত্যের সঙ্গে ভয়ের যতটা যোগ প্রীতির ততটা নয়। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন এই নিয়ে, কিন্তু কখনো সদুত্তর পেয়েছেন ভাবেন নি। ফলে মনের তলায় অনেক সময় কৃষ্ণকুমারের মুখখানা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে এই স্ত্রীটিরই আবার অভিভাবকের মত ব্যবহার। ইন্দ্র বিশ্বাস আড়াল থেকে শুনেছেন, দেখেছেন। হেমনলিনী তাঁকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, তাঁকে চোখ রাঙান, তার ওপর হম্বিতম্বি করেন। আর কৃষ্ণকুমার শুধু হাসেন।

হাসেন ইন্দ্র বিশ্বাসও। মানুষটা অনুদার নন। আর যত রেষারেষিই থাক, তাঁকে মনে মনে অশ্রদ্ধাও করেন না। এই প্রীতির বন্ধনটুকু অস্বাভাবিক ভাবেন না। তবু শ্যালক ভাজনকে প্রকাশ্যেই একটু আধটু ঠেস দেন এই নিয়ে, স্ত্রীকেও দুই একটা রঙ্গ-কথা বলেন। যেমন, সেদিন মন দিয়ে একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস। কৃষ্ণকুমার পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকলেন, পিছনে হেমনলিনী। কৃষ্ণকুমার বললেন, ও আমাকে খাইয়েই মেরে ফেলবে কোন্ দিন—

ইন্দ্র বিশ্বাস বই থেকে মুখ তুললেন, চোখে চাপা কৌতুক। কৃষ্ণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, কি পড়ছিলে, বেশ রসালো কিছু মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ। একটা লোকের দূরদৃষ্টি দেখে দুঃখও হচ্ছিল হাসিও পাচ্ছিল। অনেকটা তোমার সঙ্গে মেলে, আবার শেষ মিললে সর্বনাশ···

কি রকম?

লোকটা তার প্রিয় পাত্রীটির সুখের ঘরকন্না দেখে আনন্দে কাঁদত—এই চেয়েছিল সে। আবার এক-একসময় নিজের রিক্ততার যন্ত্রণায় দাঁতে করে নিজের শরীরের চামড়া ছিঁড়ত। একদিন মেয়েটি এক পাহাড়ের নীচ দিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে হাসি মুখে বেড়াচ্ছিল, আর লোকটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। হঠাৎ সে পাহাড়ের ওপর থেকে তাদের সামনে লাফিয়ে পড়ল, তাজা শরীরটা এক মুহূর্তে ভেঙে দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে গেল।

গল্প শেষ হতে কৃষ্ণকুমার আর ইন্দ্র বিশ্বাস দুজনেই হাসছিলেন, কিন্তু হেমনলিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। এ-রকম রসিকতা তাঁর ভালো লাগে না।

তবু এ-রকম রসিকতাই ইন্দ্র বিশ্বাস মাঝে-সাজে করে বসেন। কৃষ্ণকুমার হাসেন। আর হেমনলিনী বলেন, তোমার মুখের যদি একটুও লাগাম থাকত, কৃষ্ণদাদাকে নিয়েও যা-খুশি বল—

কেন, তোমার কৃষ্ণদাদা মানুষ তো, না কি?

কৃষ্ণদাদার মত এমন মানুষ হয় না।

হাসতেন ইন্দ্র বিশ্বাসও। কিন্তু সেই হাসির তলায় আর কিছুও চিনচিন করে উঠতে চাইত।

এই বধূটিকে ভারী সহজেই একেবারে বশ করে ফেলেছিলেন শম্ভুনারায়ণ বিশ্বাস। তিনি প্ল্যান না করে কোন কাজ করেন না। বঁড়শীর এই একদিকে সুতোটা তিনি শক্ত-হাতেই নিজের দখলে রেখেছিলেন। ছেলের মনোভাবের সঙ্গে বউয়ের মনোভাবের মিশ খেয়ে গেলে ফল কি হবে তিনি জানতেন। না যাতে যায় তিনি সেই ব্যবস্থাই করতেন। ছেলেবেলা থেকে এ-যাবৎ ছেলের বহু কাণ্ডজ্ঞানহীনতার গল্প তিনি রসিয়ে-রসিয়ে মা-লক্ষ্মীকে শুনিয়েছেন। সর্বদা মা মা করেন, কই, আমার মা কই গো, আমার মা-লক্ষ্মী কোথায়?

ফলে মা-লক্ষ্মীর দুটি কানের একটি সর্বদাই শ্বশুরের ডাকের প্রতি উৎকর্ণ। ঠাকুরের সাড়া পেলেই সব কাজ ফেলে ছোটেন।

শ্বশুরের প্রতি এত ভক্তি আর এত টানও অনেক সময় অস্বাভাবিক মনে হয় ইন্দ্র বিশ্বাসের। তিনি পারিবারিক আচার অনুষ্ঠান ব্রতপার্বণের বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁর বাবা বধূটিকে বিশেষ করে এ-সবের মধ্যেই জুড়ে দিয়েছিলেন। এইসব যাগযজ্ঞ ব্রত ক্রিয়াকলাপের অনেক অলৌকিক কাহিনীও শোনাতেন তাঁকে। হেমনলিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন, বিশ্বাসও করতেন। স্বামীর মুখে অসন্তোষের ছায়া দেখলেই আবেদনের সুরে বলতেন, ঠাকুর মনে ব্যথা পাবেন যে, রাগ করতে আছে। ঠাকুর বলতে শ্বশুর।

ইন্দ্র বিশ্বাসের মনে যা-ই থাক, মুখে প্রকাশ করতেন না। মানসিক দিক থেকে তাঁর বাবাও যে হেমনলিনীর একটা বিচ্ছিন্ন পথে চলার ভাল রকম সহায়তা করেছিলেন, তাতে কোনো ভুল নেই।

দু'বছর না যেতে সন্তান এসেছে হেমনলিনীর কোলে। মেয়ে। বৃদ্ধ খুঁত খুঁত করেছেন, তাঁর বংশধর কাম্য। বিত্তরক্ষার মালিক চাই। একটি নাতি এলেই শিক্ষা-গর্বিত ছেলেকে আরো একটু শিক্ষা দিতে পারেন তিনি। কিন্তু নাতনীকেও অনাদর করেন না। নিজের কাছে কাছে রাখেন। ঠাট্টার ছলে বউমাকে সাবধান করে দেন, মেয়েকে ওই গোঁয়ারটার কাছে বেশি ঘেঁষতে-টেঁষতে দিও না মা লক্ষ্মী, ওর কি আচার-বিচার জ্ঞান আছে কিছু! কুশিক্ষা দিয়ে ম্লেচ্ছ বানিয়ে ফেলবে, ওদের বাবা কেমন সাহেব দেখছ না! মেয়ে সন্তান নিয়ে বিপদ হবে তখন।

মা-লক্ষ্মী হেসেছেন। কিন্তু মনে মনে একেবারে অবিশ্বাসও করেন নি বোধ হয়। স্বামীর সকল ব্যাপারে তাঁর অহেতুক আশঙ্কা একটা আছেই। তাই দুধের শিশুটিকেও নিজের অগোচরে পরোক্ষ-ভাবে একটু যেন আগলেই রাখেন।

ফলে সংসারের এই সুনির্বিঘ্ন যাত্রাপথেও ইন্দ্র বিশ্বাস অনেকটা নিঃসঙ্গ যাত্রী। পড়াশুনা নিয়ে থাকেন, ভালো না লাগলে মদ

খান, অনেক সময় পর্যন্ত গঙ্গার ধারের নিরিবিলিতে কাটিয়ে বেশি রাতে বাড়ি ফেরেন।

কিন্তু এই সংসারে এক বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা উপস্থিত, যার প্রতি গোড়ায় অন্তত কারো লক্ষ্যই পড়ে নি। হেমনলিনীর না, ইন্দ্র বিশ্বাসের না, এমন কি অতি বিচক্ষণ বৃদ্ধ শম্ভু-নারায়ণেরও না।

বাড়ির গৃহিণী চোখ বোজার অনেক আগেই একজনের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু সেই রমণীটির অস্তিত্ব তখনো এত নগণ্য যে, কারও মনে কোন প্রতিকূল সম্ভাবনার সংশয় রেখাপাতও করে নি।

তিনি বামুনদিদি কনকদামিনী।

হেমনলিনীর থেকে বছর তিনেক বড়, বছর বাইশ বয়েস তখন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, ব্রাহ্মণের বিধবা। বাপের বাড়ির দিকেও দরিদ্র বড় পরিবার, শশুরবাড়ির দিকেও তাই। এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন তিনি। বিধবা হবার পর থেকে বাপের অনাদর আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি মারা যেতে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। ভাই ভাইপোর সংসারে তাঁর বেশিদিন ঠাঁই হয় নি। এই বয়সেই ভাল রান্নার সুনাম ছিল তাঁর। কারো বাড়িতে উৎসব-টুৎসব হলে তাঁর রান্নার ডাক পড়ত। দুই-একজন পিতৃবন্ধুর অনুকম্পায় এ-পর্যন্ত তিন জায়গায় রান্নার কাজ করেছেন। কিন্তু ওই বয়সের বিধবা মেয়ের সত্যিকারের আশ্রয় জোটা খুব সহজ নয়। ওই তিন জায়গা থেকেই কয়েকজোড়া লুব্ধ চোখকে ফাঁকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে এসেছেন।

এ-বাড়িতে আশ্রয় জুটেছিল বাড়ির পুরোহিতের কল্যাণে। কনকদামিনী তাঁকে কাকা ডাকতেন। তিনি একদিকে এই বাড়ির গৃহিণীর কাছে জন্মদুঃখিনী মেয়েটির অনেক সুখ্যাতি করলেন, অন্যদিকে কনকদামিনীর কাছেও এই পরিবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। হলুই বা কায়েতের ঘর, কারো ছোঁয়াছানি

তো আর খেতে হচ্ছে না। নিজেরটা করে-কর্মে নেওয়া। সব থেকে বড় কথা, বাড়ির কর্তাটি বৃদ্ধ, প্রায় অশক্ত। একটিমাত্র ছেলে, তা তিনিও বিবাহিত এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে উদাসীন। যেমন গোঁয়ারগোবিন্দই হোক, বা যত উচ্চশিক্ষিতই হোক, স্ত্রীলোকঘটিত অপবাদ তাঁর নেই—বড়লোকের বাড়িতে যা একান্ত দুর্লভ।

এইসব শুনেই কনকদামিনী এ-বাড়িতে কাজ নিয়ে এসেছিলেন। প্রথম থেকেই যদিও মনে হয়েছে পুরুতকাকা অত্যুক্তি করেন নি, তবু গোড়ার দিকে এক-গলা ঘোমটা টেনেই থাকতেন সর্বদা। মুখ দেখানোর ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা বড় করুণ। কিন্তু এখানে ক্রমশ তাঁর ভয় ভেঙে আসছিল।

একটা ঘোমটাপরা বিধবা মেয়েকে ইন্দ্র বিশ্বাস বাড়িতে দেখেছেন, এই পর্যন্ত। খুব খেয়াল করেন নি, রান্নার কাজ করেন তাও শুনেছিলেন হয়তো। এ-রকম একজনের প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকার কথা নয়, ছিলও না। কিন্তু সেদিনের ছেলেদের অন্দরমহলে ঢোকার যেমন বিশেষ একটা সময় ছিল, ইন্দ্র বিশ্বাসের তা ছিল না। ভিতরেই তিনি থাকতেন বেশির ভাগ, নিজের ঘরে বই পড়ে কাটাতেন। অন্যমনস্কের মত এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করতেন। ওদিকে কনকদামিনীর পুরুষের শ্যেনচক্ষুর ভয়ও ততদিনে কেটে এসেছে। তাঁর অগোচরেই ইন্দ্র বিশ্বাস তাঁকে দিন দুই দেখলেন। একদিন রান্নাঘরের দাওয়ায় চুল খুলে বসেছিলেন। মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছিল। পিঠের ওপর দিয়ে এক বোঝা চুল মাটিতে লুটোচ্ছে, মুখখানা কালো, সুঠাম স্বাস্থ্য। কিন্তু ইন্দ্র বিশ্বাস দাঁড়িয়ে যা দেখলেন, তা শুধু রমণীর কালো মুখের ভারী কমনীয় অথচ ঋজু অভিব্যক্তি।

স্ত্রীর সাড়া পেয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস ফিরে তাকালেন। হেমনলিনী যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, উনি কে?

হেমনলিনী অবাক।—ও মা, তুমি এতদিনে দেখলে? উনি তো বামুনদি!

বামুনদির কিছু প্রশংসার কথা ইন্দ্র বিশ্বাসের কানে স্ত্রীর মারফত আগেও এসেছিল। কিন্তু খুব খেয়াল করে কিছু শোনেন নি তিনি।

হেমনলিনী বললেন, বামুনদির মত কালো মুখের অমন শ্রী আমি আর দেখিনি, ও-দিক ফিরে আছেন নইলে কি সুন্দর টানা দুটো চোখ, দেখতে পেতে।

ইন্দ্র বিশ্বাস ভুরু কোঁচকালেন একটু। সত্যিই কারো টানা চোখ দেখার জন্যে তিনি দাঁড়িয়ে নেই। চোখে পড়েছে তাই জিজ্ঞাসা করেছেন। একটু বাদে ওপরে দাঁড়িয়েই দেখলেন, নীচে গিয়ে হেমনলিনী হাসিমুখে তাঁর বামুনদিকে বলছেন কিছু। সঙ্গে সঙ্গে চকিতে একবার ঘাড় ফিরিয়েই এক হাত ঘোমটা টেনে দিয়ে দাওয়া ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন তিনি। হেমনলিনী হাসছিলেন। হাসারই কথা। মানুষটা এতদিন ধরে ঘরে আছে, আর কর্তাটি এই প্রথম দেখলেন তাকে। সে-কথাই বলেছিলেন হয়তো।

ইতিমধ্যে পড়াশুনোর অসুবিধে হয় বলে শোবার ঘর বদলেছিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস। মদের নেশার মত পড়াশুনাটাও নেশায় দাঁড়িয়েছিল তখন। এক-একদিন অনেক রাত জেগে পড়তেন। কৃষ্ণকুমার এলে তাঁকে ধরে বেশি রাত পর্যন্ত বাজী ধরে দাবা খেলতেন। মস্ত হল্‌ঘরের মত ঘর। ঘর বদলানোয় স্ত্রীর আপত্তি দূরে থাক, মনে মনে তিনি খুশি হয়েছেন বলেই বিশ্বাস। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর রাতে বিছানায় গা দিতে না দিতে হেমনলিনী ঘুমিয়ে পড়তেন। ঘর বদলানোর ফলে এই নিশ্চিন্ত ঘুমের পিছনে কোনো মানসিক সঙ্কোচ ছিল না। কিন্তু একঘরে থাকতে সঙ্কোচ হত। আর পাঁচ জন পুরুষের মত যে-লোক বিস্মৃতির রসদ খোঁজার তাড়নায় বাইরে কাটিয়ে আসেন না, সমস্ত দিনের পর ঘুম-জোড়া চোখ নিয়ে তাঁর সামনে আসতে একটু সঙ্কোচ হত বইকি। অনেক-দিন কাঁচা সরষের তেল রগড়ে চোখ থেকে

ঘুম তাড়াতে চেষ্টা করেছেন তিনি। ঘর বদলানোর ফলে ক্রমশ সেই চক্ষুলজ্জাও গেছে।

আসন পেতে কখন তাঁর রাতের খাবার ঢেকে রাখা হয়, ইন্দ্র বিশ্বাস প্রায়ই টের পান না। ফলে পড়ার বইএ নিবিষ্ট থাকলে খাবারটা ঢেকে রাখার সময় কনকদামিনী ইচ্ছে করেই হয়তো ঢাকনাটা একটু শব্দ করে রাখেন। তার পরেও উঠতে দেরি হলে কনকদামিনী এক ফাঁকে ঘরে ঢুকে খাবারটা তুলে নিয়ে যান। গরম খাবার এনে রাখেন। রাতে ফিরতে দেরি হলেও ঢাকনা তুলে গরম খাবারই পান। দাবা খেলার পর কৃষ্ণকুমার বেশি রাতে প্রস্থান করলেও তাঁর আহার্য ঠাণ্ডা হয়ে থাকে না। খেতে বসে বাইরের দোরের আড়ালের আবছা আঁধারে কারো উপস্থিতি অনুভব করেন। নিজের এই অনিয়ম রমণীটির প্রতি অত্যাচার মনে হয় তাঁর। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়েই গম্ভীর মুখে বলেন, সমস্ত দিন খাটুনির পর তুমি জেগে বসে থাক কেন। বার বার খাবার গরম করারও দরকার নেই, আমার অসুবিধা হয় না।

কেউ শুনেছে কি শোনে নি বোঝা যায় নি। না শোনার কথা নয়। কিন্তু বলার ফলে ব্যতিক্রম কিছু হয় নি। মুখ-হাত ধুয়ে এসে ঢুলুঢুলু চোখে চাকরকে উচ্ছিষ্ট মোচন করতে দেখেছেন। ঘরের বাইরে এসে দ্বিতীয় কাউকে দেখেন না। চাকরকে জিজ্ঞাসা করে এই রমণীটির রীতি জেনেছেন। ও বেচারারাও কষ্ট করে রাত জেগে বসে থাকুক, কনকদামিনী তেমন জোর করেন না। তারা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েই পড়ে। বাবুর খাওয়া হলে উনি তাদের ডেকে দেন, বলেন, যা বাবুর খাওয়া হয়েছে, বাসন তুলে নিয়ে আয়গে।

আশ্চর্য! রূপসী স্ত্রী কন্যার মাঝে থেকেও যে-মানুষটার ভিতরে মরুনীরস একটা শুকনো টান ধরে এসেছিল, এই অতি সামান্য এক রমণীর অলক্ষ্য স্নেহের ধারায় সেই মনটিই আবার ভিতরে ভিতরে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। একটুখানি একান্ত স্নেহ যে এত কাম্য এ তিনি আগে কখনো অনুভব করেন নি। অথচ পরিচারিকা-

সদৃশার এই অযাচিত স্নেহ পেয়ে ভিতরে ভিতরে তিনি বিব্রত বোধ করেছেন বেশি। ততদিনে স্ত্রীর কাছে এঁর দুঃখময় জীবনের কথা অনেক শোনা হয়ে গেছে। শুনে মুখে কিছু বলেন নি, কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধাই পোষণ করেছেন।

ঠিক এরই কিছুদিন আগে থেকে দেশের সামাজিক আবহাওয়ায় একটা বড় রকমের তোলপাড় উপস্থিত হয়েছিল। বিধবা-বিবাহের দুর্বল আন্দোলনটা ক্রমশ যেন সজীব হয়ে উঠছে। এই রণক্ষেত্রে তখনো বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব ঘটে নি। তখন মেয়েদের বিয়ে হত তিন বছর চার বছর ছ' বছর আট বছর বয়সে। আর এই এই বয়সের মেয়েরা বিধবা হলে তাদের আত্মীয় পরিজনদের কিছুটা দিশেহারা হবারই কথা। যাদের ঘরে এই অঘটন উপস্থিত বিশেষ করে তারাই চেঁচামিচি করত—এর বিহিত একটা কিছু হওয়া উচিত। নিরাপদ আলোচনার আসরে বসে দুই একজন পণ্ডিত এমন মতও ব্যক্ত করলেন যে, পুরুষের অপেক্ষা রমণীর রিপুগুণ অষ্টগুণ প্রবল, এ অবস্থায় ভ্রূণহত্যা নারীহত্যার থেকে শাস্ত্র বিধি অনুযায়ী বিধবা-বিবাহ যুক্তিযুক্ত!

কিন্তু পণ্ডিতেরাও এই যুক্তি জোর গলায় ঘোষণা করেন নি, আর রক্তচক্ষু সমাজের ভয়ে কম লোকই এই যুক্তির দিকে কান দিয়েছে। এমন কি এই দুরদৃষ্ট যাদের ঘরে হানা দেয়, তারাও কিছুদিন বাদে আবার নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে।

ইন্দ্র বিশ্বাসও সমাজের এই ব্যাপারটা নিয়ে কখনো মাথা ঘামান নি। কিন্তু তাঁর বাবাকে মাথা ঘামাতে দেখেছেন। বয়সের জরায় ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়ছেন তিনি। তাই এ-সব আলোচনাই এখন বিস্মৃতির খোরাক। তা'ছাড়া সামাজিক ভালো-মন্দের ব্যাপারে নিজের অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর মতামতের বিশেষ একটা মূল্য আছে। সেই মতামত তিনি বেশ চড়া সুরেই দিয়ে থাকেন। বিধবা-দরদীদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন, কটূক্তি করেন।

এই সময় একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটল। অবশ্য সেটা শুধু

ইন্দ্র বিশ্বাসের কাছেই হয়ত কৌতুককর।...শ্যামাচরণ দাস কর্মকার লোকটার নাম তাঁর শোনা ছিল। তাঁর থেকেও তাঁর বাবার আরো বেশি শোনা ছিল। লোকটার টাকা-কড়ি আছে। কিছুদিন আগে তাঁর কচি মেয়েটা বিধবা হয়েছে। এই শোক বাপের বুকে নাকি শেলের মত বিঁধে ছিল। দুঃখের ব্যাপারে দুঃখিত সকলেই হয়েছেন। কিন্তু এ তো ঘরে ঘরে ঘটছে, শোক নিয়ে আর কে কত দিন বসে থাকে।

হঠাৎ শোনা গেল শ্যামাদাস কর্মকার মেয়ের আবার বিয়ে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্যবস্থা পেলে মেয়ের আবার বিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প তিনি। ব্যবস্থা-লাভের চেষ্টাও করতে লাগলেন তিনি।

পাড়ায় পাড়ায় জটলা শুরু হয়ে গেল। শম্ভুনারায়ণও এই নিয়ে প্রকাশ্যেই ঝাঁঝালো বক্রোক্তি করলেন। টাকার দেমাকে কর্মকার নাকি হাতে করে আগুন ধরার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক সংবাদই কানে এলো এরপর। কর্মকার দেশের প্রখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিতদের অনুমোদন সংগ্রহ করেছেন। ব্যবস্থা-পত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ মহাপণ্ডিতবর্গ।

সমাজের বাতাস একটু ঘোরাল হয়ে উঠল এইবার। বাবার মুখের দিকে চেয়ে ইন্দ্র বিশ্বাসের হাসিই পেয়েছিল। তখনো নিজেদের বাড়িতে কনকদামিনীর অবস্থান প্রায় অগোচর তাঁর। সমাজে এ রকম একটা প্রশ্ন উঠেছে বলেই যেটুকু কৌতূহল তাঁর। তর্কের লোকের অভাব ঘটলে শম্ভুনারায়ণ কৃষ্ণকুমারকেই ধরে বসান। তাঁদের মত ইংরেজি লেখা-পড়া জানা হোমরাচোমরা নব্যপন্থীরা এ সম্পর্কে কি বলেন, শুনতে চান।

সুচতুর কৃষ্ণকুমার অম্লান বদনে তাঁর কথায় সায় দেন, মতে মত দেন। শম্ভুনারায়ণ খুশি হন। কৃষ্ণকুমার ওপরে পালিয়ে

এসে হাসেন, বলেন, বিধবা বিয়ে নিয়ে এ এক আচ্ছা ক্যাসাদ হল।

ইন্দ্র বিশ্বাস একদিন ঠাট্টা করলেন, তুমি বাবাকে বলে দাও না কেন, বিধবা বিয়ে নিয়ে ইণ্টারেস্ট নেই, সধবা বিয়ের আন্দোলন উঠলে ভাবা যেত—

কৃষ্ণকুমার তক্ষুনি পাল্টা জবাব দেয়, তোমার মত লোকের সংখ্যা বাড়লে সে-রকম আন্দোলন হওয়াও বিচিত্র নয়।

যাই হোক, ওই কর্মকারের ব্যাপারটা নিয়েই অচিরে উত্তেজনা আর একপ্রস্থ চড়ল। শোনা গেল রাজা রাধাকান্ত দেবের ভবনে পণ্ডিতদের বিচারসভা বসবে। বিদেশ থেকে পণ্ডিত আসবেন। সেই বিতর্ক-সভায় কর্মকারের উক্ত ব্যবস্থা-পত্রের বিচার হবে।

যথা দিনে বিচার হয়ে গেল। ইন্দ্র বিশ্বাসের ধারণা শম্ভুনারায়ণও সেই বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তার ইতিবৃত্ত পরে শুনলেও বিচারের ফলাফল বাবার মুখ দেখেই তিনি অনুমান করেছিলেন। পরে শোনা গেছে, ওই ব্যবস্থাপত্রেরই জয় হয়েছে, তর্কে জিতে কোন নামজাদা পণ্ডিত নাকি জোড়া শাল পুরস্কার লাভ করেছেন।

কিন্তু কিছুকাল না যেতেই বাবাকে আবার হাসিখুশি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উদ্ভাসিত হতে দেখেছেন তিনি। কর্মকারের সঙ্কল্পে ছাই পড়েছে। বিধবা মেয়ের বিয়ে বারো হাত জলের তলায়। তর্ক সভায় বিদ্যাবুদ্ধির চমক দেখানো আর আসলে কাজে কোমর বেঁধে নামার মধ্যে অনেক তফাত। সায় যাঁরা দিয়েছিলেন, বিধবা বিয়ের নামে সেই পণ্ডিতেরাই এখন বেঁকে বসেছেন—তাঁরাই এখন বিধবা বিয়ের বিষম বিদ্বেষী।

এই ব্যাপারে ইন্দ্র বিশ্বাসের এতদিন পর্যন্ত সমর্থনও ছিল না, অনুমোদনও ছিল না। এর ভালোমন্দ সম্পর্কে তিনি একরকম উদাসীনই ছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা শোনার পর তিনি পণ্ডিতদের প্রতি বিরক্তই হলেন। বালিকা মেয়ের বৈধব্য যাতনায় কাতর

হয়ে যিনি বিধানদাতাদের আশ্বাস নিয়ে এতটা এগিয়েছিলেন, তার প্রতি সমাজের এটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। মেয়েটাও হয়ত মনে মনে আশা করেছিল তার বিরূপ ভাগ্য এবারে ফিরবে। শম্ভুনারায়ণ জানলেন না যে কারণে তিনি খুশি সেই কারণটাই ছেলেকে তাঁর মতের বিরুদ্ধে একধাপ এগিয়ে দিল।

দিন গেছে। হঠাৎ একদিন ইন্দ্র বিশ্বাস নিজের সংসার বেষ্টনীর মধ্য থেকেই কনকদামিনীকে আবিষ্কার করলেন। দিনে দিনে নানা তুচ্ছ কর্ম নিবিষ্টতার মধ্য দিয়ে ভাগ্য বঞ্চিতা এই রমণীর আবিষ্কারটুকু মাধুর্যের ছোঁয়ায় পুষ্ট হতে লাগল। কিন্তু সেও ইন্দ্র বিশ্বাসের প্রায় নিজেরই অগোচরে। কনকদামিনী প্রায় অস্তিত্বশূন্য, কিন্তু তার বিরামহীন কাজের শ্রীটুকু যেন সমস্ত সংসারটিকে ছুঁয়ে আছে। লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে। ইন্দ্র বিশ্বাস নিজের অজ্ঞাতেই লক্ষ্য করছেন। এই নির্লিপ্ত নিষ্ঠা অন্তরের বস্তু—টাকা দিয়ে বা আশ্রয় দিয়ে কেনা যায় না, এ কেমন করে যেন ইন্দ্র বিশ্বাস উপলব্ধি করতে লাগলেন।

কিন্তু তখনো কনকদামিনীকে বিধবা-বিবাহের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ইন্দ্র বিশ্বাসের মনের কোণেও উদয় হয় নি। কনকদামিনী বালিকা নয়, হেমনলিনীর হিসাব ঠিক হলে বড় জোর ইন্দ্র বিশ্বাসের থেকে মাত্র বছর তিনেকের ছোট। বাইশ বছরের মেয়ের সমস্যা নিয়ে তখন সেদিনের উদারচেতা সমাজ-বিপ্লবীরাও মাথা ঘামান না। ইন্দ্র বিশ্বাসও ভাবেন নি।

অথচ ঠিক এই সময়টিতেই রক্ষণশীল সমাজের বুকে অকস্মাৎ যেন বজ্রপাত হল একটা। দুর্দৈব কিছু নয়, কিন্তু দুর্দৈবের থেকেও ভয়ঙ্কর ভাবল সকলে।

একখানা বই বেরিয়েছে।

এই বইয়ের সম্বন্ধে কানাঘুষা কিছুদিন আগেই ইন্দ্র বিশ্বাসের কানে এসেছিল। মহীয়সী এক রমণী একটি সদ্য বিধবা বালিকার পোড়া কপালের কথা ভেবে কপালে করাঘাত করে কেঁদে নিজের

সন্তানকেই ভৎসনা করেছিলেন, তুই এত শাস্ত্র পড়লি, বিধবাদের কোনো উপায় খুঁজে পেলি না!

বুক ভরা ব্যথা আর দরদ নিয়েই সেই সন্তান উপায় খুঁজেছেন। উপায় পেয়েছেন।

তিনি বিদ্যাসাগর। আর সেই উপায় তাঁরই রচিত বিধবা-বিবাহের বই।

নিজের বাপের দিকে চেয়ে এবারে মনে মনে হেসেছিলেন তিনি, কৌতুক অনুভব করেছিলেন। এবারে যিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁর সঙ্গে এঁটে ওঠা বড় সহজ ব্যাপার নয় তিনি জানেন। ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে না এলেও এই একজনের প্রতি ইন্দ্র বিশ্বাসের অপরিসীম শ্রদ্ধা। রচয়িতা বিদ্যাসাগর বলেই তিনি একখানি বই কিনতে চেষ্টা করলেন। ভদ্রলোক কি যুক্তি জাল বিস্তার করেছেন, পড়ে দেখবেন।

কিন্তু বই কিনতে গিয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস অবাক। দোকানে এক কপিও বই নেই, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই দু'হাজার কপি বই বিক্রি হয়ে গেছে। কিছু দিনের মধ্যেই আরো তিন হাজার কপি তারপর আরো দশ হাজার কপি বই ছাপা হল।

ইন্দ্র বিশ্বাস একখানা বই কিনে আনলেন। সে-বই দেখে কৃষ্ণকুমার ঠাট্টা করলেন, এ আবার তোমার কি কাজে লাগবে, কোনো মতলব আছে নাকি?

ইন্দ্র বিশ্বাস তক্ষুনি জবাব দিয়েছেন, আমার কাজে লাগবে না, তোমার লাগতে পারে···মানুষের পরমায়ুর কি কিছু ঠিক আছে।

ঘরে হেমনলিনী ছিলেন। উক্তিটা প্রথমে বোধগম্য হয় নি তাঁর।

ইন্দ্র বিশ্বাস হা-হা করে হেসে উঠতে বুঝলেন। সম্ভব হলে বইটা কেড়ে নিয়ে তখুনি তিনি আগুনে দিতেন। গম্ভীর মুখে বললেন, এ বই আনার কি দরকার ছিল, ঠাকুর দেখলে কি বলবেন।

বইটার কথা অসূর্যম্পশ্যা মেয়েরাও জানে। তখন চার দিকে সাড়া পড়ে গেছে। বৃহত্তর সমাজ দেশাচারের অনুগত। কুৎসা আর গালাগালি ক্রমশ একটা আন্দোলনের আকার নিচ্ছে।

ইন্দ্র বিশ্বাস নিরাসক্ত বিশ্লেষণের দৃষ্টি নিয়ে বইখানা পড়লেন। পড়ে ভালো লাগল তাঁর। অনেকক্ষেত্রে অন্তর স্পর্শ করল। বিধবাদের দুরদৃষ্টের কথা এ-রকম করে কখনো ভাবেন নি তিনি। বিদ্যাসাগরের যুক্তিজালও অমোঘ মনে হল তাঁর। কৌতুকের লোভ সামলাতে পারলেন না তিনি, বইটা বাবার ঘরে তাঁর চোখের ওপরেই রেখে এলেন।

বইয়ের সমাচার শম্ভুনারায়ণের জানা ছিল। ঘৃণায় বিদ্বেষে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে যাঁরা অগ্নি উদগিরণ করেছেন তিনি তাঁদেরই একজন। ছেলের এই আচরণ থেকে তিনি এটুকুই বুঝে নিলেন ছেলে তাঁর বিধবা বিয়ের স্বপক্ষে। বহুগুণ গুম হয়ে বসে থেকে শেষ পর্যন্ত রাগ সামলাতে পারলেন না। হাঁক ডাক করে মা-লক্ষ্মীকে ডাকলেন। বইটা দেখিয়ে গুণধর ছেলের মতি-গতির কথা বললেন। শেষে তাঁর সামনেই বইটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লেন।

হেমনলিনী ভয়ে কাঠ।

ওদিকে প্রতিদিন নিত্য নতুন সংবাদ আসছে। বিতর্ক যুদ্ধে নেমেছেন বিদ্যাসাগর। কোনো গালিগালাজ কোনো সতর্ক বাণী তাঁর কানে ঢোকার নয়। তর্ক যুদ্ধে আজ ওখানে জিতলেন বিদ্যাসাগর, কাল সেখানে তাঁর সহায় মনীষী রাজনারায়ণ বসু—সোনায় সোহাগা। শোনা যাচ্ছে গ্র্যাণ্ড সাহেবও বিদ্যাসাগরের মতে মত দিয়েছেন। শম্ভুনারায়ণ যত তেতে ওঠেন ইন্দ্র বিশ্বাস ততো কৌতুক অনুভব করেন। বৃদ্ধ ছেলের বদলে কৃষ্ণকুমারকে নিয়ে পড়েন, কিন্তু কৃষ্ণকুমার তাঁর কাছে সবিনয়ে হার মেনেই আছেন।

বছর না ঘুরতে বিধবা বিয়ের আইন পাস হয়ে গেল।

দ্বিগুণ হল বিপক্ষ গোষ্ঠীর চিৎকার চেঁচামেচি কটূক্তি অগ্নিবর্ষণ।

শুধু তাই নয়, জায়গায় জায়গায় এই নিয়ে বিদ্রূপাত্মক ছড়া পাঁচালি বাঁধা হতে লাগল, গান বাঁধা হতে লাগল। সর্বত্র এই সব অনুকূল এবং প্রতিকূল গানের ছড়াছড়ি। শান্তিপুরের তন্তুবায়রা আবার কাপড়ের পাড়ে ওই গান ঝাঁপে তুলে ফেলল।

বেশি টাকা খরচা করে এই একখানা কাপড় সংগ্রহ করলেন শম্ভুনারায়ণ। ছেলে তাঁকে বই দিয়ে গিয়েছিল সেই রাগ ভোলেন নি। জবাবে তিনিও একটা স্থূল রসিকতার জন্যেই প্রস্তুত হলেন।

কৃষ্ণকুমার আসতে কাপড়খানা খুলে দেখালেন তাঁকে। বললেন, বাড়ির পুরনো ঝি'টা অনেক দিন ধরে একটা ভালো কাপড়ের বায়না করছিল···তাই কিনলাম। কিন্তু এ-সব দেওয়া থোয়ার ব্যাপারে আমরা বুড়োবুড়ী আর কতকাল থাকব, বাড়ির যে ভবিষ্যৎ কর্তা তারই এখন থেকে এসব দেখা উচিত—এটা নারায়ণের হাতে দিয়ে দিও।

কাপড়ের দু'দিকের ঝাঁপে তোলা সেই গান দেখে কৃষ্ণকুমারেরও হয়ত কান লাল হয়েছিল। হাটে মাঠে এই গান শুনে কান 'ঝালাপালা।

···বিধবাদের হবে বিয়ে।
একাদশী উপসের জ্বালা কর্ণেতে লাগিত তালা,
ঘুচে যাবে সে সব জ্বালা, জুড়াবে জীবন,
দু'জনাতে পালঙ্কেতে করিব শয়ন—
বিনাইয়া বাঁধব খোঁপা গুজিকাটি মাথায় দিয়ে।
···বিধবাদের হবে বিয়ে।
যেদিন হতে মহাপ্রসাদ, শুনেছি ভাই এ সংবাদ,
সেদিন হ'তে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম—
পছন্দ করেছি বর, না হ'তে হুকুম,
ঠাকুরপোরে ক'রব বিয়ে, ঠাকুরঝিরে ব'লে ক'য়ে।'

যে পুরনো বিধবা ঝিয়ের নাম ক'রে এই কাপড় কেনা তার

বয়েস ষাটের ওপরে—চোখে ভালো দেখে না, কানে ভালো শোনে না—পুরনো মনিবের দয়ার আশ্রয়ে আছে, এই পর্যন্ত।

কাপড়টা অবশ্য তার হাতে পৌঁছয় নি, পৌঁছুবার কথাও নয়। কৃষ্ণকুমারের কাছ থেকে কাপড়টা নিয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস সকৌতুকে নেড়েচেড়ে দেখেছেন। ওটার প্রয়োজন ওখানেই শেষ। মৃদু হেসে টিপ্পনী কেটেছেন, বাবার একটি ভালো গোমস্তা লাভ হয়েছে দেখছি—ভবিষ্যৎ কর্তা শুধু ঝি'কে দিলে এক চোখোমি হবে, ঝি চাকর গোমস্তা সকলের জন্যেই ভাবা উচিত। দেখি কি করতে পারি···

বিরুদ্ধ বাদীদের তবু একটু আশ্বাস ছিল, বই বেরুক বা আইন পাশ হোক, বিধবা বিয়ে তো একটাও হয় নি। কিন্তু তাদের এই সান্ত্বনাও বেশি দিন থাকল না। বেশ জোরালো বিয়ের ঘোষণা শোনা গেল একটা। খুব সমারোহে একটা বিধবার বিয়ে হতে চলেছে রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্জের বাড়িতে। বর হল সম্ভ্রান্ত পয়সাঅলা নামী কথক রামধন তর্কবাগীশের ছেলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ছেলে নিজেও সংস্কৃত কলেজের তরুণ অধ্যাপক। আর মেয়ে ব্রহ্মানন্দ মুখুজ্জের দশ বছরের মেয়ে কালীমতী।

অনেক বাধার সৃষ্টি হল, অনেক শত্রুতার চেষ্টা হল, বিয়ে বাড়ির চারদিকে পুলিস্ মোতায়েন হল। বিয়ে হয়ে গেল। বিরুদ্ধবাদীরা স্তব্ধ। জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেম তর্ক-বাগীশ, তারানাথ তর্ক বাচস্পতি, পণ্ডিত হরিনাথ বাঁড়ুজ্জে, নীলকমল বাঁড়ুজ্জে, রাম গোপাল ঘোষের মত দিকপালরাও যদি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ব্রহ্মানন্দ মুখুজ্জের বিধবা মেয়ের বিয়ে দেয়—তাদের আর বলার আছে কি। শম্ভুনারায়ণ এতদিন শুধু ইংরেজিনবীশ নব্যদের ওপরেই হাড়ে চটা ছিলেন, এবার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ওপরেও বীতশ্রদ্ধ হলেন।

সেই বছরেই পর পর আরো তিনটি বিধবার বিয়ে হয়ে গেল। প্রত্যেক বারই শম্ভুনারায়ণ জ্বলে জ্বলে ওঠেন, আর ভাবেন ছেলে তার ঘরে বসে মুখ টিপে হাসছে। মজা দেখছে

এদিকে ক্ষোভের মাত্রা আরো বেড়েছে কারণ ইন্দ্র বিশ্বাসের দ্বিতীয় সন্তানটিও মেয়ে। গ্রাম্য বৃদ্ধ বা বৃদ্ধারা এরকম স্থলে সাধারাণত বউয়ের উপরেই বিরূপ হয়, যেন তারই দোষ। কিন্তু এ-সংসারের বৃদ্ধটির দাপটে বউয়ের দোষ ধরার কেউ নেই। শম্ভুনারায়ণের মনের ইচ্ছা প্রায় বিশ্বাসে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবারে ছেলে হবে। ছেলে হলে নিজের ছেলের সম্পর্কে তিনি একটা সুপরিকল্পিত মনোভাব অবলম্বন করবেন। কিন্তু এবারেও মেয়ে। শ্বশুরের আশা হেমনলিনীর অগোচর ছিল না, তাই তিনি একটু সঙ্কোচের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু এর জের স্বামীর ঘাড়ে এসে পড়তে তিনি স্বস্তি বোধ করলেন। ঠাকুরের ঠেস ঠিসারার লক্ষ্যস্থল আর একজন। আজকালকার আয়েসী ছেলে ছোকরাদের সম্পর্কেই আশাহত তিনি—দেশটাই নাকি শিগগীরই মেয়েয় ছেয়ে যাবে। বিধবা বিয়ে নিয়ে তখন আর ভাবতে হবে না কোনো ব্যাটাকে. কুমারী বিয়ে দিতেই হিমসিম খেতে হবে সব। মনে মনে শম্ভুনারায়ণের এমন ধারণা পোষণ করাও বিচিত্র নয় যে, তাঁর নাতির আকাঙ্ক্ষাও ছেলে জানত,—জানত বলেই ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়েছে। আর এই আশাভঙ্গের দরুনও ছেলে মনে মনে হাসছে। মজা দেখছে।

পরের ছ'মাসের মধ্যে সব-রকম কৌতুককর রেষারেষিতেই ছেদ পড়ল। বাড়ির কর্ত্রীটি চোখ বুজলেন। শম্ভুনারায়াণ বিপত্নীক হলেন।

এতকাল বেঁচে থেকে ওই বৃদ্ধাটি যত না মর্যাদা পেয়েছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার চতুর্গুণ পেলেন। ইন্দ্র বিশ্বাস মায়ের কাজ করলেন। এই কাজের ধকল বড় কম নয়, কারণ, শাস্ত্রকার আর পুরোহিতরা বৃদ্ধ কর্তার অভিলাষ মতই বিধি-নিষেধ ক্রিয়া-কলাপের বহু ফিরিস্তি দিয়ে কাজটুকু বেশ আয়াসসাধ্য করে তুলেছিলেন। ছেলে কোনো ব্যাপারে বেঁকে দাঁড়ায় কিনা বা আপত্তি করে কি না তাই দেখতে চেয়েছিলেন হয়ত তিনি।

কিন্তু পছন্দ হোক বা না হোক, বিশ্বাস করুন বা না করুন, সব আচার আচরণ মুখ বুজেই পালন করেছেন ইন্দ্র বিশ্বাস। তবু তার পর থেকেই বাড়ির হাওয়া বদলালো। বদলাতে থাকল।

গৃহিণী চোখ বোজার পর শ্বশুরের প্রতি পুত্রবধূর অন্ধ আনুগত্যের ধারা আরো স্বতঃস্ফূর্ত হতে লাগল [illegible]। না হয়ে উপায় নেই। ইন্দ্র বিশ্বাসের মায়ের বড়-রকমের কিছু অস্তিত্ব ছিল না এই সংসারে। কিন্তু তাঁকে হারিয়ে বাবা আরো অসহায় ছেলেমানুষের মত করতে লাগলেন। তখন পুত্রবধূ ছাড়া একেবারে অচল তিনি। কোন-কিছু উপলক্ষ উপস্থিত হলেই তিনি বউমাকে ডেকে বলেন, তোমার শাশুড়ী-মা বেঁচে থাকলে এই এই করতেন—এখন তুমি কি করবে ভেবে দেখো মা-লক্ষ্মী।

মা-লক্ষ্মী শাশুড়ীর ধারা রক্ষার জন্য যত না হোক, বৃদ্ধ শ্বশুরের তুষ্টি বিধানের জন্য তার দ্বিগুণের কম করেন না। শ্বশুর আনন্দে বিগলিত। হেমনলিনীও খুশি। কিন্তু সেই খুশির ভাব স্বামীর কাছে চেপে রাখতে হত।

কনকদামিনীর সুচারু কাজের ধারা ইন্দ্র বিশ্বাস বিশেষ করে লক্ষ্য করেছেন মায়ের কাজের সময়। তিনি শুধু ভালো রাঁধেন তাই নয়, সবদিক দেখে শুনে বুঝে শান্ত মুখে কাজ করে যান। তার সকল কাজের এই আত্মনির্ভর শ্রীটুকুই চোখে পড়ার মত। বাড়ির গৃহিণী চোখ বোজার পর সংসারের অনেক দায়িত্ব আপনা থেকেই তাঁর হাতে এসে গেল। হেমনলিনী শ্বশুরের আব্দার আর ফাই-ফরমাশ শুনেই এক মুহূর্ত সময় পান না, কখন কোন্‌দিক সামলাবেন তিনি? তাই তিনি বামুনদির প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর ওপর নির্ভরও খুব, বামুনদিদি একা হাতে যা পারেন, পাঁচজন একত্র হয়েও তা পারে না। এ-কথা সকলের কাছেই এক বাক্যে স্বীকার করেন তিনি। সংসারের ব্যাপারেও অনেক পরামর্শ তিনি বামুনদির কাছ থেকে নিয়ে থাকেন।

সংসারের কর্তৃত্বের একটা বড় দিক কনকদামিনীর হাতে চলে

যেতে তাঁর সঙ্গে ইন্দ্র বিশ্বাসের দেখা-সাক্ষাৎটা ক্রমশ সহজ হয়ে এসেছিল। কিন্তু তাঁর মুখ বড় দেখা যেত না, সামনা-সামনি পড়লে সর্বদাই বড় ঘোমটা টেনে দিতেন। শুধু হেমনলিনী নয়, তাঁর প্রতি বাড়ির অনেকেই সশ্রদ্ধ নির্ভরশীলতাটুকু ইন্দ্র বিশ্বাস লক্ষ্য করতেন। অনেক দিন তাঁর মেয়ে দুটির প্রতিও কনকদামিনীর সযত্ন তত্ত্বাবধান লক্ষ্য করতেন। আর সব থেকে বেশি অনুভব করতেন তাঁর প্রতি এক অদৃশ্যবর্তিনীর যত্ন। কখনো শরীর খারাপ হলে হেমনলিনী হয়ত হঠাৎই এসে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমার শরীরটা ভালো নেই নাকি?

কে বলল? ইন্দ্র বিশ্বাস বিস্মিতই হয়েছেন একটু।

বামুনদি বললেন, তোমার শরীরটা হয়তো ভালো নেই, খোঁজ নিতে বলছিলেন। শুকনোই তো দেখাচ্ছে…

না কিছু হয় নি। ভালই আছি। কি এক অজ্ঞাত আবেগের মুখ তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস বইয়ে মন দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রতি যাঁর সব থেকে বেশি চোখ থাকার কথা, তিনি অপরের কাছে শুনে অসুস্থতার খোঁজ নিতে আসেন—নিঃসঙ্গতার এই অনুভূতিটাই হয়ত পরিহার করতে চেষ্টা করেন তিনি।

শুধু তাঁর বেলাতেই নয়, তাঁর মেয়ে দুটির অসুখ বিসুখের ব্যাপারেও অনাত্মীয় নিঃস্ব রমণীটির এই নিঃশব্দ স্নেহের ধারা-বর্ষণ দেখেছেন তিনি। সমস্ত দিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তির পর স্ত্রী মেয়েদের পাশে শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। বেশি রাতে ইন্দ্র বিশ্বাস খবর নিতে গিয়ে দেখেন, রুগ্না মেয়ের শিয়রের কাছে কমনীয় পাথরের মূর্তির মত কনকদামিনী বসে। মাথায় জলপটি দিচ্ছেন, নয়তো হাত পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করছেন। ওষুধ কখন কি দিতে হবে তাও তাঁর জানা।

না, ভালো করে ওই কালো মুখখানি এখনো বুঝি দেখা হয় নি ইন্দ্র বিশ্বাসের। তাঁর সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে

আধ হাত ঘোমটা টেনে দিয়েছেন। মেয়ে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলে শুধু মাথা নেড়েছেন। অর্থাৎ ভাবনার কিছু নেই।

সামাজিক আবহাওয়া তখনো বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে সরগরম। এখনো রক্ষণশীল সমাজের অনেক ভ্রূকুটি অনেক শত্রুতা অনেক ঝড় ঝাপটা সইতে হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র লোকটিকে। আবার বহু গণ্যমান্য মনীষীগণ তাঁর সঙ্গে হাতও মেলাচ্ছেন, তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। শম্ভুনারায়ণের মনোভাব যাই হোক, কাজটা ভালো হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে তা নিয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস সত্যই একাগ্র অনুভূতি দিয়ে তলিয়ে ভাবেন নি কখনো।

কিন্তু এই কনকদামিনীর কথা ভেবেই তাঁর প্রথম মনে হয়েছে বড় ভালো কাজ করেছেন ভদ্রলোক। করছেন। দরদী মানুষ মাত্রেই তাঁকে সমর্থন করা উচিত। কনকদামিনীর বয়েস চব্বিশের বেশি ছাড়া কম নয় এখন। তবু তাঁর মনে হয়েছে, কনকদামিনীরও একটি যোগ্য ঘঁর আর যোগ্য মানুষ মেলা উচিত।

এই একটি ভাগ্যহত রমণীর জীবনের সার্থকতার কথা ভাবতে ভালো লেগেছে তাঁর।

খেয়ালী মানুষ, অনেক রকমের খেয়ালই তাঁর মাথায় এসেছে।

দাবা খেলতে বসে হঠাৎ একদিন কৃষ্ণকুমারের কাছে কনকদামিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। এই রমণীটির সুখ্যাতি হেমনলিনীর মুখেও শুনেছেন কৃষ্ণকুমার। নিজেও তাঁকে অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছেন। স্বার্থশূন্য কর্মনিবিষ্টতার মাধুর্য আপনা থেকেই লোকের চোখে পড়ে বোধহয়, কাউকে বলে দিতে হয় না। কিন্তু ইন্দ্র বিশ্বাসের মুখে এরকম প্রশংসা শুনে ঈষৎ বিস্মিত তিনি।

বিধবা-বিবাহের আলোচনার ছুতো ধরেই কথাটা উঠেছিল। কচি কচি মেয়েগুলোর আবার বিয়ে দেওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণকুমার খুব দ্বিমত নন। ইন্দ্র বিশ্বাস বিরক্ত মুখে বলেছেন, বোকার মত কথা বোলো না, কচি মেয়েরা বিয়ের কিছু

বোঝে না, কচি মেয়েদের বিয়েটা বয়েসকালের কথা ভেবেই হওয়া দরকার।

আর তখনি কনকদামিনীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি। তাঁর মত একটি মেয়ে পরের দয়ার আশ্রয়ে জীবন কাটিয়ে দেবেন, ভবিতব্যের এর থেকে বড় নিষ্ঠুরতার কথা বোধহয় ভাবা যায় না। কারণ বঞ্চিত শুধু তিনিই নয়, তাঁর মত মেয়েকে যে সংসার পেল না দুর্ভাগ্য সেই সংসারেরও কম নয়। এই প্রসঙ্গেই কনকদামিনীর গুণকীর্তন শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু এর পিছনে তাঁর কিছু উদ্দেশ্য ছিল। একটা খেয়ালী মতলব তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল।

ভিতরে ভিতরে এরপর একটা উদ্ভট সুযোগের প্রত্যাশায় ছিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস। কোনো একটা ব্যাপারে জোরালো রকমের বাজী ধরে কৃষ্ণকুমারকে হারাতে পারলে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতই একটা শর্ত করবেন তিনি। অত জাত বিচারের ধার ধারেন না—তাছাড়া বিধবা বিয়ের আবার অত জাতের বাছাবাছি কি। যোগ্য হাতে পড়া নিয়ে কথা। কৃষ্ণকুমার তখনো বিয়ে করেন নি। কেন করেন নি সে-সম্বন্ধে ইন্দ্র বিশ্বাসের মনে একটা ধারণা পুষ্ট। এ নিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে আজ পর্যন্ত ঠাট্টা বিদ্রূপও কম করেন নি তিনি। হেমনলিনীও এ-যাবৎ বহুবার বিয়ের তাগিদ দিয়েছেন। তবু ইন্দ্র বিশ্বাসের কেমন ধারণা, বিয়ে করছেন না বলে স্ত্রীটি তাঁর সত্যিই মনে মনে অখুশি নন। কৃষ্ণকুমারের ওপর তাঁর যেমন দাপট তেমনি প্রতিপত্তি।

মনে মনে অনেক সময় বিস্মিত হয়েছেন ইন্দ্র বিশ্বাস, আর এই এক ব্যাপারে চৌকস বন্ধুটিকে তিনি নির্বোধ ভেবেছেন। বাজীর মত একটা বাজীতে হারাতে পারলে আখেরে বন্ধুটির উপকার বই অপকার হবে না—এরকমই বিশ্বাস তাঁর। তবে শর্ত শুনলে প্রথমে সকলেই যে আঁতকে উঠবে সন্দেহ নেই।

…কিন্তু কৃষ্ণকুমারকে জুতসই রকমের বাজী হারানোর সুযোগ জীবনে তিনি কমই পেয়েছেন।

তা'ছাড়া খেয়ালের ঝোঁকে আর একজনের সম্মতির কথা তাঁর মনেই হয় নি। বাজী জিতলেও আর যাঁর সম্মতি দরকার। কমনীয় কালো মূর্তিটি চোখের সামনে ভাসতে এই সম্মতিটুকুও কেন যেন আদৌ সহজলভ্য মনে হল না।

একদিন। রাত বেশি হয় নি তখনো। ইন্দ্র বিশ্বাস ঘরে ছিলেন। বইয়ের আলমারি খুলে বই বাছছিলেন। বাইরে থেকে কেউ ঘরে ঢুকলে তাঁকে দেখা যাবার কথা নয়, মস্ত আলমারির আধখানা পাটে আড়াল পড়েছে। ইন্দ্র বিশ্বাস দেখলেন, কনকদামিনী ঘরে ঢুকেছেন। মাথায় ঘোমটা নেই, খোলা চুল হাঁটু ছুঁয়েছে। তিনি ঘরে আছেন কল্পনাও করেন নি। বস্তুত তিনি পায়ে হেঁটে বেরিয়েছিলেন, টিপটিপ বৃষ্টি পড়তে সকলের অলক্ষ্যে ফিরেও এসেছেন। আলমারির পাটও এমন অনেক সময়ই খোলা থাকে।

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কনকদামিনী দুই কোমরে হাত দিয়ে ঘরের অবস্থাটা দেখে নিলেন একবার। টুকিটাকি এটা-ওটা জায়গামত রাখলেন। খাবার জায়গাটায় জলের ছিটে দিয়ে সযত্নে মুছলেন। তার পর আসন পেতে জলের গ্লাসটা ঢেকে রাখলেন। উঠে যেতে গিয়ে দেখলেন, অদূরে চপ্পলজোড়ার দুটো দুদিকে পড়ে আছে। হাতে করে কুড়িয়ে নিয়ে একজায়গায় রাখতে গিয়ে হয়তো বর্ষার কাদার ছিটে চোখে পড়ল।

আল্‌নার কাছে এসে ব্রাশটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে আল্‌মারির আধ-পাটের ওধারে মানুষটার দিকে চোখ পড়ল তাঁর। বই হাতে নিঃশব্দে তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন, তাঁকেই দেখছেন।

কনকদামিনী হতভম্ব কয়েক-মুহূর্ত। তাঁর একহাতে চপ্পলজোড়া অন্যহাতে ব্রাশ। আচমকা দিশা ফিরে পেয়ে জুতো-ব্রাশ ফেলে মাথায় ঘোমটা তুলে দিতে দিতে চকিত হরিণীর মতই দরজার দিকে ছুটলেন। যৌবন-প্রাচুর্যময়ীর এই পলায়ন-পরা দৃশ্যও দুচোখ ভরে দেখার মত।

শোনো—

দরজার কাছে গতি শিথিল হল একটু। তবু বেরিয়েই গেলেন। কয়েক মুহূর্ত বাদে আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মাথায় এক হাত ঘোমটা, হুকুমের প্রতীক্ষা।

এদিকে এসো।

দ্বিধান্বিত পায়ে ঘরের মধ্যে খানিকটা এগিয়ে এলেন।

ইন্দ্র বিশ্বাস শয্যায় বসলেন।—তোমার সঙ্গে কথা আছে। অত বড় ঘোমটা দাও কেন, মুখ না দেখতে পেলে আমার কথা কইতে অসুবিধে হয়।

রমণী নিস্পন্দ কয়েক মুহূর্ত। একটা হাত একটু নড়ল। তার পর আস্তে আস্তে সেটা মাথার পিছনে উঠল। ঘোমটা ছোট হল। মুখ দেখা গেল।

ইন্দ্র বিশ্বাস কি বলবেন ভাল করে জানেন না। একে দাঁড় করিয়ে রেখে বক্তব্য স্থির করার চেষ্টাই বিড়ম্বনা বিশেষ। বললেন, এখন বিধবা বিয়ের সাড়া পড়ে গেছে···যাদের বিবেচনা আছে তারা এটা খারাপ মনে করে না। আমিও করি না। আমার চেনা-জানা অনেকে আছে, আমি বললে হয়তো এগিয়ে আসবে। তোমার অমত না থাকলে আমি প্রস্তাব করতে পারি। এভাবে সমস্ত জীবন কাটানো কোনো কাজের কথা নয়।

কনকদামিনী আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালেন একবার। একটু আগে রমণীর শ্যাম-মাধুর্য দেখেছিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস, এবারে আয়ত দুই চোখের গভীরে স্থির দামিনী দেখলেন। দেখে হঠাৎ যেন অভিভূত তিনি। কনকদামিনী মাথা নামিয়ে নিলেন। জবাব দিলেন না।

তোমার মত কি বল—চেষ্টা করব ?

মাথা নাড়লেন। নিষেধ জানালেন। নিষেধের এই অভিব্যক্তিতে জড়তা নেই।

কথা ফুরিয়ে গেল। ইন্দ্র বিশ্বাস নিজের অগোচরে চেয়ে আছেন। দেখছেন।

কনকদামিনী আবারও মুখ তুললেন। আয়ত পক্ষ্মরেখা দুই ভুরু ছুঁয়ে গেল বুঝি। কয়েক পলকের দৃষ্টি বিনিময়। আস্তে আস্তে আল্‌নার.কাছে গিয়ে চপ্পল জোড়া ব্রাশে মুছে জুতো-ব্রাশ গুছিয়ে রাখলেন কনকদামিনী। তার পর ধীর মন্থর পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বর্ষার অন্ধকারে আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। ইন্দ্র বিশ্বাসের মনে হল কালো কনকদামিনীও অনেকটা ওই রকম।

সব ক্লান্তির বোঝা ঝেড়ে ফেলে ইন্দ্র বিশ্বাস হঠাৎ একদিন অটুট সঙ্কল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ঘোষণা শুনে স্ত্রী ছেড়ে বাবাও বিমূঢ় হঠাৎ। তিনি আইন পড়তে বিলেত যাবেন। এখানে তখন হাইকোর্টের ভিত্তি স্থাপন হয়ে গেছে। ইন্দ্র বিশ্বাসের আগ্রহ তাই আরো অদম্য।

এবারে শুধু একটি পরিবারের রক্ষণশীলতার ভিত নাড়া খেল।

বিলেত-ফেরত ছেলের সাহেবিয়ানার ফাটল-ধরা বংশের এতকালের ঐতিহ্যের বিলীয়মান চিত্রটি দেখলেন শম্ভুনারায়ণ বিশ্বাস। ছেলেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন, পরোক্ষে ভয়ও দেখালেন। শ্বশুরের মুখপাত্র হয়ে হেমনলিনীও আপত্তি জানালেন। শ্বশুর তাঁকে ভবিষ্যতের দুর্যোগের সম্পর্কে ভালোভাবেই সচেতন করে দিয়েছিলেন।

কারো অনুরোধ ভ্রূকুটি বা চোখের জলেই কোন কাজ হল না। যাত্রার দিন এগিয়ে এলো। ইতিমধ্যে কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে বাজী ধরে কোনোদিন দাবাও খেলতে বসেন নি ইন্দ্র বিশ্বাস। তাঁকে বিশ্বাস করেন না। বাবা আর হেমনলিনী তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। দাবা খেলায় অরুচি দেখে কৃষ্ণ-কুমার হেসেছেন। বলেছেন, মানুষ যখন সর্বদা নিজের মধ্যে একটা বিরাট মানুষকে কল্পনা করে তখন সেটা রোগে দাঁড়ায়। বিলেত থেকে ফিরেও যখন দেখবে যা ছিলে তাই আছ, তখন হয়ত

মনে হবে চাঁদে না গেলে চলছে না। মিছিমিছি এতগুলো লোককে ভোগাচ্ছ কেন ?

ইন্দ্র বিশ্বাস রাগ করে জবাব দিয়েছেন, তার থেকে কৃষ্ণময় জগৎ দেখা ভালো, কি বলো ?

হেমনলিনীর কাতর মুখ দেখে তাঁর কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ঐ দুর্বল সমর্পণ ইন্দ্র বিশ্বাস চান নি। চান না। ইচ্ছে করলে একমাত্র হেমনলিনীই তাঁর উপর সম্পূর্ণ দখল নিতে পারতেন, তাঁকে বাঁধতে জানলে বাঁধতে পারতেন। কিন্তু ইন্দ্র বিশ্বাস তাকেও দুঃখ দিতে চাইলেন না—মুখে যা এসেছিল তা বললেন না। বললেন, কেন মিথ্যে মন খারাপ করছ, ক'দিনের ব্যাপার! আমি আনন্দ করতে যাচ্ছি না, কিছু শিখতে যাচ্ছি—তোমার খুশি হওয়া উচিত।

যাবার দু দিন আগে আবার একটি দৃশ্য দেখেছিলেন তিনি।

তখন মধ্যাহ্ন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ। বাড়ির জমজমে কলমুখরতা এই খানিকক্ষণের জন্যে নীরব, নিথর। নিজের মনে দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস। একেবারে অর্ধবৃত্তাকারের বারান্দাটার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখেন, অলস-মধ্যাহ্নে পাক-শালের দাওয়ার মোটা থামে ঠেস দিয়ে কনকদামিনী বসে আছেন। মাথায় ঘোমটা নেই, মুখে চোখে দূরের তন্ময়তা। মধ্যাহ্নের এই নীরবতার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছেন যেন।

ইন্দ্র বিশ্বাস নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ দেখলেন ঠিক নেই। তাঁর এই যাওয়াটা কনকদামিনী কি ভাবে নিয়েছেন জানার লোভ ছিল। কিন্তু জানার সুযোগ হয় নি, কথা বলার সুযোগ হয় নি। সুযোগ কনকদামিনীই দেন নি। আজ ইচ্ছে করলেই ইন্দ্র বিশ্বাস নেমে আসতে পারতেন। কথা কইতে পারতেন। কিন্তু এখন আর সে ইচ্ছে হল না। মধ্যাহ্নের এই নীরবতার শুচিতা নষ্ট করতে মন সরল না। সেখান থেকে সরে এলেন তিনি।

দিন যায়। জল জল আর জল।

জাহাজে বসে সমুদ্রের কালো জল দেখছিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস, আর এলোমেলো বাড়ির কথা ভাবছিলেন। পড়ন্ত রোদে সমুদ্রের জল রহস্যময় কালো দেখাচ্ছে। হঠাৎ চমকে উঠলেন ইন্দ্র বিশ্বাস। এই গভীর কালো জলের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখের সামনে একটি কালো মেয়ের মুখ ভেসে উঠেছিল।

তিনি জল দেখছিলেন না, কনকদামিনী দেখছিলেন।

॥ আট ॥

দূরে শিয়াল ডেকে উঠল কোথায়। রাত্রি দুই প্রহর। মসৃণ চামড়ায় মোড়া পাণ্ডুলিপিটি সামনে খোলা।

শশিশেখর দত্তগুপ্ত অন্যমনস্কের মত সিগারেট ধরাল একটা। তারপর উঠে পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। রেলিংএ ঠেস দিয়ে সিগারেট টানতে লাগল। বাইরে জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। চাঁদ যেন তার জ্যোৎস্নার ভাণ্ডারটি উবুড় করে পৃথিবীর দিকে ধরে আছে। না, শশিশেখর এই জ্যোৎস্নার প্লাবনে কনকদামিনীর কথা ভাবছে না। ওই জ্যোৎস্নাধোয়া চাঁদের মতই একখানা মুখ তার দিকে চেয়ে খলখলিয়ে হাসছে যেন। হাসছে হাসছে হাসছে—পাগলের মত হাসছে। শশিশেখর শিউরে উঠল হঠাৎ। এই হাসি সে আগেও দেখেছে। কিন্তু ওই হাসির কশাঘাত সেদিন ব্যর্থ হয়েছে। ওই হাসির মধ্যে যে মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা ছিল শশিশেখর তা সেদিন দেখে নি। আর, যে কান্নার সমুদ্র ছিল তাও না। শুধু হাসিই দেখেছে। হাসির বন্যা…।

এই জ্যোৎস্নার মতই সেই হাসির ধারা ছড়িয়ে ছড়িয়ে একাকার।

অলকা বলত, লোকে মদের নেশা করে, আফিমের নেশা করে, জুয়ার নেশা করে—তুমি টাকার নেশা করেছ। সব তৃষ্ণা তোমার এখন স্বর্ণতৃষ্ণায় এসে ঠেকেছে।

কিন্তু ঠাট্টার ছলেও এই অভিযোগ চাপাতে অলকার কিছু সময় লেগেছে। ভরা নদী শুকোতে থাকলে প্রথমে তা চোখেই পড়ে না। পড়ার কথা নয়। বেশি টান ধরলে তখন খেয়াল হয়। তার আগে অলকা অনেক দিন ধরে এই তৃষ্ণার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। খুব ধীর পরিবর্তন। তাও আবার অনেক সময় নিজের মনগড়া কল্পনা মনে হয়েছে। কারণ শুকনো নদীতেও বান ডাকে। তখন দু'কূল ভরে যায়। খেদ থাকে না, ক্ষোভ থাকে না। বৈচিত্র্যটুকুই বরং তখন লোভনীয় মনে হয়।

মায়ের মুখে ছেলের অনেক গল্প শুনেছিল অলকা। ছেলের হাব-ভাব, ধরন-ধারণ। বড় হওয়ার ঝোঁক। তাই নিয়ে মানসিক অশান্তি। মোট কথা ছেলের প্রসঙ্গে মায়ের একটা দুর্ভাবনা ছিল মনে হয়েছে। অলকা হাসি মুখে মায়ের কথাগুলোই শশিশেখরের ওপর বর্ষণ করেছে। ভ্রূকুটি করে কৃত্রিম অনুশাসনে তাকে সাবধান করেছে। শশিশেখরও তেমনি কৃত্রিম ভীত ত্রস্ত মুখে যেন তক্ষুনি নিঃশেষে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যস্ত। অনুশাসনের চেষ্টা সিকেয় তুলে অলকাকে ফিরে আবার মায়ের আশ্রয়ে ছুটে পালাতে হয়েছে।

এ রকম অনেকদিন হয়েছে। মা হঠাৎ লক্ষ্য করেছেন বউ ভালো মেয়ের মত মুখ করে প্রায় গা ঘেঁষে পুজোর ঘরে এসে বসল। যেন শাশুড়ীর পুজো-আর্চা দেখার প্রতিই আগ্রহ তার। ওদিকে শশিশেখর ছুতো-নাতায় বার কয়েক ঘুর ঘুর করে যায়। মা-কে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শোনে।

মা হাসি চেপে বউকে জিজ্ঞাসা করেন, কি-গো, কিছু বলবে ?

অলকা ছদ্ম-গাম্ভীর্যে কখনো মাথা নাড়ে। কখনো আবার বলে, আপনি আমাকে কিছু করতে তো দেবেনই না, এসে বসলেও তুলে দিতে চান—কেন, আমি কি ম্লেচ্ছ ?

মা মনে মনে খুশি হন। হেসে বলেন, বালাই ষাট, অভ্যেস তো নেই, এই গরমে তোমার কষ্ট হয়।

সেটা যেন অস্বীকার করে না অলকা। শশিশেখর তার একটা প্রস্তাব শুনল একদিন, বলছে, কষ্ট তো আপনারও হয়, এ-ঘরে একটা পাখা-লাগান না কেন? আমি আজই বলছি—

মায়ের হাসি শোনা গেছল। যেন অবুঝ মেয়ের কথাই শুনছেন তিনি। বললেন, ঘরে পাখা চললে প্রদীপ নিভে যাবে না!

ওদিকে ছেলের প্রতীক্ষা মা যে টের পেতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুই একবার ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই বউকে বলেন, দেখে এসো, কিছু চায় বোধ হয়। কখনো বা পুজোর প্রসাদ অথবা নির্মাল্য তার হাতে দিয়ে বলেন, দিয়ে এসো।

বাইরে থেকে শোনামাত্র শশিশেখর ঘরে এসে শয্যায় চিৎপাত। নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। প্রসাদ বা নির্মাল্য দিতে এসে নিরুপায় অলকা হেসে ফেলেই তর্জন করে, ছেলের দরদে মা পর্যন্ত এ ভাবে ষড়যন্ত্র করলে আমি আর কি করতে পারি।

নির্লজ্জের মতই শশিশেখর হাত বাড়িয়ে প্রসাদ নির্মাল্যের সঙ্গে তাকে সুদ্ধ দখল করে বসে।

মুখে যাই বলুক, অলকার অন্তর্তুষ্টি ছিল। শাশুড়ীর দুর্ভাবনা গেছে, তাঁর ছেলের স্বভাব নিয়ে আর ভাবেন না। গোঁ-ধরা এক দুরন্ত মানুষের ওপরে অধিকার বিস্তার করতে পেরেছে অলকা—অনায়াসে, অক্লেশে। ছেলেবেলা থেকে সে অন্যের চোখের আয়নায় নিজেকে দেখে অভ্যস্ত। এই দেখার প্রতি তার আস্থা ছিল। সেটা আরো বেড়েছে।

কিন্তু যার কাছে এসেছে, সে একটি ছোটখাটো দস্যু বিশেষ। এই দস্যুবৃত্তির ফলে গোড়ার বেশ কিছুদিন অন্তত অলকা কম বিড়ম্বিত হয় নি। মায়ের কাছে, দিব্যেন্দুর কাছে, এমন কি অনেক সময় মহাদেওর কাছেও লজ্জা পেয়েছে। সংসারের সকলের মধ্যে থেকে একজন যদি শুধু দু'জনকে নিয়ে সাম্রাজ্য গড়ার ঝোঁকে চলে, তাহলে সেটা যেমন চক্ষুলজ্জার কারণ হয়—তেমনি।

শশিশেখর নিজেও অনুভব করত তা। নিজেও লজ্জা পেত এক

এক সময়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তো ঝোঁকের ওপর চলাই স্বভাব তার। তখনকার মত অলকার রূপের ঝোঁক তাকে পেয়ে বসেছিল। এক দঙ্গল প্রার্থীর মধ্য থেকে তাকে নিজের ঘরে আনতে পেরে ভেবেছিল আকাশ থেকে চাঁদটাকেই ছিনিয়ে এনেছিল বুঝি। কিন্তু নিরুপায় অলকার এতটা ভালো লাগত না। সকল রহস্য উজাড় করে, আত্মসাৎ করে, লোকটা যেন দেউলে করে দিচ্ছিল তাকে। তার চাওয়া অনেক সময় স্থূল মনে হত, তাকে বড় বেশি কাছ থেকে দেখছে মনে হত। নিজেকে কিছুটা আড়ালে রেখে চলা রমণীর রীতি। এই রীতি কেউ খোঁচাতে বসলে একটা অদৃশ্য পুঁজির ওপর হাত পড়ে যেন।

শশিশেখর সব থেকে বেশি অবুঝের মত করত অলকার ছবি তোলা নিয়ে। তার ওঠা বসা খাওয়া শোয়ার ছবি তুলেই ক্ষান্ত হয় নি সে। তার ভ্রূকুটি কপট কোপ হাসি খুশির ছবি তোলা তো গোড়ার হাতে-খড়ির মত। রমণীর সব রহস্য আর সব ঐশ্বর্যই যেন ওই স্থিরতার অন্তঃপুরে ধরে রাখার ঝোঁক তার। এমন সব ছবি তুলেছে বা তুলতে চেয়েছে যাতে অলকার আপত্তি। কোনো আপত্তি টিঁকেছে, কোনোটা বা টেঁকে নি। কিন্তু কোনোদিকে হুঁশ যদি থাকত। ছবি তুলে তুলে সযত্নে নিজের হাতে মোটা অ্যালবামে সাজিয়ে রাখা চাই। সে-সময় কতদিন হয়ত দিব্যেন্দু ঘরে ঢুকেছে, মহাদেও ঘরে ঢুকেছে। অলকার সত্রাস ইশারায় বাবুর খেয়াল হয়েছে—অ্যালবাম বন্ধ করে কথায় মন দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই অ্যালবাম আবার যখন-তখন এনে দেখা চাই। দেখার পরে ওটা ট্রাঙ্কে থাকার কথা—কারো চোখে পড়লে লজ্জায় অলকার বাড়ি ছেড়েই পালাতে হবে হয়ত। কিন্তু সে-জ্ঞান যদি থাকত, দেখা হয়ে গেলে ওটা অনেক সময় হয়ত টেবিলের ওপরেই পড়ে থাকল—ওটা সরানোর যত দায় অলকার।

তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, ওটা ওখানেই ফেলে রেখে গেছলে? অলকা রাগই করত।—কেউ দেখে ফেললে?

মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া টেনে এনেছে শশিশেখর। বলেছে, তাই তো, মহাদেওটার আবার বউ নেই।

এই লোকের সঙ্গে পারা দায়, অলকা হাল না ছেড়ে করে কি।

সে-ও মন্দ ছবি তোলা শেখে নি এর মধ্যে। তবে তার বেশির ভাগ ছবিই হাসি ঠাট্টার মধ্যে তোলা হত বলে খুঁত থাকত। তবু শশিশেখরের বিশ্বাস অলকার ছবি তোলার হাত বেশ পরিষ্কার। বিশ্বাসটা যে সত্যি সেটা পরে বোঝা গেছে। অনেক পরে। ফ্ল্যাশ বাল্‌ব-এর মতই অলকার ভিতরটাও যখন ঝলসে ঝলসে উঠত। কিন্তু এই ঝলসানোটাও তখন শশিশেখর টের পেত না ভালো করে—পেলেও তেমন অনুভব করত না।

অলকার সেই খুশির অধ্যায়ে ছবি তোলার প্রধান শিকার দিব্যেন্দু। কাজের নিবিষ্টতার মধ্যে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব-এর ঘায়ে চমকে উঠেছে, খেতে বসে চমকে উঠেছে, রাতে শোবার আগে যখন চোখ বুজে বসে থাকে খানিকক্ষণ—তখনো চমকে উঠেছে।

অলকা হেসে বাঁচে না। তার হাসি দেখেই শশিশেখর হাসে। দিব্যেন্দুও। দিব্যেন্দু টিপ্পনী কাটে, এই মুখের ছবি তুলে আর কি হবে, দিন রাত যার ধ্যান করছ তাকে নিয়েই থাকো।

অলকা বলে, তোমার এই ছবি হিমালয়ে পাঠাব, সেখানকার যোগীরা যোগীশ্রেষ্ঠ দেখবেন—কাজ খাওয়া শোয়া বসা, যখন যেটা ধরে তাতেই নিবিষ্টচিত্ত।

দিব্যেন্দু বলে, তোমাকে ধরলেও এই নিবিষ্টতাই দেখবে, অতএব একটু সাবধানে থাকো। গম্ভীর মুখে শশিশেখরের দিকে ফেরে, আমার ওপর তোর বউয়ের এত টান কেন, এ-পর্যন্ত ও আমার কত ছবি তুলল হিসেব রাখিস? তুই ঘুমিয়ে পড়লে রাতে এই সব ছবি সাজিয়ে ধ্যানে বসে কিনা তাই বা কে জানে···

শশিশেখরের গো-বেচারা মুখ।—হতে পারে, আমার তো বিছানায় গা দিতে না দিতে ঘুম। অলকার কাছে এগিয়ে আসে, তুমি আমাকে এ-ভাবে—

এক ধাক্কায় প্রথমে হাত দুই সরিয়ে দেয় তাকে। তারপর বাক্যবাণে দিব্যেন্দুকেই বিঁধতে চেষ্টা করে।—থাক, খুব মুরোদ বোঝা গেছে, একটা মেয়ে নিয়ে পালাতে গিয়ে যার আহার নিদ্রা ঘোচে, তার আবার কথা টকটক করে। এই সব ছবি আমি মাদ্রাজের সেই আশ্রমে পাঠাব, এরপর লাঠির তাড়ায় তোমাকেই পাঠাব সেখানে।

দিব্যেন্দু তার দিকে চেয়ে হাসে মিটিমিটি। অপ্রস্তুত হলে বা লজ্জা পেলে অলকার সুবিধে হত।

জীবন-বাস্তব আর যৌবন-বাস্তবের প্রথম মানুষ অলকার প্রিয় হতে পেরেছে। সেই প্রিয়জন যখন শ্রদ্ধায় আবেগে তার অন্তরঙ্গ জনের চিত্রটি বড় করে এঁকে দেয়, তখন তাঁর প্রতিও কিছুটা আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। শশিশেখর অকৃতজ্ঞ নয়। নিজেকে সে কোন-দিন দিব্যেন্দুর থেকে বড় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে নি। উল্টে দিব্যেন্দুই যেন সব—তার জন্যেই ভাগ্য ক্ষেত্রের এই পরিবর্তন, আর তার চেষ্টার ফলেই অলকা লাভ। অলকার কাছে শশিশেখর দিব্যেন্দুর ছেলেবেলার গল্প করেছে, জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়ানোর গল্প করেছে, পুরুষের ক্ষুধা থেকে সেই বিড়ম্বিত বিধবা রমণীকে নিয়ে পালানোর গল্প করেছে—এমন কি, এক রাতের অমোঘ তাড়নার সঙ্গে যোঝার চেষ্টায় নিজের সেই হাত পোড়ানোর কাহিনীও বাদ দেয় নি। রাতের শয্যায় বুকে মুখ গুঁজে অলকা এই সব শুনেছে, আর উৎফুল্ল বিস্ময়ে কণ্টকিত হয়েছে। একজন এভাবে বড় করে তোলার ফলে আর একজন তার কাছে ছোট হয়ে যায় নি। যার বক্ষলগ্ন হয়ে এই সব শুনতে শুনতে রাত ভোর হয়ে এসেছে, তার এত বিদ্যা এত বুদ্ধি এমন কি শাশুড়ীর মুখে শোনা ওই এক-রোখা বেপরোয়া স্বভাবের জন্যেও সে ভিতরে ভিতরে পরিতুষ্ট। তাই, বড়র মুখে বড়র স্তুতি শুনলে যেমন ভালো লাগে তেমনি লেগেছে।

কিন্তু এমন অবিমিশ্র স্তুতির পিছনে শশিশেখরের একটু উদ্দেশ্যও

পেয়ালা চা চেয়েছিল বটে। সে-জন্যে

কথনো তা... ...শা করতে আসাটা খুব স্বাভাবিক

...র সুবিধে অনু... ...মন এসেছিল তেমনি

...খরের তাই ব...

তাই গো... দিব্যেন্দু বোসকে অলকা ... কৌতূহল নিয়ে দেখেছে। শুধু কৌতূহল নয়, এ-রকম ... প্রসঙ্গে নিজের অগোচরের স্বাভাবিক রমণী রীতিটুকুও কিছুটা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছিল। প্রাকৃতিক ক্ষুধার তাড়না পরাভূত করার জন্য যে মানুষ নিজের হাত পোড়ায়, দুই একটা নির্দোষ ঝাঁকুনিতে তার সংযমের বেড়াটাই হয়ত পরখ করার লোভ বেশি উঁকি-ঝুঁকি দেয় মেয়েদের। তাদের তারা শ্রদ্ধা করে,' আবার কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বিরোধ এদেরই সঙ্গে। এ-যাবৎ বহু চোখের ঘা খেয়ে অলকা নন্দী শেষ পর্যন্ত অলকা দত্তগুপ্ত হয়েছে। পুরুষের এই চোখ সে চেনে। দিব্যেন্দুর মধ্যেও তার আভাস মেলে কিনা নিজের অজ্ঞাতেও অলকার সেদিকে একেবারে লক্ষ্য ছিল না, একথা হলপ করে বলা যায় না।

এমনিতেই সকলের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে সে। সম্পর্কের সূতো ধরে দিব্যেন্দুর সঙ্গে মেলামেশাটা আরো সহজ হয়েছিল। অলকা তার নাম ধরে ডাকে, দিব্যেন্দুও অলকার নাম ধরে ডাকে। এই ডাকা-ডাকি নিয়ে গোড়ায় গোড়ায় অলকা অনেক রসিকতা করেছে। শশিশেখরকে ডেকেছে শশিবাবু বলে। শশির সঙ্গে বাবু না জুড়লে নাকি মেয়ে মেয়ে লাগে শুনতে। দিব্যেন্দু সাবধান করেছে তাকে, আমি তোমার ভাসুর পর্যায়ের দেওর সর্বদা খেয়াল রেখো। অলকা তক্ষুনি তা মেনে নিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, ফাল্গুনের গগনে শশীর উদয় হয়েছে ভাসুর ঠাকুরপো, চলো একটু হাওয়া খেয়ে আসি। কখনো ডেকেছে ব্রহ্মচারীজী বলে, কখনো দিব্যেন্দু মহারাজ বলে হাঁক দিয়ে নিজেই হেসে আটখানা।

দিব্যেন্দু নিবিষ্ট গাম্ভীর্যে তাকে খানিক নিরীক্ষণ করেছে,

ব্যবসায়ের হিসেব দেখার মত করে। তারপর শশিশেখরের দিকে ফিরে মন্তব্য করেছে, তোর বউটাকে হাসলে বেশি সুন্দর দেখায়, মাঝে মাঝে গালে থাপ্পড় মেরে কাঁদাবি, নইলে মারা পড়বি একদিন।

কাজে বসলে অলকা ছেলেমানুষের মত অতর্কিতে কলম কেড়ে নেয়।—ব্রহ্মচারীর দিনরাত অত টাকা পয়সার হিসেব কেন, বসে জপ-তপ করতে পারো না?

মনে মনে করি। কলিতে নাম সার। নাম জপ করি।

কি নাম?

অলকা অলকা অলকা অলকা অলকা…

কতবার করো?

হাজার আট বার…

ওতে কাজ হবে না, আট হাজার আটবার করবে।

তা'হলে কাজ হবেই বলছ?

কলমের নিবের কালি সকলের অগোচরে অলকা নিজের একটা আঙুলে মাখিয়েছে। সেই আঙুলটা চট করে তার গালে ঘষে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।—এই রকম কাজ হবে।

শশিশেখর জোরেই হেসে উঠেছিল। অলকাও। দিব্যেন্দু ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, সে ছাড়বে না, কিছু একটা করবে। অলকা দু'পা সরে গিয়ে তর্জন করছে, ভালো হবে না বলছি—

আরো পিছু হটলে যার সঙ্গে ধাক্কা লাগত সে মহাদেও। দোর গোড়ায় কখন এসে দাঁড়িয়েছে কেউ খেয়াল করে নি। অলকা পিছন ফিরে অপ্রস্তুত। ভাবেলশশূন্য নির্বোধ মুখটার দিকে চোখ পড়তেই চাপা হাসিতে সমস্ত মুখ রাঙিয়ে উঠল। সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি মহাদেও?

মহাদেওর দৃষ্টি অলকার মাথার ওপর দিয়ে শশিশেখরের দিকে। প্রশ্নটাও কানে গেল না। জিজ্ঞাসা করল, চা দেব?

এ-সময়ে নিয়মিত চা কেউ খায় না। তবে গতকাল এ-রকম

সময়েই শশিশেখর এক পেয়ালা চা চেয়েছিল বটে। সে-জন্যে আজও চা দিতে হবে কি না জিজ্ঞাসা করতে আসাটা খুব স্বাভাবিক নয়। শশিশেখর চা চাইনে বলতে মহাদেও যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাসির দমকে অলকা ভেঙেই পড়ল।

মহাদেও আমাকে একেবারে খাঁটি শ্বশুরের মত ভালবাসে, বউয়ের অত হাসাহসি হৈ-চৈ ওর একদম পছন্দ নয়।

এরপর অলকা মহাদেওর নিজের বউ আগলানোর গল্প শুনেছে। শশিশেখর বলেছে, বউকে একেবারে শ্মশান যাত্রা করিয়ে তবে ওর চিন্তা ভাবনা গেছে।

অলকা দু'চোখ কপালে তুলে ফেলেছিল।—তবে তো আমি এমনিতে না মরলে ও-কোন্‌দিন গলা টিপে মারবে আমাকে! হেসে সারা তারপর, সব নষ্টের গোড়া ওই দিব্যেন্দু, মহাদেও ভাবে ওর সঙ্গে বউরানী অমন বেহায়ার মত হাসাহাসি করে যখন, নিশ্চয় কিছু গণ্ডগোল আছে।

শশিশেখর মন্তব্য করে, ঠিকই ভাবে।

অলকা আবার ভ্রূকুটি করতে গিয়েও হেসে ফেলে। কারণে অকারণে তার এই হাসিই শশিশেখর বার বার দেখতে চায়। সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখে দিব্যেন্দুও। বলে, তোমার ব্যাঙ্ক থেকে কিছু হাসি মহাদেওকে ধার দিও, তাহলে ওর মাথা হয়ত কিছুটা ঠাণ্ডা থাকবে। ওকেও আমাদের দলে নেওয়া উচিত। নইলে ওর জন্যেই আমরা ধরা পড়ে যাব কোনদিন।

ঠাট্টাটা নিতান্ত স্থূল। অলকা ছদ্ম কোপে ঝাঁঝিয়ে উঠতে চেষ্টা করল, খুব শখ যে, অ্যাঁ?

আর এক সন্ধ্যায়।

নিবিষ্ট মনে কাগজপত্র দেখছিল দিব্যেন্দু। শশিশেখরও সেখানে বসে কোনো পার্টির কাছে চিঠি লিখছিল। বিয়ের পর থেকে ব্যবসায়ের যাবতীয় কাজ বলতে গেলে দিব্যেন্দু একাই দেখছে। সেটা মনে হলে শশিশেখর এক-একসময় লজ্জা পায়।

লজ্জা অলকাও দেয়। একজন দিনরাত খাটছে, আর একজন কাজ-কর্ম জলাঞ্জলি দিয়েছে—যাও পালাও বলছি এখন এখান থেকে. মা-ই বা ভাবেন কি!

অলকাকে মুখে যাই বলুক, শশিশেখর এক-একসময় কাজে মন দিতে চেষ্টা করে। জোর করে নিজেকে কাজের মধ্যে আটকেও রাখে হয়ত। কিন্তু কাজ করবে যে মন সেই মন অন্যত্র উধাও হলে কাজ পণ্ডই হয় বেশি।

অলকা ঘরে ঢুকতে শশিশেখরের চিঠি লেখায় মনোযোগ বাড়ল। সে দেখাতে চায় ঘরে কারো পদার্পণ টেরও পায় নি। দিব্যেন্দু যথার্থই হিসেবে ডুবে ছিল, সে খেয়াল করে নি। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে অলকা দুজনকেই নিরীক্ষণ করল। কোন মনোযোগটা নকল বুঝতে বাকি থাকল না। অতএব দিব্যেন্দুর দিকেই এলো সে। হঠাৎ কি মনে পড়তে দিব্যেন্দুর হিসেব-রত হাতটা তুলে ধরে সে-ও গম্ভীর মনোযোগে কিছু দেখতেই চেষ্টা করল। দিব্যেন্দু মুখ তুলল, আমার হাত ধরে টানটানি কেন, এক ঘণ্টা ধরে যে একটা চিঠিই লিখছে তার কাছে যাও।

অলকা তখনো গম্ভীর।—হাত টানাটানি করতে যাব কোন্ দুঃখে। দেখি, হাতটা দেখাও ভাল করে।

সঠিক না বুঝে দিব্যেন্দু তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, হস্তরেখা বিচার করবে?

না, পোড়া দাগ বিচার করব, উল্টো দিক দেখাও, কতটা পুড়িয়েছিলে ভালো করে দেখি।

দিব্যেন্দুর মুখ মুহূর্তের জন্য সচকিত হল একটু। শশিশেখরের দিকে তাকালো। তার চিঠি লেখার একাগ্রতায় ফাটল ধরে নি তখনো। দিব্যেন্দু ডাকল, এই—! তুই এসবও ওকে বলেছিস?

শশিশেখর কলম রেখে নিশ্চিন্ত এবারে। নিজেকেই শোনালো, এরা কাজটাজ আর করতে দিলে না দেখছি। গো-বেচারা মুখ করে প্রশ্নের জবাব দিল তারপর।—আমি লোকটা কত সরল বোঝ্

তা'হলে, এসব গোপনীয় ব্যাপার পর্যন্তও আমার মুখ থেকে বার করে নিয়েছে।

দিব্যেন্দু. গম্ভীর।—দেখ্ শশী বিয়ে সকলেই করে, বউকে অত মাথায় তুলেছিস কি মরেছিস।

অলকা সরোষে প্রতিবাদ করল, সাবধান, কুমন্ত্রণা বরদাস্ত করব না। হেসে ফেলল, বিয়ে সকলেই করে কে বললে, কেউ কেউ তো শুধু হাত পোড়ায়।

দিব্যেন্দুর হাল-ছাড়া গোছের অবস্থা। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমার খপ্পরে পড়লে হাত ছেড়ে মুখ পুড়িয়েও রেহাই পাব না বোধহয়।

আই অবজেক্ট! জল! বাতাস! শশিশেখর মনের আনন্দে একটু জোরেই চেঁচামিচি করে উঠেছিল।

অন্য দুজনের মুখে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার আগেই দোর গোড়ায় মহাদেও হাজির। শশিশেখর ঈষৎ অপ্রস্তুত। অলকা দিব্যেন্দুর টেবিলেই ঠেস দিয়ে বসে ছিল—মহাদেওর অভিব্যক্তিশূন্য দৃষ্টিটা প্রথমে সেই দিকে গেল। তারপর দাদাবাবুর দিকে ফিরল। নীরব প্রতীক্ষা। অর্থাৎ কিছু চাই কি না।

চা। শশিশেখর তাড়াতাড়ি হুকুম করে বাঁচ-।।

মহাদেও চলে যেতে অলকার ওই টেবিলের ওপরেই ভেঙে পড়ার দাখিল। দিব্যেন্দু ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চেপে ভুরু কুঁচকে দেখছে তাকে। শশিশেখর চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে ঘরের কড়িকাঠ গুনছে।

বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই আষাঢ়ের মেঘ নামল শশিশেখরের মুখে।

অলকার শরীর ভালো লাগে না, খাওয়া-দাওয়ায় বিতৃষ্ণা। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে লজ্জা পায়, মুখ ফিরিয়ে হাসে। জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তোলে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার

মুখের দিকে চেয়ে কিছু একটা স্পষ্ট ব্যতিক্রম চোখে পড়ে শশিশেখরের। হঠাৎ কিছু অমোঘ সম্ভাবনার কথাই মনে হয় তার। নিঃসংশয় হবার জন্য অলকাকে এক বন্ধু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। সে-ও মাথা নাড়ল, তাই বটে।

বাড়ি ফিরে অলকা শশিশেখরের মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়েই গেল।—কি হল?

শশিশেখর মাথা নাড়ল, যা হতে যাচ্ছে তা হবে না।

অলকা অবাক প্রথমে। কি যে বলতে চায় তাই যেন বোধগম্য হল না। পরে ঠাট্টা করেছে। অবুঝের মত তার ওই এক গোঁ দেখে রাগও করেছে।—আগে খেয়াল ছিল না।

শশিশেখর স্বীকার করতে রাজি নয়।—খেয়াল ছিল। এটা ঘটনাচক্র।

বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঘটনাচক্রে পড়তে হয়।···বাজে বোকো না, মা শুনলে কি বলবে?

মায়ের শোনার দরকার নেই।

অলকা রাজি হয় নি। শশিশেখর অনেক সাধ্যসাধনা করেছে, অনেক মিনতি করেছে, অনেক লোভনীয় স্বপ্নের জাল বুনেছে। নিজের মনের কথা খুব স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছে সে। মাতৃত্ব অলকার রূপ কেড়ে নেবে, দুজনের অফুরন্ত অভিসারের পথে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকবে! শশিশেখর জানে এ স্বার্থপরের মত কথা। কিন্তু জীবনের সব চাওয়াই তো স্বার্থের জন্য। সন্তান চাওয়াটাও। পরিপূর্ণতার স্বার্থের তাগিদে চায়। শশিশেখরের এই পরিপূর্ণতার প্রতি একটুও লোভ নেই। শুধু দুজনকে নিয়েই দুটি জীবন সম্পূর্ণ হোক। শশিশেখর সন্তান চায় না। কেন চাইবে? আমার বাবার বংশধরদের দেখো নি? তাদের কথা শোনো নি? আমাকে কুকুরের মত পথে বার করে দিয়েছে, সন্তান তার মাকে অসহায় দেখেও লোভ ছাড়তে পারে নি, নিজের নিজের স্বার্থের মশাল জ্বেলে বসে আছে সব। তার থেকে দুজনার এই ভোগের

স্বপ্ন সুন্দর হোক, অটুট হোক। অলকার রূপের আলো নিবলে শশিশেখর অন্ধ হবে।

ক'টা দিন অলকার সঙ্কটের মধ্যে কেটেছে। শশিশেখরের কথায় নিজের বিবেকের সাড়া মেলে নি, সমর্থন মেলে নি। এমন কি তার ইচ্ছের সঙ্গেও নিজের ইচ্ছে আদৌ মেলে নি। উল্টে কেমন একটা বিভ্রান্তির মধ্যে কেটেছে। কি এক অজানা ব্যর্থতার ছায়া মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। এই একটি সন্তান আসা বা না আসার সমস্যা নয় তার। সমস্যাটা তার থেকে অনেক বেশি কিছু যেন। কিন্তু ঠিক যে কি তা সে ধরতে পারছে না। যে ভোগের স্বপ্ন, পরিপূর্ণতার স্বপ্ন শশিশেখর দেখছে সেটাই যেন ভোরের পাণ্ডুর চাঁদের মত নিষ্প্রভ লাগছে তার কল্পনায়।

তবু অলকা শেষ পর্যন্ত রাজি হল।

রাজি হল শুধু শশিশেখরের ইচ্ছার বেগ প্রতিরোধ করতে পারা গেল না বলেই নয়। বয়েস কালে প্রথম সন্তান আবির্ভাবের সম্ভাবনায় যে আশঙ্কা ভয় অনিশ্চয়তা স্বাভাবিকভাবেই মনের নিভৃতে ভিড় করে আসে, রমণী সে-সবের সঙ্গে সহজে যুঝতে পারে পুরুষের একান্ত আশ্বাস আর অভয় মেলে বলে। পরস্পরের সহযোগিতায় দুজনের মন আরো বেশি পুষ্ট হয় তখন। কিন্তু অলকার ক্ষেত্রে তার বিপরীত ঘটল। কেউ আসবে বলে তার মানসিক অভ্যর্থনার দোসর তো নেই-ই, উল্টে যে আছে সে-ও যেন দূরে সরে যাবে। এই নিঃসঙ্গতার ভয়ও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকবে তার ওপর।

আনন্দে মাতাল হয়ে শশিশেখর অলকাকে নিয়ে আবার ডাক্তার বন্ধুর কাছে গিয়েছিল। অলকার শুকনো মুখ দেখে তাকে অনেক আশ্বাস দিয়েছে সে, ঠাট্টাও করেছে। অলকা হাসতে চেষ্টা করেছে, সহজ হতে চেষ্টা করেছে, নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করেছে। তবু মনের তলায় অজ্ঞাত অস্বস্তিটা থিতিয়েই আছে। তাদের এই যাত্রাটা যেন শুভ নয়।

না। শেষ পর্যন্ত অশুভও নয় দেখা গেল।

প্রস্তাব শুনে ডাক্তার বন্ধু প্রথমে বিস্মিত, এবং ক্রমশ বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ। গোড়ায় সে হেসেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। তারপর কারণ জানতে চেয়েছে। বলাবাহুল্য তাকে বোঝাবার মত কারণ শশিশেখর দেখাতে পারে নি। অলকাকে যা বলেছে তা একজন বন্ধুকে বলা চলে না। সব থেকে বড় কারণ, তারা চায় না। ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হতে দেখল অলকা, দৃষ্টিতে ভৎসনার আভাস দেখল। আর আশ্চর্য, অলকার তা ভালো লাগলো।

আপনিও চান না? বন্ধুর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ ছেড়ে ডাক্তার তাকেই জিজ্ঞাসা করেছিল।

অলকা থতমত খেয়েছিল। সে জবাব দিয়ে উঠতে পারে নি তার কারণ লজ্জা বা সঙ্কোচ নয়। তার কারণ যে সমর্থনের অভাবে এখানে আসা তা যেন অলকা এখন পাবে। ডাক্তারের এই তিরস্কারসূচক গম্ভীর প্রশ্নটা সামান্য একটা প্রশ্নই নয় শুধু।

জবাব তাড়াতাড়ি শশিশেখরই দিল। চাপা বিরক্তি প্রকাশ না করে সাগ্রহে বলল, এঁর অমত থাকলে ইনিও আসবেন কেন। আমরা হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করছি না, অনেক ভেবে চিন্তেই এসেছি।

তবু অলকার মনে হল ডাক্তারের সংশয় গেল না। গম্ভীর মুখে সে কি চিন্তা করছে। টাকা যত লাগে খরচ করতে আপত্তি নেই, শশিশেখর খুব সুশোভনভাবে ঘুরিয়ে সেই টোপ ফেলতেও কার্পণ্য করে নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকে রাজি করানো যায় নি। স্পষ্ট করে বলেছে, তোমাদের অনেক টাকা হয়েছে বুঝতে পারছি, তার ফলে ভীমরতিও ধরেছে। নীতি দুর্নীতির কথা সে বলে নি, চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ব্যবস্থার অশুভ দিকটা সে দরদ দিয়ে দুজনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। স্বাস্থ্য এবং মানসিক কুফলের অনেক নজির দেখিয়ে শেষে বলেছে, একটি সন্তান অন্তত

হয়ে যাক, তারপর আর যদি না চাও তো তখন দেখা যাবে.।

শশিশেখর মুখ কালো করে উঠেছে। অলকা ভয়ে ভয়ে তাকে লক্ষ্য করেছে। নিজের বিপরীত অনুভূতিটা সন্তর্পণে গোপন করতে চেষ্টা করেছে।

ফেরার পথে শশিশেখর খানিক গুম হয়ে বসে থেকে তপ্ত মন্তব্য ছুঁড়ল, মস্ত ডাক্তার হয়েছে, টাকা খরচ করলে এর থেকে অনেক বড় ডাক্তার পাওয়া যাবে।

জবাব না দিয়ে অলকা সামনের ড্রাইভারের দিকে তাকালো একবার। লোকটা বাঙালী নয়, প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী। কিছুদিন হল কোম্পানীর নামে দিব্যেন্দু এই দ্বিতীয় গাড়িটা কিনেছে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হলেও ভালো গাড়ি। সস্তায় এ-রকম ভালো গাড়ি হামেশাই মিলত তখন। কিন্তু হঠাৎ আবার এই গাড়িটা কেনার উদ্দেশ্য শশিশেখর আর অলকা দুজনেই বুঝেছিল। খুশিও হয়েছিল। ব্যবসায়ের কাজের চাপ বেশি, তার পনের আনা সম্প্রতি দিব্যেন্দু একা সামলাচ্ছে। একটা গাড়ি হামেশাই দরকার হয়। শশিশেখর আর অলকার দিক ভেবেই দিব্যেন্দু এই গাড়িটা কিনেছে। এর আগে দিনের মধ্যে দুই একবার মহাদেওকে ওদের জন্য ট্যাক্সি ধরে আনতে হত। অল্প সময়ের মধ্যে দু'দুটো গাড়ি কেনার অত কি দরকার পড়ল মা ভালো বোঝেন নি। দিব্যেন্দু হাসিমুখে বলেছে, তোমার বউয়ের পয় দেখো তাহলে, এ বাড়িতে আসার নামেই একটা গাড়ি হল, আসার পরে আবার একটা। মা আর অলকা দুজনেই হেসেছিল বটে, কিন্তু দুটো গাড়ির প্রসঙ্গেই তার উক্তিটা যে সত্য সে শুধু শশিশেখরই জানে।

ড্রাইভার বুঝুক না বুঝুক, শশিশেখরের এই জেদ অলকার ভালো লাগল না। উল্টে অবিবেচক মনে হল তাকে। এই ঝোঁকের ফাঁকে নিজের স্থূল স্বার্থের দিকটাই বেশি প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। যা শুনে এলো তাতে অলকার জন্যে একটু উতলা হতে পারত, টাকার কথা

না শুনিয়ে সঙ্কল্পটা ভালো কি মন্দ তা ভাবতে পারত। তার দ্বিধা দেখলে বরং স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণটা স্বাভাবিক মনে হত।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে অলকা বলল, টাকা খরচ করলে বড় ডাক্তার পাবে বটে, ভালো পরামর্শ না-ও পেতে পারো। এই ভদ্রলোক যা বললেন তাঁর কথাগুলোও একটু ভেবে দেখা দরকার। আমার তো মনে হচ্ছে ডাক্তার হিসেবে উচিত কথাই বলেছেন তিনি।

অলকা এই কথাগুলোই ধীরে সুস্থে পরে বললে হয়ত উষ্মার কারণ হত না। ঠিক এই মুহূর্তে ডাক্তারের লেকচারের মতই নীরস লাগল। চাপা বিরক্তি গোপন থাকল না. বলল, হ্যাঁঃ তুমি তো নিজেই ডাক্তার হয়ে বসেছ দেখছি—সব উচিত অনুচিত বুঝে ফেলেছ।

মুখ ফুটে বলার পরেও এই উক্তি আশা করে নি অলকা। অনুদার ঠেকল কানে। তবু হেসেই জবাব দিল, ডাক্তার আমিও নই ডাক্তার তুমিও নও, তাই যিনি ডাক্তার তাঁর মতামতের ওপর কিছুটা আস্থা থাকা উচিত—বিশেষ করে তিনি যখন তোমার বন্ধু।

এর পর আবার ক'টা দিন অস্বস্তির মধ্যে কেটেছে শশিশেখরের। আগের সেই জোর আর নেই। তবু কথা তুলেছে একদিন। নিজে জোর না করে অলকার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেছে। অলকার মত বদলে গেল কিনা জিজ্ঞাসা করেছে।

অলকা তখনকার মতো জবাব দেয় নি। কারণ রাগই হয়েছে তার। মত বদল হবে এ আশা উল্টে সে-ই করেছিল। রূপের প্রতি দয়া-মায়াশূন্য অন্ধ আকর্ষণ এমন এক মানসিক সঙ্কট ডেকে আনতে পারে কল্পনা করে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশ একটু জোর দিয়েই একটা রফা করেছে সে। যা হবার এবারের মতো হয়ে যাক, তারপর আর নয়। তারপর শশিশেখর যা বলবে তাতেই সে রাজি।

শশিশেখর আর তর্ক করে নি, আর জুলুম করে নি। এর পর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত মুখে আর হাবভাব আচরণে আত্মাভি-

মানের বর্ম এঁটে বসেছিল। অলকা কথা রাখে নি, দুজনের মাঝখানে অনাগত আগন্তুকের ব্যবধান রচনা করতে চলেছে, তার জগৎ শুধু শশিশেখরকে নিয়েই চলবে না—এ-যেন আর বুঝতে বাকি থাকে নি। অথচ এই রফা হবার পর মানুষটার মন বুঝে অলকা আগের থেকেও বেশি কাছে আসতে চেষ্টা করেছে, এমন কি এক এক সময় তোয়াজ তোষামোদও করেছে। সেই গোঁ-ধরা অভিমান দেখে আবার রেগেও গেছে। বলেছে, আচ্ছা তুমি এমন অবুঝ স্বার্থপর কেন ?

হ্যাঁ, অবুঝ স্বার্থপর বলেই এই অনুযোগের দাহ বেশি। শশিশেখর রেগেই যায়। বলে, আমার মতো স্বার্থপরের হাতে পড়ে তোমার জীবনটাই মাটি।

দুজনার মানসিক গোলযোগের এই আভাস দিব্যেন্দু আগেই পেয়েছে। এতদিন চুপচাপ শুধু লক্ষ্যই করছিল। সেদিন জিজ্ঞাসা করল, তোদের ব্যাপারখানা কি, কিছু যেন একটা ঘটেছে মনে হচ্ছে ?

শশিশেখর নির্বাক। কাজে অখণ্ড মনোযোগ। অলকা সকৌতুকে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে একটু। তারপর ইশারায় দিব্যেন্দুকে উৎসাহ যোগায়। অর্থাৎ ছেড়ো না, জেরা করো।

দিব্যেন্দু ফিরে তারই উদ্দেশে ভ্রূকুটি করে।—আমাকে ভেবেছ কি, তোমার কথায় আমি আপনার লোকের শত্রুতা করব! বরং আমার হুকুম শোনো, তোমার ক্যামেরা নিয়ে এসো, তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণ হিসেবে ওর এই মূর্তিখানা ধরে রাখা দরকার।

—এই!

শশিশেখর মুখ তুলেছে। গম্ভীর।

আমি ওকে ভাল হাতে শিক্ষা দিচ্ছি, কি হয়েছে বল্ দেখি ?

কি হবে ?

কিছু না হলে তুই অমন ক্ষেপে গিয়ে কাজে ডুবেছিস কেন ?

তোর যদি ডোবার ইচ্ছে না থাকে তো ওকে ডেকে নিয়ে তুই অন্য ঘরে গেলে ভালো হয়।

অলকাকেই চুপিচুপি দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করেছে,' কি. ব্যাপার বলো তো ?

নিরুপায় মুখ করেই অলকা হেসেছে।—ব্যাপার বলা যাবে না, জানলে পরে আমাকে হয়ত বাড়ি থেকেই দূর করে দেবে।

ভ্রূকুটি করে দিব্যেন্দু তখন অলকাকেই নিরীক্ষণ করেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ছদ্ম গাম্ভীর্য সত্ত্বেও চাউনিটা এত তীক্ষ্ণ যে অলকা নিজেই হাঁসফাঁস করে উঠেছে। চোখ গেলে দেবার একটা ভঙ্গি করে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

না বললেও দিব্যেন্দু গোলযোগের কারণটা নির্ভুল আঁচ করেছে। সে বুঝতে চাইলে বুঝবে না, তুনিয়ায় এমন কিছু আছে কিনা শশিশেখর বা অলকা জানে না। এরপর অনেক সময়েই তুজনের দিকে চেয়ে তাকে মিটি মিটি হাসতে দেখা গেছে। আর অপর জনের আচরণে অলকার রাগই হয়েছে। অনেক দিন ইচ্ছে হয়েছে, আবার সেই ডাক্তারের কাছেই ছুটে চলে যায়—লোকটা যা চায় তাই করে আসে।

সন্তান সম্ভাবনার ব্যাপারটা শাশুড়ী টের পাবার পরে ভিতরে ভিতরে অলকা একটু যেন স্বস্তি বোধ করেছে। ঝোঁকের মাথায় বা রাগের মাথায় আর কিছু করে বসার ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। তাছাড়া তাঁর খুশির ধাক্কায় এই মানুষটার গোমড়া মুখও অনেকখানি চুপসে গেছে।

অলকা আবার একটা ধাক্কা খেয়েছিল সাত মাসের আনন্দ অনুষ্ঠানের দিন। খুশি সেদিন সকলেই। শশিশেখরকেও অখুশি ভাবে নি অলকা। তুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর শ্রান্ত অলকা হাসি মুখেই ঘরে ঢুকেছিল। শশিশেখর তখন শয্যায় শয়ান। চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে।

অলকা কাছে বসল।—কি দেখছ ?

শশিশেখর জবাব দিল, কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে তোমাকে, এরপর আর লোকের সামনে বেশি বেরিও-টেরিও না।

অলকার হাসি মুখের ওপর যেন শপাং করে চাবুক পড়ল একটা। প্রথম সন্তান লাভের আশার সঙ্গে বিরাট একটা আশংকাও জড়িয়ে থাকে ভাবী মায়ের মনে। তখন এই একমাত্র আপনজনের দরদ-ভরা অভয়ের কথাই সকল রমণীর কাম্য। তার বদলে এই নির্দয় নিষ্ঠুর উক্তি।

অলকা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল, তোমার কাছেও তাহলে আর বেশি না আসা ভালো।

···তারপর সেই দুর্যোগের দুটো দিন, দুটো রাত। হাসপাতালের ক্যাবিনে অলকা অফুরন্ত কষ্ট পেয়েছে। আর ডাক্তারের অফিস ঘরে বসে শশিশেখর ভয়ে ঘেমেছে। পাশে দিব্যেন্দুও আছে সারাক্ষণ। সে ছটফট করছে না বটে। কিন্তু তার মুখেও আশঙ্কা।

এবারে অস্ত্রোপচার না করলে নয়। শশিশেখরকে জানিয়ে ডাক্তার সেই জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরকার হল না। অনেক যাতনা আর অনেক মেহনতের পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ছেলে। ডাক্তার আবার এসে শশিশেখরের কানে কানে কি বলতে সে সাগ্রহে মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল। শুধু তাই নয়, খসখস করে কি একটা ফর্ম সই করল।

ডাক্তার চলে যেতে দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার ?

—ইয়ে আর একটা ছোট অপারেশন দরকার।

—আবার অপারেশন···কেন ?

শশিশেখর গোপন করল না। স্নায়ুর ওপর দিয়ে যে-ধকল গেছে, আবার কেউ এই ফ্যাসাদের সম্ভাবনায় বাধা দিলে শশিশেখর তাকে ধরে মারতে পারে। সেই মুহূর্তে অন্তত আর কোনো মতামতের পরোয়া করে না সে। তাই বলল। তাছাড়া দিব্যেন্দুকে না বলার কি আছে।

শোনামাত্র দিব্যেন্দুর দুই চোখে নিখাদ বিস্ময়।—এখন এই শরীরে আবার অপারেশন!

—এই সময়েই ওটা সামান্য ব্যাপার, অন্য সময় অসুবিধে। ডাক্তারের সঙ্গে সে কথা আগেই হয়ে আছে।

—অলকা জানে?

—জানে। আজ নয়, অনেক দিন জানে।

দিব্যেন্দু আর একটি কথাও বলে নি। বলুক শশিশেখর চায়ও নি।

কিন্তু সেই রাতেই কি শশিশেখরের ভবিতব্য স্থির হয়ে গেছল? যদি হয়েও থাকে, শশিশেখর দীর্ঘকাল অন্তত টের পায় নি। টের পেলেও তা বিশ্বাস করতে চায় নি।

সেই রাতেই সেই অবাঞ্ছিত অনাদরের সন্তান বিদায় নিয়েছে। এমন যে হতে পারে কারো ধারণা ছিল না। এমন কি ডাক্তারেরও না। সুস্থ শিশু হঠাৎ একেবারে রক্তবর্ণ হয়ে গেছল। তারপর ঘোর নীল বর্ণ। তারপর শেষ।

বাড়ি ফেরার পর অলকা শশিশেখরকে জিজ্ঞাসা করেছে, খুশি হয়েছ?

যত মৃদু প্রশ্নই হোক, আঘাতটা মৃদু নয়। যেখানে লাগার সরাসরি গিয়ে লেগেছে। শশিশেখর জবাব দিল, খুশি হব কেন, এ-রকম হতে পারে কে ভেবেছে।

—ভাব নি বলেই তো আরো বেশি খুশি হবার কথা। ভবিষ্যতেও নিশ্চিন্ত।

যথার্থই রাগ হয়েছিল শশিশেখরের। সেটা প্রকাশ না করলেও বোঝা গেছে। তার অনুরাগ তার ভালবাসা তার মোহ কেন এত ছোট করে দেখবে অলকা। কেন তাকে নিয়ে, শুধু তাকে নিয়েই যথার্থ খুশি হবে না?

রাগ তারপর দিব্যেন্দুর ওপরেও হয়েছে। ওই শোকের মুখে অলকার আর সন্তান-সম্ভাবনা নির্মূল করার খবরটা মা-কে নিশ্চয়

সে-ই জানিয়েছে। অনেকদিন ধরে মায়ের সেই নীরব ভর্ৎসনা সর্বদা যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে বিঁধেছে। না, তারপর থেকে মা আর তার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলে নি। দিব্যেন্দু অস্বীকার করেছে, মা-কে সে কিছু বলে নি। শশিশেখর বিশ্বাস করে নি। কিন্তু অনেক, অনেকদিন পরে জেনেছে দিব্যেন্দু মিথ্যে বলে নি। ও মিথ্যে বলে না। দুর্ঘটনার পর অলকাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে নার্সের মুখ থেকে মা জেনেছে। বয়স্কা নার্স দুঃখ করে মা-কে বলেছিল, কাজটা ভালো হল না।

শুধু ছেলের ওপর নয়, অলকার ওপরেও মাকে বিরূপ দেখেছে শশিশেখর এরপর। মনে যাই থাক, পুরনো দিনের সেই হাসি-খুশির মধ্যেই আবার ফিরে যেতে চেষ্টা করেছে অলকা। পুরনো দিনের থেকেও বেশি। স্থির লক্ষ্য থাকলে শশিশেখরের সন্দেহ হতে পারত এতটা আনন্দের জোয়ারে ভাসার চেষ্টাটা মেকী কিনা। কিন্তু শশিশেখরের লক্ষ্য এতটা স্থির ছিল না। সে বাইরেটা দেখেছে, সেটাই বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

মায়ের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তিনিও যেমন দেখেছেন তেমনি বিশ্বাস করেছেন। আগে এই বউয়ের খুশির ঝাপটায় তিনি নাজেহাল হতেন, কিন্তু চেষ্টা করেও গম্ভীর হতে পারতেন না। পারতেন না কারণ খুশি তিনিও হতেন। তাঁর চোখ জুড়াতো, বুক জুড়াতো। কিন্তু এখন তিনি গম্ভীর। অলকার হাসি-খুশির মাত্রা ছাড়ালে বিরক্তিটুকু আপনি প্রকাশ পেত। বলতেন, নিজেরা আনন্দে আছ—থাকো, আমাকে তার ভাগ দিতে আসার দরকার নেই—ভাগ দেবার ভয়েই তো এমন মতি তোমাদের।

মা-কে তেমন ভাল না বাসলে এই থেকেই বাড়িতে একটা অশান্তি সৃষ্টি হতে পারত। তা ছাড়া মায়ের অভিযোগের পাল্টা জবাব দেবার অধিকার তো অলকার ছিলই। কারণ, যা ঘটেছে

তার জন্যে ও নিজে একটুও দায়ী নয়। কিন্তু অলকা মায়ের সামনে কোনোদিন মুখ খোলে নি। একবারও নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করতে চায় নি। মা-কে বিরূপ দেখলে সরে এসেছে।.. তারপর চুপচাপ শশিশেখরের মুখখানা দেখেছে। ফলে শশিশেখরের অস্বস্তি বেড়েছে, সেই সঙ্গে মায়ের প্রতি বিরক্তিও।

মাস ছয় বাদে মা চোখ বুজেছে।

শশিশেখর শোকে স্তব্ধ হয়েছিল ঠিকই। এই আঘাতের জন্য কোনো রকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। জ্ঞান বয়সের অনেক আগে থেকে মা তার জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে এই বিচ্ছেদটা হিসেবের বাইরে। তবু, একজনের এই বিদায় তার জীবনে যে কতবড় উল্কাপাতের সূচনা সেটা সেদিনও সে কল্পনা করে নি। মায়ের শোক সেদিন শুধু শোকই। সেই শোকে নির্ভরতার কোনো ভিত খসে নি। বিত্ত আছে, আর তার পাশে অলকা আছে আর দিব্যেন্দু আছে। তুনিয়াটাকে সেদিনও সে শূন্য দেখে নি।

...মায়ের মৃত্যুতে নির্ভরতার ভিত একমাত্র মহাদেওরই ধসে গেছল বোধহয়।

বছর ঘুরেছে একটা তুটো করে গোটা কয়েক।

দিনে দিনে বিত্ত আরো বেড়েছে। আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায় বোস অ্যাণ্ড দত্তগুপ্ত, পার্টনারস-এর কাজকর্মের পরিধি আরো প্রসারিত হয়েছে। সেই সঙ্গে দিব্যেন্দুর আলাদা বাড়ি হয়েছে। এ বাড়ির চাকচিক্য ব্যবস্থাদি বাড়ানো বা সম্প্রসারণ আর সম্ভব নয়। যতটুকু হবার হয়েছে। পাড়ার এই পুরনো বাড়িই একেবারে ঝকঝকে নতুন হয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে। অতএব এবারে দিব্যেন্দুর নামে আলাদা জমি কিনেছে শশিশেখর। সে না ব্যবস্থা করলে ও কোনোদিন কিছু করবে মনে হয় না। সেই জমিতে বাড়ি তোলার ব্যবস্থাও তার তাগিদেই হয়েছে।

অলকাকে লক্ষ্য করে দিব্যেন্দু টিপ্পনী কেটেছে, ও আমাকে এই বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়, আর ভরসা পাচ্ছে না বোধ হয়।

জবাব হাসি মুখে শশিশেখরই দিয়েছে, চাই তো, দৃষ্টিভোজে আর কতকাল সন্তুষ্ট থাকবি ?

দৃষ্টিভোজের পাত্রীটি কে, তোর বউ ?

ছদ্ম কোপে শশিশেখর চোখ রাঙিয়েছে, আমার বউ কি তোর দৃষ্টিভোজেরও অযোগ্য ?

এই। এখানে এসে দাঁড়াও তো, এখানে আমার সামনে।

আহ্বান অলকার উদ্দেশ্যে। তার হাতে কাগজে মোড়া কিসের প্যাকেট একটা। হুকুম তামিল করার মুখ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দিব্যেন্দুর কপট গম্ভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি তার পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত উঠল একপ্রস্থ তারপর আবার নীচের দিকে নামতে লাগল। তামাসা সত্ত্বেও অলকার মুখ লাল হবার উপক্রম। হাতের প্যাকেট দিয়েই ঠাস করে মাথায় বসিয়ে দিয়েছে এক ঘা, তারপর দূরে সরে দাঁড়িয়ে হেসেছে।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দিব্যেন্দু হাসিমুখে শশিশেখরের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, ভয়ানক যোগ্য, আমার পালানই ভালো এ বাড়ি ছেড়ে।

বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় আবার সব থেকে বেশি বাধা শশিশেখরই দিয়েছিল। বলেছিল, যাবার দরকার কি, ভাড়া দিয়ে দে, নয়তো বাড়ি দেখাশুনার জন্য ছুটো দরোয়ান রেখে দে।

দিব্যেন্দু ঠাট্টা করেছে, কেন তোর দৃষ্টিভোজের ভয় কমে গেল ?

শশিশেখর জবাব দিয়েছিল, তোর মতো ক্লীবকে ভয় করবে এমন আহম্মকও ছুনিয়ায় আছে ?

দিব্যেন্দু প্রতিবাদ করেছে। অলকার দিকে চেয়ে বলেছে, শুনলে পুরুষের এ অপমান সহ্য হয় ?

সহ্য করছ কেন, অলকাও শশিশেখরের সপক্ষে যেন, তুমি কি সেটা প্রমাণ দিয়ে ফ্যালো।

এত ছুঃসাহস তোমারও ! প্রমাণ দেব ? হাত বাড়াবো ? কপট কোপে একখানা হাত সে অলকার দিকেই বাড়িয়ে বসল।

অলকা রক্ত বর্ণ।—মারব এক গাঁট্টা, হাত বাড়াবার আর মানুষ নেই! সাহস থাকে তো চুলের মুঠি ধরে কাউকে টেনে আনো, এনে প্রমাণ দাও।

দিব্যেন্দু পরিতুষ্ট মুখে হেসে বলল, এক চ্যালেঞ্জে দুজনেই কাত দেখছি।

নিজের বাড়িতে উঠে গেছে। অলকাই সব গুছিয়ে দিয়ে এসেছে। আর সেই সঙ্গে ঝাঁঝালো মন্তব্য করেছে, যেমন বুদ্ধি সব, কার জন্যে কি বাড়ি। কোথায় ধরে বেঁধে হিমালয়ে পাঠিয়ে দেবে, না ভস্মে ঘি ঢালা।

শশিশেখর তাকে আশ্বাস দেবার ছলে দিব্যেন্দুকে বিঁধতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, হতাশ হচ্ছ কেন, বাবুর হাত আসছে দেখছ না —আগে ওকে ঘরে ঢোকালাম, রয়ে সয়ে ঘরনীও ঢোকাব।···ওই যার জন্যে হাত পুড়িয়েছিলি তার ঠিকানাটা আমাকে দিস তো।

কাছেই দিব্যেন্দুর বাড়ি। তাই স্বল্প অবকাশের অর্ধেকেরও বেশি সময় এ-বাড়িতে কাটায়। অনুরোধ করলে রাতে থেকেও যায় অনেক দিন। এই থাকা নিয়েও ছদ্ম বিতণ্ডা উপস্থিত হয় অনেক সময়। শশিশেখর অনুরোধ করলে দিব্যেন্দু থাকতে রাজি নয়, অলকা বললে থাকবে। শশিশেখর তখন অলকাকেই এগিয়ে দিতে চায়।—বলে ফ্যালো, মিথ্যে আর ওকে কষ্ট দাও।

অলকা ঝাঝ দেখাতে চেষ্টা করে, আমি বলতে যাব কেন, বাড়ি কি আমার। ইচ্ছে হয় থাকবে, ইচ্ছে না হয় পথ দেখো।

পথ দেখার জন্যেই দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়ায়। অলকা তখন নতুন সুরে ঝাঝ দেখায়, ভালো হবে না বলছি! তারপর হেসে ফেলে, আচ্ছা বললাম, থেকে যাও। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না বাছাধন, বুঝলে?

দিব্যেন্দু আবার বসে পড়ে জবাব দেয়, তাহলে আর থেকে লাভ কি। পরে বড় নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করে, এ যুগে কি আর সেই অতিথিপরায়ণতা আছে? সে ছিল একদিন।···একান্ত সেবা যত্নের

পর রাতে অতিথির শয়ন ঘরেও এসে দাঁড়াত গৃহিণী, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করত পরিতুষ্টির জন্য আর তার প্রয়োজন আছে কিনা।

হাতের কাছে শশিশেখরের সিগারেটের প্যাকেট পেয়ে তাই ছুঁড়ে মেরেছিল অলকা। আর শশিশেখরও চোখ পাকিয়ে বলে উঠেছিল, হিটিং বিলো দি বেল্ট! দেখ্ দিবা, তোর মতিগতি আজকাল সুবিধের ঠেকছে না—কালই আমি ডানা-কাটা পরী চাই বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি!

অলকাকে মাঝে রেখে শশিশেখর এমনি লাগাম-ছাড়া ঠাট্টা তামাসায় মেতে ওঠে। অলকার চোখে মুখে রূপের আগুন ঝিলিক দেয়। শশিশেখর নিঃশঙ্ক তামাসায় গা ভাসায়। আর দিব্যেন্দু হাসে আর ইন্ধন যোগায়।

সেদিন শশিশেখর বলল, মিথ্যেই এত গর্ব তোমাদের, এই গাধাটার ধ্যানভঙ্গ করতে পারলেই না!

অলকা তেমনি জবাব দিল, গাধার ধ্যানভঙ্গ হলে সেটা কি খুব ভালো ব্যাপার হবে?

দিব্যেন্দু মন্তব্য করল, আপত্তিকর!

ওতে কান না দিয়ে অলকা শশিশেখরের ওপরেই চড়াও হতে চেষ্টা করেছে।—তাছাড়া আমি ধ্যানভঙ্গ করতে গেলে তোমার দিক থেকে একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হবে না?

—রাইট! দিব্যেন্দু বিচারক।

শশিশেখরও উপেক্ষা করল তাকে, আলোচনটা যেন নিজেদের দুজনের মধ্যেই হচ্ছে। বলল, তা কেন, আর কাউকে ওর গলায় ঝুলিয়ে দাও।

অলকা বলল, তাহলে আমি আর মিথ্যে কষ্ট কার কেন, যে ঝুলবে সে-ই চেষ্টা করুক।

দিব্যেন্দু আঁতকে উঠে বলল, না না, মিথ্যে কষ্ট করতে হবে না, তুমিই চেষ্টা করো!

অলকার হাতে সেদিন পেপার ওয়েট উঠে এসেছিল বলেই ছুঁড়ে মারা হয় নি।

খুব স্বাভাবিক নিয়মে ভোগে ক্লান্তি এসেছে শশিশেখরের। তখন চিরাচরিত স্বর্ণতৃষ্ণাটাই প্রবল হয়েছে আবার। টাকার নেশায় আর কাজের নেশায় মেতে থাকলে বরং হঠাৎ কোনো মুহূর্তে আবার কিছু দিনের জন্য সেই ভোগের জোয়ারে গা ভাসানো সম্ভব হয়।

অলকা লক্ষ্য করত তাকে। পরিবর্তনটা সে-ই সব থেকে বেশি অনুভব করত। এরকম যে হতে পারে সে যেন জানত। আগে তাই অনেক সময় মনে হত, লোকটা তার সকল রহস্য উজাড় করে আত্মসাৎ করছে—একদিন এর বিরতি আসবে। তখন ও নিঃসম্বল হবে। অলকা সেটা প্রতিরোধ করতে চেয়েছে, যুঝতে চেয়েছে। কিন্তু বুঝতে দিতে চায় নি। তাই অনায়াসে আবার সেই চেনা পথেই পা বাড়িয়েছে সে। ক্লাবে যেতে শুরু করেছে। থিয়েটার নিয়ে আর জলসা নিয়ে নতুন উদ্যমে মেতেছে আবার। ক'টা বছর ওই সংস্কৃতির আঙিনায় শুকনো টান ধরেছিল, সেখানে দ্বিগুণ জোয়ার দ্বিগুণ উদ্দীপনার স্রোত বইতে শুরু করেছে।

যত স্বাধীনভাবেই পা ফেলে চলুক, আগে কুমারী মেয়ের চার-দিকে সহজাত নিষেধের বেড়া কিছু ছিলই। তাই ভক্তদের মনে হয়েছে যে নায়িকা চলে গেছল আর যে নায়িকা ফিরে এসেছে তারা এক নয়। যে চলে গেছল তাকে তারা নায়িকা বানিয়েছিল, আর যে ফিরে এলো সে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ং-নায়িকা। আগের থেকে সে অনেকগুণ ভরপুর হয়ে ফিরেছে।

মনে মনে অলকা এই চ্যালেঞ্জটুকু নিয়েই ফিরেছিল। তার দিন ফুরিয়েছে কিনা যাচাই করবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে। শশিশেখর কখনো আপত্তি করে নি, বাধা দেয় নি। মনে মনে বরং খুশি হয়েছে। দরকার অদরকারে উদার হাতে টাকা দিয়েছে। এই বৈচিত্র্য দেখেই প্রথমে সে মুগ্ধ হয়েছিল. অলকার এই রূপ

দেখে। দিব্যেন্দুকে নিয়ে সেও মনের আনন্দে থিয়েটার দেখতে গেছে, লোকের স্তুতি উপভোগ করেছে, তাদের মুগ্ধ চোখের ছোঁয়া তারও চোখে এসে লেগেছে। কিন্তু রাতের প্রত্যাশিত মুহূর্তে অলকাকে বড় বে-রসিক মনে হয়েছে। অনেক সময়েই তাকে ঠেলে দিয়ে প্রায় বিরক্তির সুরেই বলেছে, এখন ঘুমুতে দাও বাপু, এত ক্লান্ত যে মনে হচ্ছে পড়ে পড়ে টানা তিন দিন ঘুমুই।

কিন্তু ভোরে চোখ মেলে দেখেছে পাশের শয্যায় অলকা নেই।

ক্লাব আর বাইরের দিকে ঝোঁকটা দিব্যেন্দুর খুব পছন্দ হয়েছিল কিনা বোঝা যায় নি। তবে একদিন বলেছিল, আবার যে সেই পুরনো ব্যাপারে বেশ মেতে উঠলে দেখছি।

কটাক্ষে একবার শশিশেখরের দিকে চেয়ে অলকা ফিরে জিজ্ঞাসা করল, কেন তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি করার আমি কে। শুধু বললাম।

অলকা হাসতে লাগল। জবাবে পাল্টা খোঁচা দিল, নতুন কিছুতে মেতে ওঠার মতো কি রসদ তোমরা যোগাচ্ছ শুনি?

দিব্যেন্দু ভালো মুখ করে বলল, আমাদের ওপর কি তুমি নির্ভরশীলা?

মনে যা-ই থাক, আমন্ত্রণ এলে অলকার অনুষ্ঠান দেখতে শশিশেখরের সঙ্গে সেও যেত। আমন্ত্রণ তো বরাদ্দই ছিল। আর সমস্ত দর্শকের মধ্যে অনুষ্ঠানের ত্রুটি একমাত্র সেই বার করত। টিপ্পনী কেটে এটা-সেটা বলত। অলকাও জোরালো তর্ক করতে ছাড়ত না তার সঙ্গে।

সেবারে যে থিয়েটারটা হয়ে গেল তার নায়কের নির্বাসন বিধিলিপি। স্বার্থান্ধ মানুষের হীন চক্রান্তের বলি সে। বিচ্ছেদ অন্তে তেজস্বিনী নায়িকার চরম প্রতিশোধের মুহূর্তে অন্তর-বিপ্লব। সেখানে তার করুণাময়ী নারী-সত্তা জয়ী। নায়িকার অভিনয়ে দর্শক মুগ্ধ, সকলে ধন্য ধন্য করেছে। শুধু একজন ছাড়া। দিব্যেন্দু ছাড়া। সে বলেছে, জেলখানায় নায়কের সঙ্গে নায়িকার বিচ্ছেদ মুহূর্ত একেবারে

জলো হয়েছে। নায়িকার সেখানে নায়ককে দু'হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে থাকার কথা—কিছুতে তাকে ছাড়বে না, যেতে দেবে না। দিব্যেন্দুর অভিযোগ, বুকে আঁকড়ে ধরা দূরের কথা, নায়িকা আধ-হাত ফারাকে দাঁড়িয়ে অভিনয় করেছে।

রাগতে গিয়ে অলকা হেসে ফেলেছিল। বলেছে, আঁকড়ে ধরলে নায়ক নির্বাসনে যাবার আগেই হার্টফেল করত। সাহস থাকে তো পরের বারে তুমিই স্টেজে নেমে পড়ো—চেষ্টা করে দেখি।

দিব্যেন্দু গম্ভীর। সপ্রশ্ন দৃষ্টি শশিশেখরের দিকে।—কি রে, তোর আপত্তি আছে?

—কিছু না, কিছু না, এখনই একবার রিহারস্যাল হোক না।

কি যে হল শশিশেখর বুঝতে পারে নি, তার মুখখানা একপ্রস্থ ঝলসে দিয়ে অলকা প্রস্থান করেছিল।

আর একদিন অলকা হেসে সারা। ঘরে শুধু শশিশেখর ছিল। সেই বিকেলেই বাইরে থেকে ফিরেছে সে। সপ্তাহে দু'চারদিন প্লেনে হিল্লী-দিল্লী করতে হয় তাকে এখন। এই ছোটাছুটির কাজ সব দিব্যেন্দুর কাছ থেকে সে-ই কেড়ে নিয়েছে। এই দায় তার ঘাড়ে চাপতে দিব্যেন্দু নিশ্চিন্ত। এদিকে আয় ব্যয় হিসেব নিকেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো—সব দিব্যেন্দুর দায়িত্ব। এ কাজে সে পাকা। বসা কাজ শশিশেখরের ধাতে পোষায় না। দৌড়-ঝাঁপ ছোটাছুটি রাজা-মন্ত্রী করে বেড়াতে শশিশেখরের ভালো লাগে। ব্যবসার প্রয়োজনে উচ্চতম মহলে দিনেক রাত আর রাতকে দিন করে আনার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই এখন।

বাইরে থেকে ফিরে ঘণ্টা দুই বিশ্রামের ফাঁকেও দিব্যেন্দু এলো না দেখে সেই ওর ওখানে যাবে কি মহাদেওকে পাঠিয়ে ডেকে আনবে ভাবছিল। আর অলকাকে দিব্যেন্দুর কথাই জিজ্ঞাসা করছিল। হঠাৎ অলকা হেসে অস্থির।

এবারে বেরিয়ে একটা বড় রকমের শিকারের টোপ ফেলে এসেছে শশিশেখর। শুনলে দিব্যেন্দু মনে মনে তারিফ করবে খুব

সন্দেহ নেই। কিন্তু অলকার হাসির দমকে তন্ময়তা ভঙ্গ হল।—হাসছ যে?

হাসছি তোমার মহাদেওর কথা মনে পড়তে। তুমি না থাকলে ওর যে কি অবস্থা। পোষ মানে এমন এক-একটা ভয়ঙ্কর কুকুর দেখেছ না—বাড়িতে অচেনা লোক দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, ওর অবস্থাও সেইরকম—মুখে কিছু বলে না, ভিতরে ভিতরে রাগে গরগর করে।

অলকা ঠিক নালিশ করে না, কিন্তু মহাদেওর এই প্রায় অবাধ্য স্বভাবের কথা শশিশেখর মাঝে মাঝে শোনে। ওর নীরব গার্জেন-গিরি আজকাল যেন বাড়ছেই। আগে যেটা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি আর রসিকতার ব্যাপার ছিল, অনেক সময় সেটা এখন বিরক্তির কারণ। তখনো নিজের চিন্তায় মগ্ন, সুখবরটা দিব্যেন্দুকে ফোনে জানালেও হয়। অলকার কথাটা তলিয়ে না ভেবে জিজ্ঞাসা করল, মহাদেও অচেনা লোক আবার কাকে দেখল?

অলকা তেমনি হাসতে হাসতে জবাব দিল, ওর চেনা লোকের ওপরেই বেশি রাগ। সব থেকে বেশি রাগ বোধহয় দিব্যেন্দুর ওপর। সেদিন আমাকে বলছিল, দিব্যেন্দুবাবু তোমাকে অত ঘন ঘন বাইরে পাঠায় কেন, নিজে যেতে পারেন না? তারপর গত সন্ধ্যায় দিব্যেন্দু আসতে নিজেই তাকে বলে বসল, অত বেশি বাইরে ঘোরাঘুরি করে দাদাবাবুর শরীর ভেঙে পড়ছে, এখন দিনকতক বিশ্রাম দরকার।

শুনে শশিশেখর হঠাৎ রেগেই গেল। অলকার কাছে হামেশাই লোকে আসে আজকাল—ক্লাবের, পার্টির, শখের থিয়েটারের, ড্যান্সড্রামার। তাদের মহাদেও একটুও পছন্দ করে না, নিঃশব্দে অনেক সময় এমন রূঢ় ব্যবহার করে যে যারা আসে তারা ভড়কে যায়। এ নিয়ে অনেক বার অলকা চোখমুখ লাল করে ধমকেছে তাকে, আর শশিশেখরের কাছেও নালিশ করেছে। অবশ্য শশিশেখর ওকে কিছু বলতে গেলে অলকাই আবার

নিরস্ত করেছে তাকে। কিন্তু মহাদেওর স্পর্ধা এতদূর গড়িয়েছে শশিশেখর ভাবতে পারে নি। দিব্যেন্দুর যদি কখনো কিছু মনে হয় তাহলে তার পক্ষে নির্লিপ্তভাবে এই ব্যবসা ছেড়ে আর সকল সংস্রব ছেড়ে আবার হিমালয়ের দিকে প্রস্থান করাও অসম্ভব নয় হয়তো।

বলল, মা এক আচ্ছা ভূত চাপিয়ে গেছে আমার কাঁধে। মহাদেও—!

আচমকা হাঁক শুনে অলকাও চমকে উঠল।

বাধা দেবার সময় পেল না। পোষা কুকুরের মতই মহাদেও তক্ষুনি দৌড় গোড়ায় হাজির। অলকা তাড়াতাড়ি তাকে হুকুম করল, দাদাবাবু চান করে খাওয়া দাওয়া করবেন, গোসলখানায় সব ঠিক আছে কিনা দেখো—

দাদাবাবুর চোখ মুখের অবস্থা দেখে মহাদেও হতভম্বের মতই চলে গেল। এই জন্যেই তাকে ডাকা হয় নি বুঝে নিল। কেন ডাকা হয়েছে, হয়ত বা তাও। সে চলে যেতে অলকা, ঘুরে দাঁড়াল।—ওকে হাঁকপাঁক করে ডেকে উঠলে কেন?

—তোমরাই আসকারা দিচ্ছ, দিতুম দূর করে তাড়িয়ে!

হুঁঃ! গলা দিয়ে এমন একটা শব্দ বার করল অলকা আর [illegible]ভাবে এক ঝলক চোখের বিদ্যুৎ ছড়িয়ে চলে গেল যে শশিশেখর নি[illegible]ই বিমূঢ় হঠাৎ।

[illegible]এর ঘণ্টাখানেক বাদে দিব্যেন্দু এলো। শশিশেখরের হাসি চেঁচামিচি আর কথা-বার্তার আভাস এ ঘরেও কানে আসছে। কিন্তু অলকা তখন বুকে বালিশ চাপা দিয়ে একখানা উপন্যাস পড়ায় তন্ময়। এটা নাটক এবং অভিনয় হতে পারে কিনা দুই একদিনের মধ্যেই মতামত জানাতে হবে।

অলকা, অলকা—!

হাঁক শুনে অলকা ভুরু কোঁচকালো। দরজার দিকে চোখ পড়তে দেখে মহাদেও দাঁড়িয়ে। বলল, কি চায় দেখে এসো।

একটু বাদেই মহাদেও আবার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অলকা মুখ তুলতে গম্ভীর মুখে জানালো, ডাকছে।

অলকা উঠে এলো। এ ঘরে ঢুকতে শশিশেখর তর্জনের সুরে বলল, গাধাটাকে আজ রাতের মতো আটকাও তো এখানে, বলছি, বাইরে থেকে এলাম, আজ নিশ্চয় একটু বাড়তি আদর যত্নের ব্যবস্থা আছে, থেকে যা ভাগ পাবি, তা ও ভাগ বসাতে রাজি নয়। মহাদেও বলল, মুর্গির রোস্ট হয়েছে, তাতেও ওর জিবে জল খসছে না—

দিব্যেন্দুর মুখে হাসি ছড়াচ্ছে।

অলকা বলল, আমি বললেই জিভের জল খসবে?

শশিশেখর জবাব দিল, তুমি বলবে. সেই লোভেই ও না থাকার মর্জি ধরেছে। দিব্যেন্দুর দিকে চোখ পাকালো, ঠিক কিনা বল্?

দিব্যেন্দু ভাল মানুষের মতো মাথা নাড়ল। ঠিক।

অলকার ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস দেখা গেল একটু। আলতো করে বলল, মুর্গির রোস্টের ব্যাপারটা মহাদেওর ডিপার্টমেন্ট, তবু খেতে না হয় বললাম, কিন্তু রাতে এখানে থেকে যেতে বলে বাড়তি আদর-যত্ন কি করব?

শশিশেখর হা-হা শব্দে হেসে উঠল।—হ্যাঁরে, কি মতলব এদিকটা তো ভেবে দেখিনি!

আমার আবার কি মতলব, দিব্যেন্দু জবাব দিল, থাকতেও তুই বলছিস, বাড়তি আদর যত্নের লোভও তুই দেখাচ্ছিস। এরপর না ভেবে আর বোকার মতো ভাগ নিতে ডাকিস না।

দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগলো।

শশিশেখর ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে অলকার দিকে তাকালো। শেষ মুহূর্তে ঠিকই ডাকবে ভাবছে। কিন্তু ডাকল না। দিব্যেন্দুও নেমেই গেল। শশিশেখর যেমন অবাক তেমনি বিরক্ত।—চলেই গেল দেখলে না?

দেখলাম তো…

অলকার ঠোঁটে হাসির আভাস আরো স্পষ্ট। ফলে শশিশেখর আরো বেশি অসহিষ্ণু।—এখনো এগিয়ে গিয়ে ডেকে আনবে না কি?

অলকা হাসছে।—বাড়তি আদর যত্ন কতটা করতে পারি তুমি আগে সেই জবাব দাও।

শশিশেখর গুম হয়ে বসে রইল। অলকা মাঝে মাঝে এমনি অবাধ্য হয় আজকাল। অবাধ্য হয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করে। একটা হাই তুলে অলকা বলল, বইটা শেষ করিগে···তুমি কি খাবে না কি এখন?

জবাব না পেয়ে আবার বলল, রাগ করার কি আছে, খাবার কথা বলেছ, মহাদেওকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি সব।

শশিশেখর ঝাঁঝিয়ে উঠল, কিছু দরকার নেই।

কেন দরকার নেই?

তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে বলে।

অস্ফুট শব্দ করে অলকা হেসে উঠল। বলল. নিজের স্বার্থের খাতিরে তুমি দিন-রাত ওর তোয়াজ তোষামোদ করছ, তা বলে আমিও তাই করতে যাব কেন!

এতকাল বাদে তুমি এটা তোয়াজ তোষামোদ ভাবলে?

তাছাড়া আর কি?

একটু কঠিন সুরেই শশিশেখর বলল, তাহলে তুমিও তাই করবে, আমার স্বার্থটা নিজের স্বার্থ বলে ভাববে।

অলকা চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস তখনো অস্পষ্ট নয় একেবারে। বলল, তাহলে খাবারটা নিয়ে নিজেই যাই, খাইয়ে দাইয়ে বাড়তি আদর যত্ন করে ঠাণ্ডা করে আসি?

আর কথা কাটাকাটির সুযোগ না দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এলো।

টিফিন ক্যারিয়ারে করে মহাদেওকে দিয়ে দিব্যেন্দুর খাবারটা পাঠানো হয়েছে টের পেল শশিশেখর। টিফিন ক্যারিয়ারসুদ্ধ

ফেরত এলে খুশি হত। আসবে ভেবেছিল। টিফিন ক্যারিয়ার হাতে মহাদেও ফিরল অনেকক্ষণ বাদে। শশিশেখর জিজ্ঞাসা করল, কি হল?-

মহাদেও জবাব দিল, বউরানী খাইয়ে আসতে বলেছিলেন, তাই একটু দেরি হল···

ফলে দিব্যেন্দুর ওপরেই তখনকার মতো রাগ হল শশিশেখরের। পেটুক আর কাকে বলে।

দিনকতক পরের কথা। সেটা বিয়ের দিন ওদের। এই দিনে একটু বাড়তি আনন্দ আর হৈ-চৈ হয়েই থাকে। কাজে ব্যস্ত থাকে বলে ছবি তোলা কমেছে, কিন্তু এই দিনে শশিশেখর কম করে আট দশখানা ছবি তোলে অলকার। যে ছবি তোলায় অলকার আপত্তি সেই গোছের ছবি তোলার ঝোঁকও চাপে।

কিন্তু দিনটার কথা এবারে বেমালুম ভুলেই বসল শশিশেখর। সকাল থেকে খুবই ব্যস্ত ছিল অবশ্য। ব্যবসার কাজে দিব্যেন্দুর সঙ্গে গাড়িতে আসানসোল গেছল। ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে দশটা। তখনো মনে পড়ত কিনা সন্দেহ। ফেরার পথে দিব্যেন্দু মনে করিয়ে দিল। বলল, হ্যাঁরে, আজ না তোদের বিয়ের দিন।

শশিশেখর এক জগৎ থেকে আর এক জগতে ফিরল যেন। একটু চিন্তা করে বলল, তাই তো রে···সেরেছে। ভুলেই গেছি—

দিব্যেন্দু বলল, আমারও এইমাত্র হঠাৎ মনে পড়ল।

রাত সাড়ে দশটায় অপ্রস্তুত মুখে ঘরে ফিরেছে শশিশেখর। দিব্যেন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মনে মনে কিছু কৈফিয়তও তালিম দিয়েছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠেস দিয়ে মহাদেও ঝিমুচ্ছে। শোবার ঘরের দরজা দুটো ভেজানো। ঠেলে নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়াল। তারপর লালায়িত হবার মতই দৃশ্য একটা। ইজি চেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায় অলকা ঘুমিয়ে আছে। কোলের ওপর বই একটা। মাথার ওপর পুরো দমে পাখা ঘুরছে, অবিন্যস্ত কয়েক

গোছা চুল উড়ছে। বুকের আঁচলটা খসে মাটিতে লুটোচ্ছে। বেশি গরম লাগছিল বলে ব্লাউজের বোতাম খোলা।

সতৃষ্ণ মুহূর্ত কয়েকটা। পা টিপে শশিশেখর বেরিয়ে এলো। একটু বাদেই ক্যামেরা হাতে ফিরল আবার।

ফ্ল্যাশ বাল্‌ব ঝলসে উঠতে অলকা ধড়মড় করে উঠে বসল। স্খলিত শাড়ির আঁচলটা তাড়াতাড়ি গায়ে জড়ালো। ক্রুদ্ধ মূর্তি। কি ছবি তোলা হয়েছে সে-সম্পর্কেও সচেতন।—ভালো হবে না বলছি!

উঠে রাগের মাথায় তার হাত থেকে ক্যামেরাটাই কেড়ে নিতে গেল। না পেরে শাসালো, ওই ক্যামেরাসুদ্ধ আমি আছড়ে ভাঙব বলে দিলাম!

শশিশেখর হাসছে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো করে পকেট থেকে চাবি বার করে নীচের দিকের একটা দেরাজ খুলল। অর্থাৎ ক্যামেরা এবার তার নিরাপদ হেপাজাতে থাকবে।

কিন্তু দেরাজ খুলেই অবাক সে! বলেই ফেলল, আমার সেই অ্যালবামটা গেল কোথায়?

সেই অ্যালবাম, অর্থাৎ, যে অ্যালবামে আজকের এই ছবি থেকেও রমণীয় যৌবনের অনেক লোভনীয় সংগ্রহ রয়েছে। শোনা-মাত্র অলকাও বিষম অবাক। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে পিছনে দাঁড়ালো। নেই বটে। ভুল করে অন্য দেরাজে রেখেছে ভেবে একে একে সেগুলোও টেনে খুলল। ভিতরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করল।

নেই।

অলকার সমস্ত মুখে যেন আলগা তাজা রক্তের ছোপ লেগেছে। পিছনে দাঁড়িয়ে তল্লাসী দেখছে।

শশিশেখর ঘুরে তাকালো।—তুমি সরিয়েছ?

অলকা মাথা নাড়াল। সরায় নি।

কিন্তু মুখ অত লাল দেখে শশিশেখরের সন্দেহ বদ্ধমূল হল

সে-ই সরিয়েছে। বিয়ের দিন ভোলার অপরাধটা অ্যালবাম খুঁজে বার করার রেষারেষিতে চাপা দিতে চেষ্টা করল সে। আঁতি-পাতি খুঁজল। অলকার আলমারি ট্রাঙ্ক তছনছ করল সে, সম্ভব অসম্ভব অনেক জায়গায় দেখল। অলকার সমস্ত মুখ তেমনি লাল। সে খোঁজা দেখছে। ফলে শশিশেখর আরো নিঃসংশয়—অলকাই সরিয়েছে কোথাও।

এমন কি দ্রুত একটু চিন্তাও করে নিয়েছে শশিশেখর। আসলে বিয়ের তারিখ ভোলার এটাই প্রতিশোধ অলকার।···অভিনয় তো ভালই করে। ইচ্ছে করেই ঘুমের ভান করে ওইভাবে পড়েছিল। আর ওই দৃশ্য দেখলে ছবিও যে তোলা হবে তাও জানতই। আর তারপর যে এই সমস্ত ব্যাপারটাই পর পর আসবে তাও জানত।

ছদ্ম কোপে শশিশেখর চোখ পাকালো, আমার জিনিস তুমি দেবে কিনা ?

অলকা মাথা নাড়ল, আমি নিই নি।

নাও নি ? আচমকা এক ঝটকায় তাকে টেনে নিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ল।—আমার জিনিস না পেলে ছবির মালিককে আজ আমি আস্ত রাখব না বলে দিলাম। কথার সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় নিষ্পেষণে উদ্দেশ্যটাও স্পষ্ট করে তুলতে চাইল।

অলকার সামলে নিতে সময় লাগল একটু। তারপর সজোরে ঠেলে সরালো তাকে। এত জোড়ে যে অল্প-স্বল্প আঘাতই লেগেছে শশিশেখরের। কিন্তু অলকার সমস্ত মুখ বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এক্ষুনি আর রক্ত ছুটবে। উঠে বসে বিস্রস্ত বসন ঠিক করে নিল। দু'চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে। খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো। দু'হাতে চুলের গোছা দু'দিকে সরিয়ে দিল। বসন আর একটু বিন্যস্ত করে নিল। কিন্তু তার দিকেই চেয়ে আছে আর দু'চোখে আগুন ঝরছে।

হন হন করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিয়ের তারিখে এমন ছন্দপতন কল্পনার অতীত।

তিন চার দিন কাটল। দু'জনের মধ্যে কথা নেই একটাও। অভিমান যে শশিশেখরও করতে জানে বুঝিয়ে দিতে ছাড়বে না।··· কিন্তু অলকার সমস্ত মুখ সারাক্ষণ এত লাল কেন। তার ছবি তোলানো আর ছবির অ্যালবাম সারানোর কারসাজি ধরা পড়েছে বলে? তাহলেও কারো মুখ সমস্তক্ষণ এমন অস্বাভাবিক লাল থাকতে পারে!

সেদিন সন্ধ্যার পর আপিস ফেরত সবে ঘরে বসেছে শশিশেখর। অলকা সামনে এসে দাঁড়াল। মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর হঠাৎ সে কি হাসি। হাসছে হাসছে হাসছে, হাসির চোটে সমস্ত শরীর বেঁকে দুমড়ে ভেঙে চুরে একাকার হয়ে যাবে বুঝি। চোখে জল এসে গেল, শাড়ির আঁচল মুখে গুঁজে দিল। তবু হাসি থামে না।

—কি ব্যাপার? শশিশেখরের পক্ষেও গাম্ভীর্য বজায় রাখা শক্ত হয়ে উঠল।

জবাব দিতে সময় লাগল। হাসি থামালো কোনরকমে। আঁচলে করে চোখ মুখ মেজে নিল। তারপর খাটের তোষক উল্টে মোটা অ্যালবামটা বার করে তার সামনে রাখল।—এই নাও তোমার সম্পত্তি।

শশিশেখর সচকিত একটু।—কোথায় ছিল?

তোমার গাদাকরা বইয়ের র‍্যাকের পিছনে। এই তো সম্পত্তি আগলানোর খেয়াল তোমার—মহাদেও ওটা নেড়ে চেড়ে দেখে-টেকে রেখেছে কিনা কে জানে।

বুদ্ধিমানের মতো সেই সন্ধ্যায় নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েছিল শশিশেখর। তর্ক করে নি, বা আর তাকে জব্দ করতে চেষ্টা করে নি। কিন্তু মনে মনে সেই রাতে সে-ও কম হাসে নি। কিন্তু সেই সঙ্গে তলায় তলায় কাঁটার মতো বিঁধছিলও কি। অলকা না হয় ধরাই পড়েছিল। স্বীকার করলেই সেও হাসির ব্যাপার

হতে পারত। কিন্তু তার বদলে কিনা অলকা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ-রকম একটা মিথ্যের আশ্রয় নিল!

কাজের চাপ বাড়ছে। আর অলকার তাই নিয়ে রাগ করা আর ঠেস দেওয়াও বাড়ছে। শশিশেখর গায়ে মাখে না। সে শুধু তখনই ক্ষুণ্ণ হয় যখন দিব্যেন্দুর সঙ্গেও মাঝে মাঝে অকরুণ ব্যবহার করতে দেখে তাকে। ওকেও মুখের ওপরেই বলে বসে, ভালো আমলা পেয়েছে দেখছি, কাজের জাঁতা-কলে ফেলে হাসপাতালে পাঠাবার মতলব নাকি?

দিব্যেন্দু জবাব দেয়, ধরে ফেলছ দেখছি।

না ধরার কি আছে, নিজের তো চেহারাখানা দিব্বি ফিরেছে।

এই কথাগুলোই হাসিমুখে বললে একরকম। কিন্তু সত্যিকারের ঝাঁঝ মিশলে শ্রুতিকটু। সেদিন দিব্যেন্দু ওর হাতের কি একটা খাবার বায়না করতে ও সাফ বলে বসল, মহাদেও করে দিক, সন্ধ্যায় তার ক্লাবে যেতে হবে।

অথচ বিকেলে শশিশেখরের সঙ্গে সিনেমা দেখার কথা বলছিল অলকা। সত্যিই সেজে-গুজে ওদের নাকের ডগা দিয়ে ক্লাবে চলে গেছল। আর ফিরেছিল অনেক রাতে।

এদিকে শশিশেখরকেও প্রায়ই সেই পুরনো ঠেস দেবে। তার সকল তৃষ্ণা এখন কেবল স্বর্ণ তৃষ্ণায় এসে ঠেকেছে।

ব্যস্ত থাকলে শশিশেখর পাশ কাটায়। নয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাসিমুখে সেই একই জবাব দেয়।—এই তৃষ্ণা আছে বলেই তোমার বাবা ভরসা করে হাজার ক্যানডিডেটের মধ্যে এই অধমকে বেছে নিয়ে তোমাকে তার গলায় ঝুলিয়েছেন।

বাবার কথা উঠলেই অলকা মুখ ঝামটা দেয়, আবার বাবাকে ধরে টানাটানি কেন, তিনি তাঁর কাজ শেষ করেছেন—নিজের কথা বল।

নিজের কথাই বলে শশিশেখর। পুরুষের কথা। বলে এই

যুগটাই স্বর্ণ তৃষ্ণার যুগ। আর বলে, আমাদের স্বর্ণ তৃষ্ণা, তোমাদের আনন্দের তৃষ্ণা।

ভ্রুকুটি ঘোরালো হলে এখনো অলকাকে আগের থেকে একটুও কম সুন্দর দেখায় না।—কি আনন্দ দেখলে শুনি? একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে, নাকি তোমার ব্যবসার হিসেব কষব বসে বসে?

গোড়ায় গোড়ায় এ কথা শুনলে শশিশেখর অপ্রস্তুত হত একটু। একটা অপরাধ চেতনা উঁকিঝুঁকি দিত।···অলকা আবারও তার অগোচরে সেই বন্ধু ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল—জানে। আবারও তাকে অনেক টাকা সেধেছিল—জানে। কিন্তু এবারে ডাক্তার নিরুপায়। যে সম্ভাবনা নির্মূল করা হয়েছে আর সেখানে নতুন অঙ্কুর ধরবে না। তাই অলকা কিছু একটা নিয়ে থাকার খোঁচা দিলে প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করত।

কিন্তু এখন আর করে না। অলকা নিরানন্দে আছে সে একটুও বিশ্বাস করে না। ভাবে অলকা শোনাবার জন্যে শোনায়, নইলে দিব্বি তো আছে। ক্লাব নিয়ে, থিয়েটার নিয়ে, জলসা নিয়ে খাসা আনন্দে আছে। ওর এই আনন্দের ঝোঁক দিনকে দিন বাড়ছেও।

···অলকার চার ধারে নতুন করে আবার এক যৌবন রাজ্য গড়ে উঠেছিল সত্যি কথাই। আর অলকা নিজেই এবারে এই রাজ্য গড়ার দিকে মন দিয়েছিল।

কারা আসে তার আছে, কারা যায় শশিশেখর খবরও রাখে না। অলকাই গোড়ায় গোড়ায় অনেক হোমরাচোমরা লোকের ফিরিস্তি দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু শশিশেখরের তেমন শোনার অবকাশ হত না। ইদানীং বাইরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণেও অনেক সময় পাঁচ-সাত দিনের জন্যে অলকা সহচর-সহচরী পরিবৃতা হয়ে এখানে সেখানে চলে যায়। ফিরে এসে ডাকসাইটে এক-একজন লোকের কাণ্ডকারখানার গল্প করতে বসে। শশিশেখর

শোনে আর মনে মনে হাসে। অলকার তীক্ষ্ণ গোপন দৃষ্টিটা তার অগোচর নয়। সে জানে অলকার রূপ আছে, এই রূপের আগুনে অনেক পতঙ্গ মরতে ধেয়ে আসে। কিন্তু সে এও জানে, অলকা এ-সব বলে তার মনে ঈর্ষার উদ্রেক করতে চায়। ফিল্‌ম কোম্পানির লোকেরা আসে অলকার কাছে। তার শৌখিন স্টেজের অভিনয় কে আর না দেখেছে? ছবির ব্যবসায়ীরা তাকে ছবিতে নামাতে চায়। মোটা টাকার বিনিময়ে একটা কনট্রাক্ট সই করানোর জন্যে দিনের পর দিন ধরনা দেয়। অলকা হাসে। শশিশেখরকে জিজ্ঞাসা করে, নেমে পড়ি কি বলো?

বেশ তো। শশিশেখর আগ্রহ দেখায়।—ভদ্রঘরের মেয়েরা তো হামেশাই নামছে, দোষ কি।

শশিশেখর জানে, সে আপত্তি করলেই গোঁ ধরে ছবিতে নামত অলকা। আপত্তি করে নি বলেই তার আর আগ্রহ থাকল না। শশিশেখর জিজ্ঞাসা করে, তোমার সিনেমায় নামার কি হল?

অলকা ঠোঁট উল্টে জবাব দেয়, ভাল লাগে না।

আবার একটা সুযোগ এলে শশিশেখর আপত্তিই করবে ঠিক করেছে। আপত্তি করলে, ঈর্ষা প্রকাশ করলে অলকা হয়তো সত্যিই আর একটু ভাল থাকবে। তার জন্য শশিশেখরের সত্যিই দুঃখ হয় এক-একসময়। অলকা তাকে বড় বেশি চায়। কিন্তু শশিশেখরের সময় কোথায় অত? অলকা বলে সোনার নেশা। শশিশেখর অস্বীকার করে না। কিন্তু এ নেশা না থাকলে যে দুনিয়ায় সব কালো! মাসে হাত খরচ কত অলকার? ক'হাজার টাকা? এই নেশা ছুটলে সেই টাকা আসবে কোথা থেকে?

তা ছাড়া এই মত্ত নেশা ছাড়া যায়? কে না এই নেশায় মেতে আছে? এক দিব্যেন্দু ছাড়া। ওটা পাগল। আর সকলেই তো মনের ওপর একটা জোরালো মোটর বসিয়ে ছুটছে। স্পীড্। স্পীড্ অন্! এটা গতির যুগ। এই জীবনে একবারই শুধু থামবে! তার আগে স্পীড্! স্পীড্ অন্! গোটা পৃথিবীটা এই নেশায়

ছুটেছে। কি সংগ্রহ হচ্ছে সেদিকে তাকাচ্ছে না। উদ্দেশ্যটা বড় নয়, এগনোটা বড়। স্পীড্! স্পীড্ অন্!

কিন্তু হঠাৎ থামতে হল একদিন।

বড় আকস্মিক থামা। আচমকা সর্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হয়ে থামার মত।

প্রথমে ভেবেছিল দিব্যেন্দুর মাথা খারাপ হয়েছে। কি করছে সে নিজেই ভাল জানে না। পরে দেখল জানে। অনেকদিন ধরে আটঘাট বেঁধে তবে যা করার করেছে। এত বড় ব্যবসায় শশিশেখর এখন কেউই নয়। সবই তার। একা দিব্যেন্দুর। সে তাকে পথ দেখতে বলেছে। সমস্ত কোম্পানির দখল নিয়েছে। এ-পর্যন্ত শশিশেখর শুধু কাজ করে গেছে। কাজ আর কাজ আর কাজ। বোস অ্যাণ্ড দত্তগুপ্ত পার্টনারস। কিন্তু শশিশেখরের অংশ ঝাঁঝরা। দেখা গেল কোম্পানি বরং তার কাছ থেকে অজস্র টাকা পাবে। ব্যাঙ্ক ট্র্যাংজাকশান সব দিব্যেন্দু করত। কিন্তু শেষের দিকে সে অসুস্থতার অজুহাতে বহু চেক তাকে দিয়ে সই করিয়েছে। উল্টে এখন সে-সবের জটিল কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। চোখ কান বুজে তার নির্দেশ মত শশিশেখর কত কিছুতে সই দিয়েছে ঠিক নেই। এক-একবার বাইরে যাবার আগে সাদা কাগজেও সই করিয়ে নিয়েছে দিব্যেন্দু। যে দরকারের কথা বলেছে সেটা শশিশেখর কোনোদিন তলিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করে নি।

শশিশেখর কি পাগল হয়ে যাবে? খুন করবে দিব্যেন্দুকে? এই বসতবাড়িটা পর্যন্ত সে দাবি করেছে। কেস্ শুরু হয়েছে। কিন্তু এত বড় কেস্ চালাতে অনেক টাকার ধাক্কা। দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত টাকা আসবে কোথা থেকে? সবই তো দিব্যেন্দু আগে থাকতে হস্তগত করে রেখেছে। বাড়িতে অঢেল সোনা গয়নাও এমন কিছু নেই। বেশি সোনা গয়না অলকা পছন্দ

করে না। বেশি গয়না পড়লে রূপ ঢাকা পড়ে যে—গয়নার দিকে আগে চোখ যায়।

পাগলের মতই উন্মত্ত অবস্থা শশিশেখরের। নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ছে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে নেমে আসাটা মৃত্যুর গহ্বরে নেমে আসার সামিল। শুনে প্রথম অলকাও স্তম্ভিত হয়েছিল। গোলযোগ বাধবে সে যেন জানত, কিন্তু এতটাই হবে এ জানত না। স্তব্ধ মূর্তির মত বসেছিল সে, কিন্তু তার মতো দিশেহারা হয় নি, দাপাদাপি করে নি।

শশিশেখর বলেছে, উঃ, এত টাকার লোভ আমি জানতুম না, বরং উল্টো ভাবতুম—টাকার লোভে সে এই করবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

অলকা খানিক চুপ করে থেকে বলেছিল, শুধু টাকার লোভে নাও হতে পারে, টাকার লোভ তো এতকালের মধ্যে আমিও দেখি নি, অন্য কারণ থাকতে পারে—

শশিশেখর ভালো করে শোনেও নি, বিরক্ত হয়েছে। মেয়েলী কথার মাথামুণ্ডু নেই ভেবেছে।

অলকা হঠাৎ সাগ্রহে কাছে উঠে এসেছে, বুকে পিঠে হাত রেখেছে। বলেছে, গেছে যখন সব যাক, এই বোঝা গেছে ভালই হয়েছে—চল আমরা কোথাও চলে যাই, শুধু দুজনে মিলে থাকি কোথাও—না হয় কষ্ট করেই চলে যাবে আমাদের—সে কষ্ট আমার একটুও কষ্ট মনে হবে না।

শোনামাত্র আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল শশিশেখর। বিকৃত রোষে বলে উঠেছিল, তুমি শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখোগে যাও, তার আগে রসাতলে যাব আমি, বুঝলে? চিৎকার করে উঠেছিল, যাও এখান থেকে, আমাকে বিরক্ত করো না!

অলকা চলে গিয়েছিল। কিন্তু যাবার আগে স্থির চোখে দেখে গিয়েছিল, ঐশ্বর্যচ্যুত হলে মানুষ কতখানি ক্ষিপ্ত হতে পারে। আর একটু দাঁড়ালে আরো বেশি আঘাত করে বসত শশিশেখর, ঐশ্বর্য

না থাকলে ওই রূপ আর রূপের গর্ব যে কত মেকী—সেই কথাই বলত।

কিন্তু তার আগেই অলকা ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

টাকার জন্যেই অন্ধের মত ছোটাছুটি করেছে শশিশেখর। টাকা মেলে নি। বিশ্বাস, একবার দিল্লী আর একবার বম্বে যেতে পারলে নিজের স্বপক্ষের কিছু নজির সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু সংগ্রহ করেই বা হবে কি, কেস চালাবে কি দিয়ে? কতদিন চালাবে?

টাকা সামান্যই পেল। শেষে টাকার বদলে আর কিছু সংগ্রহ করল। বিষম কিছু। আরো কটা দিন অপেক্ষা করবে। আরো যতটুকু চেষ্টা করার করবে। কিছু যদি না-ই হয়, তখন একেবারে নিশ্চিন্ত হবে সে। তার কাছে মাঝামাঝি বলে কিছু নেই। জীবনের এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে অন্য কোনো অবস্থার সঙ্গে সে আপোস করবে না।

অলকা আবার এসেছে। আবারও কোথাও চলে যাবার কথা বলেছে। যা হয়েছে ভাল হয়েছে, আরো অনেক খারাপ হতে পারত।

শশিশেখর জবাব দিয়েছে, আর অনেক খারাপ হবে না। হয়তো যাব। আর ক'টা দিন সবুর কর। মনে মনে ভেবেছে, অলকার জন্যে ভাবনা কি—তার রূপ আছে। দরকার হলে এই রূপ ভাঙিয়ে অনায়াসে চলে যাবে তার। এই রূপের রাস্তায়ই তো চলে অভ্যস্ত সে।

আবার শিয়াল ডেকে উঠল দূরে। শশিশেখরের চমক ভাঙল। রাতের জ্যোৎস্না আরো সাদাটে লাগছে। তারা-ভরা আকাশটা যেন সকৌতুকে হাসছে তার দিকে চেয়ে।

হলঘরে ফিরে এলো। বসল। পাণ্ডুলিপিটা খোলা পড়ে আছে। দেয়ালের অয়েলপেন্টিংগুলো তার দিকে চেয়ে আছে। বর্তমান মুছে যাচ্ছে।

॥ নয় ॥

শম্ভুনারায়ণ বিশ্বাস একেবারে গোঁ ধরে বসলেন, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শাস্ত্রের বিধান, পণ্ডিতদের বিধান—এ অমান্য করা চলবে না।

কিন্তু তাঁর এই জেদের কারণ ছেলের শুচিশুদ্ধ হওয়াই নয়। এটা অনেকটা টেস্ট্ কেস্-এর মত। এই থেকে বোঝা যাবে ছেলে একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, না তাকে দিয়ে এখনো ভরসা করার কিছু আছে। তার হাতে বংশের দণ্ড থাকবে কি থাকবে না। একটা নাতি থাকলে আরো অনেক রূঢ়, অনেক কঠিন হতে পারতেন শম্ভুনারায়ণ। নাতির অভাবে নাতনীদের ওপরেই ভরসা করতে হবে। তারাও ফেল্না নয়। ওদের সাহেবী দেশে তো উত্তরাধিকার না থাকলে উত্তরাধিকারিণীর হাতে রাজত্ব পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়। সম্পত্তি বা বিত্ত রক্ষণাবেক্ষণের গুরু দায়িত্ব এই ছেলের হাতে দিয়ে তো কোনদিনই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।

সেদিক থেকেও অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য লোক তিনি পেয়ে গেছেন। বিষয়-আশয় দেখাশুনা সব কৃষ্ণকুমার করছেন। এই কয়েক বছরে বৃদ্ধটি তাঁকে অনেকভাবে বাজিয়ে দেখেছেন, যাচাই করেছেন। কৃষ্ণকুমার প্রসঙ্গে অনেক বিশ্বস্ততার সমাচার ইন্দ্র বিশ্বাস হেমনলিনীর মুখে শুনেছেন। এমন একজন যোগ্য লোককে সব দেখাশুনোর জন্য পাওয়া গেছে সেটা ভাগ্যের কথা, খুশির কথা। হেমনলিনী খুশি মনেই বলেছিলেন।

কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে ইন্দ্র বিশ্বাস বেঁকে বসলেন। তিনি কোন অপরাধ করেন নি যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শম্ভুনারায়ণ পুত্রবধূকে বোঝালেন, তোমার মেয়েদের বিয়ে হওয়া শক্ত হবে, বিষয়-আশয় ম্লেচ্ছের ছায়া পড়ে রসাতলে যাবে। হেমনলিনী তাই বিশ্বাস করলেন, স্বামীকে সকাতরে অনুরোধ করলেন, সকলে বলছেন যখন প্রায়শ্চিত্ত একটা করলেই তো হয়, বিশেষ করে

ঠাকুরের এই যখন ইচ্ছে। তা ছাড়া পরে তোমার মেয়েদের বিয়ে নিয়েও গণ্ডগোল হতে পারে।

ইন্দ্র বিশ্বাস জবাব দেন নি। কিন্তু যে ভাবে তাকিয়েছিলেন, হেমনলিনী আর দাঁড়ান নি সেখানে। এর পর কৃষ্ণকুমার এসেছেন। হাসিমুখে বলেছেন, লোকে যখন ছুটো মন্ত্র পড়লেই আর গায়ে একটু জলের ছিটে দিলেই খুশি হয়, নিশ্চিন্ত হয়, তাই কর না। মিথ্যে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

ইন্দ্র বিশ্বাস গম্ভীর জবাব দিলেন, ভেবে দেখি।

কর্তামশাইকে কি বলব?

বলো আমি ভেবে দেখছি।

ভেবে দেখতে দেখতে ক'টা দিন গেল। কিন্তু আসলে ইন্দ্র বিশ্বাস এক মুহূর্তও ভাবেন নি। তিনি শুধু দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তি দূর করছিলেন। বাড়ির মধ্যে থেকেও তিনি সকলের কাছ থেকে এখন আরো বেশি বিচ্ছিন্ন। শ্বশুরের অনিচ্ছায় হেমনলিনী তাঁর ছোঁয়া জলও স্পর্শ করতে পারেন না। আপাতত বাড়ির মধ্যে থেকেই জাতিচ্যুত তিনি। তাঁর ভেবে দেখা শেষ হলে সব কিছুর ফয়শালা হবে।

ইতিমধ্যে কনকদামিনীকে বার কয়েক দেখেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলার অবকাশ হয় নি। ঘরে কেউ না কেউ ছিল। ইন্দ্র বিশ্বাসের মনে হল, কনকদামিনী এক-গলা ঘোমটা টেনে কারো না কারো উপস্থিতিতেই তাঁর খাবারটা রেখে যান। অথচ আশ্চর্য, বাড়ির মধ্যে শুধু এই একজনের মনোভাবটা জানতে ইচ্ছে করছিল ইন্দ্র বিশ্বাসের।

সেদিন সন্ধ্যায় শনিপূজা হচ্ছিল নীচে। পুরুতঠাকুর টেনে টেনে স্তোত্র পাঠ করছেন। বাবুর কিছু চাই কিনা খোঁজ নিতে একজন চাকর ঘরে এসেছিল। কি ভেবে ইন্দ্র বিশ্বাস হঠাৎ আদেশ করলেন, কনকদামিনীকে ডেকে দিতে। বিস্ময় গোপন করে চাকর প্রস্থান করল।

একটু বাদে কনকদামিনী এলেন। তেমনি একগলা ঘোমটা টানা। দরজার কাছে এসে স্থির, নিশ্চল হলেন।

ভিতরে এসো।

খুব মন্থর পদক্ষেপে ভিতরে এলেন।

কেমন আছ ?

ঘোমটা ঢাকা মাথা নড়ল না। ভাল আছেন।

ইন্দ্র বিশ্বাসের একবার ইচ্ছে হল ঘোমটাটা সরাতে বলেন। এসে অবধি মুখ দেখেন নি। কিন্তু সে-ইচ্ছে ত্যাগ করলেন। বললেন, এঁরা সকলেই আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলছেন। কিন্তু আমি কোন অপরাধ করিনি। এখানে যেমন দেখছ সেখানেও তেমনিই ছিলাম।...তুমি কি বল ?

নীরব মুহূর্ত গোটাকতক। কনকদামিনী আস্তে আস্তে মুখ থেকে ঘোমটা সরালেন। ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে দেখলেন কয়েক পলক। বিস্ময় গিয়ে দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ হল। স্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে বললেন, দোষ না করলে প্রায়শ্চিত্ত করবেন কেন ?

এই মুখ, এই চোখের দিকে চেয়েই ইন্দ্র বিশ্বাসের ক্লান্তির বোঝা নেমে গিয়েছিল। চেয়ে চেয়ে দেখছেন তাঁকে।...কনকদামিনী ঠিক তেমনই আছে।

হঠাৎ হেমনলিনী ঘরে ঢুকলেন। কনকদামিনী ঘোমটা টানার অবকাশ পেলেন না। সে চেষ্টাও করলেন না। হেমনলিনীর মুখ আরক্ত গম্ভীর। কনকদামিনীর উদ্দেশে বললেন, ওদিকে সব ছড়িয়ে একাকার হয়ে আছে, শিগগির যাও—।

ইন্দ্র বিশ্বাস স্ত্রীকে দেখছেন এবার। চোখে কৌতুক উপচে পড়ছে। কনকদামিনী ধীর শান্ত পায়ে চলে গেলেন। হেমনলিনী স্বামীর দিকে ফিরলেন। তাঁর চাপা উত্তেজনাটুকু সুস্পষ্ট।

ইন্দ্র বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হঠাৎ এ-সময়ে এলে ?

বামুনদিকে কেন দরকার পড়ল দেখতে এসেছিলাম।

দেখলে ?

হেমনলিনী মুখরা হলে অন্য জবাব দিতেন। এখন হয়তো তাঁর নিজেরই মনে হচ্ছে না এলেই ভাল ছিল। তবু বললেন, তুমি প্রায়শ্চিত্ত করবে কি করবে না সে-পরামর্শ বামুনদি দেবেন ?

না, কৃষ্ণকুমারও দিয়েছে।

বিমূঢ় মুখে হেমনলিনী পায়ে পায়ে প্রস্থান করলেন।

এর পর চার পাঁচদিন আর কনকদামিনীর সাক্ষাৎ পেলেন না ইন্দ্র বিশ্বাস। অন্য একজন রমণী তাঁর আহার্য রেখে যাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলেন ব্যবস্থাটা কনকদামিনীরই। শেষে মনে হল, বাড়ির কোথাও দেখছেন না তাঁকে। খট্‌কা লাগল কেমন, একটা সন্দেহ ঘনীভূত হল।

হেমনলিনীকে ঘরে ডাকলেন। তিনি এলেন।

কনকদামিনী কোথায় ? ক'দিন তাকে দেখছি না—

হেমনলিনীর মুখ শুকাল। অস্ফুট জবাব দিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে কৃষ্ণদাদা তাঁকে জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

নিজেকে সংবরণ করতে ইন্দ্র বিশ্বাসের সময় লাগল। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কৃষ্ণদাদা এ বাড়ির কে ?

···তিনিই তো সব দেখাশুনা করছেন।

তোমার দেখাশুনাটাও তা হলে এবার থেকে তাঁকেই করতে বলো।

হেমনলিনী প্রস্থান করে বাঁচলেন। অস্থির চিত্তে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন ইন্দ্র বিশ্বাস। তার পর বেরিয়ে পড়লেন।

অনেক খোঁজ করে বাড়ির সেই পুরুতের ঘরেই কনকদামিনীর সন্ধান পেলেন। পুরুত বাড়ি ছিলেন না। কনকদামিনী বেরিয়ে এলেন। মাথার ঘোমটাটা টেনে দিতে গিয়েও টানলেন না।

ইন্দ্র বিশ্বাস ডাকলেন, এসো।

দুই-এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত কনকদামিনী। সামনেই ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার পর স্থির নেত্রে খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে সামনের

লোকটিকেই দেখে নিলেন। শেষে একটি কথাও না বলে যেমন ছিলেন তেমনি গাড়িতে উঠে বসলেন।

গাড়ি চলল। কোথায় কোন্‌দিকে যাচ্ছে কনকদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন না। মূর্তির মত বসে তিনি। সামনের মানুষটির দিকেও তাকাচ্ছেন না।

একটু বাদে ইন্দ্র বিশ্বাস নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, তুমি আমাকে না বলে চলে এলে কেন, তুমি জানতে না আমি তোমার খোঁজ করব ?

জানতাম। কিন্তু খোঁজ না করাই ভাল ছিল।

ইন্দ্র বিশ্বাস চুপ করে রইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন না কেন। জিজ্ঞাসা করলেন না, তা হলে কনকদামিনী এলেন কেন।

গাড়ি এক বড় দালানের সামনে থামল। তাঁরা ভিতরে এলেন। বাড়িতে জনাদুই পরিচারক ভিন্ন আর কেউ নেই। ইন্দ্র বিশ্বাস বললেন, আপাতত এখানেই থাকতে হবে, কিছু ভয় নেই।

না বললেও হত। কনকদামিনীর এই চোখ মুখে ভয়ের চিহ্নও নেই। নির্লিপ্ত, শান্ত তিনি।

একটানা দশ-বার দিন কেটে গেল সেখানে। কনকদামিনী আগের মতই রান্না করেন, খেতে দেন। কিন্তু কথা বেশি হয় না। সেদিন বাইরে থেকে ফিরে ইন্দ্র বিশ্বাস জানালেন, প্রায়শ্চিত্ত করব কিনা ভেবে জানাব বলেছিলাম—আজ বাবাকে জানিয়ে দিলাম। আমি ক্রিশ্চিয়ান হয়েছি।

শুনে কনকদামিনী নির্বাক। তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন ইন্দ্র বিশ্বাস। তেমনি ধীর স্থির দেখে খুশি হলেন। ঈষৎ আগ্রহে বললেন, তোমারও ক্রিশ্চিয়ান হতে আপত্তি আছে ?

জবাব দেবার আগে কনকদামিনী সময় নিলেন একটু। তার পর তেমনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে তো ভিতর কিছু বদলাবে না।

ইন্দ্র বিশ্বাস আর অনুরোধ করলেন না। নিজের মধ্যেই কি

এক পর্বতপ্রমাণ অস্বস্তি জমাট বেঁধে উঠছে। কনকদামিনীকে নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করলেন তিনি। ছোট বাড়ি থেকে বড় বাড়ি, বড় বাড়ি থেকে আরো বড় বাড়িতে গেলেন। আইনের ব্যবসায় টাকা বৃষ্টি হচ্ছে তাঁর মাথায়।

এদিকে ছেলের বিধর্মী হওয়ার খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুনারায়ণ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। উইল করে তিনি যাবতীয় সম্পত্তি পুত্রবধূ আর তাঁর শিশুকন্যাদের লিখে দিলেন। আর তার কিছুদিন বাদেই চোখ বুজলেন। অন্তিম শয্যায়ও ছেলেকে একটিবার দেখার ইচ্ছে প্রকাশে করেন নি।

কৃষ্ণকুমার আগের মতই আসেন, দাবা খেলেন। একদিন ইন্দ্র বিশ্বাসের মদের মাত্রা হয়তো একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সম্পত্তি তো পুত্রবধূকে দিয়ে গেলেন, পুত্রবধূটিকে কাকে দিলেন?

কৃষ্ণকুমারের কালো মুখে রক্ত উঠেছিল।

ইন্দ্র বিশ্বাস হাসছেন, বললেন, জীবনটা চিনির বলদ হয়েই কাটালে হে!

কৃষ্ণকুমার জবাব দিয়েছেন, তোমার মত বলদ হওয়ার চেয়ে চিনির বলদ হওয়া ভাল।

বছর ঘুরে এলো। ব্যারিস্টার বিশ্বাস এক মানুষ আর ইন্দ্র বিশ্বাস আর এক মানুষ। আইনের জটিলতা ভেদ করতে তাঁর জুড়ি নেই। সেখানে তিনি তীক্ষ্ণ, দুর্দম, স্থির বুদ্ধি। সেখানে কমলা আর বাগ্‌দেবী একই সঙ্গে প্রসন্ন তাঁর ওপর। যশ আর অর্থ দুই অনুগত তাঁর। কিন্তু এই লোকই বাড়িতে আর একরকম। নিজের সঙ্গেই কি এক অবিরাম দ্বন্দ্ব চলছে তাঁর। শেষে মদ খান। সর্বদা ছটফট করেন। মনে হয় নিজের সঙ্গেই যুঝছেন তিনি। মদ খেয়ে শান্ত হয়ে পড়তে বসেন।

কনকদামিনী তেমনই আছেন। নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ান তাঁকে, তাঁর ঘর পরিচ্ছন্ন করেন, বইপত্র গুছিয়ে রাখেন।

স্বাস্থ্য এতটুকু খারাপ হলে তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু দিনান্তে দু-চারটে কথাও হয় না। এক-একসময় ইন্দ্র বিশ্বাসের ইচ্ছে হয় তাঁকে কাছে ডাকেন, বসতে বলেন, কথা বলেন। কিন্তু পারেন না। কেবলই মনে হয় সংযমের প্রয়োজন আছে, সময় হলে এই রমণীই তাঁর কাছে আসবে—তিনি হাত বাড়ালে সেটা অসংযমের পরিচয় হবে। অথচ দৈনন্দিন জীবনের এই পরিস্থিতি দিনে দিনে বোঝার মত বুকে চেপে বসছে তাঁর।

হঠাৎ আবার একদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন তিনি। মনে মনে কিছু একটা সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু তার আগে একজনকে ডাকবেন তিনি। তিনি আইনজ্ঞ। কারো ওপর অবিচার করবেন না।

তখন সন্ধ্যা। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টি মাথায় করেই বেরিয়ে পড়লেন। ফিরলেন ঘণ্টা দুই বাদে। এখন চেপে বৃষ্টি পড়ছিল। বেশ ভিজেছেন। কনকদামিনী শুকনো পোশাক এগিয়ে দিলেন। ইন্দ্র বিশ্বাস আশা করেছিলেন, বৃষ্টিতে কোথায় গিয়েছিলেন এ কথা অন্তত কনকদামিনী জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু তাও করলেন না। একটু বাদে ঘুরে এসে জানতে চাইলেন, খাবার আনবেন কিনা।

আনো। অভিমানক্ষুব্ধ সংক্ষিপ্ত জবাব।

খাওয়া হল। কনকদামিনী চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, খাওয়া দিনে দিনে কমে যাচ্ছে কেন?

জবাব না দিয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন, কনকদামিনী তেমনি দাঁড়িয়ে, চাকর উচ্ছিষ্ট নিয়ে গেছে।

ইন্দ্র বিশ্বাস বিছানায় বসলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, তোমার সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা ছিল, একটু বসলে ভাল হত।

কনকদামিনী এগিয়ে এসে খাটের বাজু ধরে দাঁড়ালেন। সপ্রশ্ন প্রতীক্ষা।

আমি আবার বিলেত যাব ঠিক করেছি।

কনকদামিনী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।

আমি বাড়ি গেছলাম। হেমনলিনীকে জিজ্ঞাসা করলাম সে আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছে কি না—আমার জীবনে আবার ফিরে আসতে রাজি আছে কি না। সে রাজি নয়।...আমি আগামী জাহাজেই রওনা হব।

একটু নীরব থেকে কনকদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন, যাওয়ার দরকার হচ্ছে কেন?

এমনই। ভাল লাগছে না। হঠাৎ আগ্রহে ঝুঁকলেন একটু তাঁর দিকে।—তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

যাব।

বিশ্বাস করবেন কি করবেন না ঠিক বুঝে উঠছেন না ইন্দ্র বিশ্বাস।. এমন দ্বিধাশূন্য স্বীকৃতি আশা করেন নি যেন। চেয়ে আছেন। দুই চোখে কি যেন আশা, আর একটুখানি আশ্রয়ের ব্যাকুলতা।

হাত বাড়িয়ে তাঁর হাত দুটি ধরলেন, কাছে আকর্ষণ করলেন। দুর্বার আগ্রহে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি যাবে?

কনকদামিনীর চোখ দুটি যেন হাসছিল। জবাব না দিয়ে তেমনি নির্দ্বিধায় মাথা নাড়লেন শুধু। যাবেন।

ইন্দ্র বিশ্বাসের মনে হল, দুটি চোখে এমন অফুরন্ত স্নেহের ধারা তিনি আর দেখেন নি। যেন এতদিন এইটুকুরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। সহসা দু হাত বাড়িয়ে ছোট ছেলের মতই ওই বুকে মাথা গুঁজলেন তিনি।

কনকদামিনীর একটা হাত উঠল তাঁর মাথার ওপর। হাত বুলিয়ে দিলেন। তার পর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, এখন কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

ইন্দ্র বিশ্বাস আরো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরলেন তাঁকে।

কনকদামিনী সর্বংসহার মতই নিজের দুই বাহুতে আগলে রাখলেন তাঁকে। আর প্রিয়ার মত সমর্পণ করলেন নিজেকে।

একে একে বছর গড়িয়েছে অনেকগুলো। ইন্দ্র বিশ্বাস প্রৌঢ়ত্বের মাঝ ধাপে পা দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে দুর্বার গতি তাঁর। এই জীবনে যেন আর কোন বাধা-বন্ধ নেই। তাঁর বিত্তের পরিমাণ পরিত্যক্ত পিতৃ-সম্পত্তির অনেকগুণ ছাড়িয়েছে। আবার তিনি সন্তান চেয়েছিলেন। তাঁর আদর্শের সন্তান, আনন্দের সন্তান। কিন্তু কনকদামিনী সন্তানভাগ্য নিয়ে আসেন নি। এক একসময় এই ডাকসাইটে আইনজ্ঞটিকেই যেন তিনি সন্তানস্নেহে লালন করতেন।

কিন্তু এক নেশা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল ইন্দ্র বিশ্বাসের। মদের নেশা। কনকদামিনী অনেকদিন মৃদু অনুযোগ করেছেন, অভিমান করেছেন, মাঝে মাঝে কথাও বন্ধ করেছেন। কিন্তু নির্মম হতে পারেন নি কখনো। অথচ নির্মম হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। চিকিৎসক যে তাঁকে নির্মম হতে বলেছেন সে-কথা ইন্দ্র বিশ্বাসও জানেন। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে চলেছে। পেটে যখন তখন যন্ত্রণা হয়। সেই যন্ত্রণা তিনি কনকদামিনীর কাছে গোপন করতে চান। কিন্তু গোপন করা যায় না। কনকদামিনী মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারেন। ডাক্তার ডাকেন, শুশ্রূষা করেন, আবার অসহায়ের মত তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, কি করলে তুমি এই সর্বনেশে নেশাটা ছাড়তে পারো?

ইন্দ্র বিশ্বাস হাসেন। আঙুল দিয়ে ওপরের দিক দেখিয়ে দেন। অর্থাৎ মরলে। কনকদামিনীর মুখের অবস্থা দেখে তাঁর সত্যিই কষ্ট হয়। বলেন, ভেবো না, সব ঠিক আছে। আমি চেষ্টা তো করি।

কিছুই চেষ্টা কর না। কনকদামিনী রাগ করেন, জীবনে তোমার কথার নড়চড় হয় না, স্থির যা কর তার এদিক-ওদিক হয় না—আর এই একটা জিনিস ছাড়বে ভাবলে ছাড়তে পারো না!

ইন্দ্র বিশ্বাস হাসেন। তাঁর বিশ্বাস, এ তিনি পারেন না। কনকদামিনীর বিশ্বাস, ইচ্ছে করলেই পারেন।

গেল বছরের থেকে এ-বছর শরীর আরো খারাপ হয়েছে।

চিন্তিত হয়ে কনকদামিনী কৃষ্ণকুমারের সঙ্গেও পরামর্শ করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কি করা যায়। কৃষ্ণকুমার হাসেন, বলেন, বড়লোকের এ-রোগ কি এক বংশের রোগ! তুমি ওকে অসুস্থ দেখছ, রোগী বানিয়ে তুলছ। তোমার চোখ দুটো ওর ওপর থেকে তুলে নাও, দেখবে ভালয় মন্দয় মিশিয়ে ও দিব্বি কাটিয়ে যাচ্ছে। তোমার কাছে অসুস্থ হয়ে থাকতে ভাল লাগে বলেই সত্যি সত্যি এত ঘন ঘন অসুখ করে ওর।

কৃষ্ণকুমার এখনো নিয়মিতই আসেন প্রায়। বাজী ধরে দাবা খেলেন। দু-চারদিন না এলে ইন্দ্র বিশ্বাস ছটফট করেন। কৃষ্ণকুমার এখনো এসে বাড়ির খবরাখবর বলেন। মেয়ে দুটির বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে—তাদের খবর বলেন। বাপের সঙ্গে মাঝে মধ্যে মেয়েদের দেখা করতেও নিয়ে আসেন। এই সব-কিছুর উদ্দেশ্য বোঝেন ইন্দ্র বিশ্বাস। বুঝে বিরক্ত হন। তাঁর এই বিশাল বাড়ি, সম্পত্তি, অপর্যাপ্ত অর্থ, এখন আর অবহেলার নয়। এ-দিকে কৃষ্ণকুমারের চোখ আছে—চোখ বোধহয় ওদিকের সকলেরই আছে। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কৃষ্ণকুমার এক-একদিন কথাও তোলেন—সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র বিশ্বাস সে-প্রসঙ্গ ছেঁটে দেন।

কিন্তু জীবনে তাঁর আর এক নাটক ঘনিয়ে এসেছে সে-খবর তিনি রাখতেন না।

সন্ধ্যে থেকে দাবায় পরপর দু বাজী হেরেছেন ইন্দ্র বিশ্বাস। খেলার ঝোঁক চেপেছে। তৃতীয় বাজী নিয়ে বসেছেন। তাগিদ দিয়ে ইতিমধ্যে কনকদামিনী দুজনকেই খাইয়ে গেছেন। ইন্দ্র বিশ্বাস আগেই বেশ মদ খেয়েছিলেন, খাওয়ার পর খেলার ঝোঁকে আরো খানিকটা খেলেন। কৃষ্ণকুমার সন্ধ্যে থেকে এই খেলা নিয়েই অনেকবার টীকা-টিপ্পনী কেটেছেন—তাইতে ভিতরে ভিতরে রেগেও আছেন। এবারে হারাবেন, সংকল্প। তাঁর ধারণা, মদ খেলে তাঁর মাথা খোলে, তাই মদের বোতল পাশে নিয়ে বসেছেন, আর মাঝে মাঝে খাচ্ছেন।

হঠাৎ মনে হল, কৃষ্ণকুমার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন, আর খেলার মাঝে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবছেন কি। ইন্দ্র বিশ্বাস বিদ্রূপ করে উঠলেন, কার ধ্যান করছ, তোমার ধ্যানের রূপসী এবারে তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন বলে তো মনে হয় না।

কৃষ্ণকুমার হাসলেন একটু। হঠাৎ বললেন, আমাকেও দাও তো একটু, শরীরটা ভাল লাগছে না।

ইন্দ্র বিশ্বাস হতভম্ব। জীবনে তিনি কৃষ্ণকুমারকে মদ স্পর্শ করতে দেখেন নি। সে কিনা তাঁর কাছে মদ চাইছে। ঠিক শুনলেন কিনা সহসা বুঝে উঠলেন না।

কিন্তু ঠিকই শুনেছেন। হাত বাড়িয়ে মদ নিলেন কৃষ্ণকুমার। বেশ খানিকটাই খেলেন। খেয়ে মুখ বিকৃত করলেন। তার পর গুম হয়ে খানিক বসে রইলেন। ইন্দ্র বিশ্বাসের তখনকার মত আনন্দ হল বেশ ; নিজেও গলায় ঢাললেন আরো খানিকটা। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, আর একটু চলবে নাকি ?

দাও—

দিলেন। কৃষ্ণকুমার খেলেন। খুশির আতিশয্যে অবশিষ্টটুকু ইন্দ্র বিশ্বাস কাঁচাই গলায় ঢেলে দিলেন।

কৃষ্ণকুমার টেনে টেনে বললেন, এসো এবার খেলা যাক।

ইন্দ্র বিশ্বাস হেসে উঠলেন, আর খেলেছ, বলগুলো সব এখনো চোখের সামনে এক-একটি উর্বশী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না ?

বেড়ালেও তুমি জিতবে ভাবছ ?

ইন্দ্র বিশ্বাস ফিরে ঠাট্টা করলেন, মন্ত্রী ঘোড়া গজ নৌকোর তফাত ঠাওর করতে পারছ ?

কৃষ্ণকুমার নীরবে কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ছক থেকে নিজের বলের মন্ত্রীটা তুলে পাশে সরিয়ে রাখলেন। বললেন, ওটা ছাড়া খেলেও যদি হারো, কি হবে ?

ইন্দ্র বিশ্বাস জোরেই হেসে উঠলেন। ভাবলেন, নেশাটা ভালমতই ধরেছে।

কৃষ্ণকুমার বললেন, গর্দভের মত হা হা করে হেসো না—এটা ষাঁড়ের লড়াই না যে জিতবে ভাবছ, এটা বুদ্ধির লড়াই। জীবনে কোনদিন জিতেছ যে এমন বোকার মত হাসছ? ওই ওটা ছাড়াও তোমার মত নীরেটের সঙ্গে আমি লড়তে পারব—কি বাজী বল।

এতগুলো কটূক্তি ইন্দ্র বিশ্বাস কখনো শোনেন নি। তাঁর মাথায় আগুন জ্বলল হঠাৎ। এই সুযোগে জীবনের মতই শিক্ষা দেবেন তিনি। গম্ভীর মুখে বললেন, তুমি বল কি চাও।

উঠে কৃষ্ণকুমার টেবিল থেকে প্যাড আর কলম নিয়ে এলেন। —লেখো। তাঁর নির্দেশমত ইন্দ্র বিশ্বাস কাঁপা হাতে নিজের প্যাডে বাজীর শর্ত লিখলেন। তিনি হারলে, এই বাড়ি ঘর, এই বাড়ির অর্থ আসবাব-পত্র, এই বাড়ির স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় কিছু কৃষ্ণকুমারের হবে। হারলে একা একবস্ত্রে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। আর, কৃষ্ণকুমার হারলে বাকী জীবন তিনি তাঁর গোলামি করবেন, গোলাম হয়ে থাকবেন। নাম স্বাক্ষর করলেন দুজনেই। নীচে ফলাফল লেখার জায়গা থাকল।

রাত গভীর। খেলা চলছে। গভীর মনোনিবেশেই খেলছেন ইন্দ্র বিশ্বাস। তবু চোখ দুটো থেকে থেকে বুজে আসছে। এক একবার দান চালতে কৃষ্ণকুমারের বড় দেরি হচ্ছে। সাধারণত এত দেরি হয় না তাঁর। ইন্দ্র বিশ্বাস খেলছেন আর হাই তুলছেন। খেলা শেষ হল এক সময়। কি বাজী ধরেছিলেন অত আর মনে নেই। একটু শুতে পারলে বাঁচেন। কৃষ্ণকুমার লেখা কাগজটা সামনে ধরলেন। হেরেছেন লিখে খসখস করে নাম সই করে দিলেন ইন্দ্র বিশ্বাস।

তার পর গাঢ় ঘুম।

ঘুম ভাঙল যখন বেলা বেশ। সর্বাঙ্গ ম্যাজ ম্যাজ করছে। গত রাতের কথা আবছা মনে পড়ছে। বড় গোছের কিছু একটা বাজী হয়েছিল কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে। তিনি হেরেছেন না জিতেছেন? বোধহয় হেরেইছেন।…কিন্তু বেলা এত হল কনকদামিনীর দেখা

নেই কেন? কান পাতলেন। গোটা বাড়িটাই বড় বেশি চুপচাপ লাগছে।

গম্ভীর মুখে কৃষ্ণকুমার ঘরে ঢুকলেন। এরই মধ্যে স্নান সেরে এসেছেন। বসলেন সামনে, জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িটা কবে ছেড়ে দিচ্ছ।

ইন্দ্র বিশ্বাস ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন।

কৃষ্ণকুমার গতকালের লেখা কাগজটা বার করে দেখালেন। শর্ত লেখা, হারার স্বীকৃতিও। কৃষ্ণকুমার কাগজটা ফেরত নিয়ে বললেন, আজ কালের মধ্যে লেখা-পড়া করে ছেড়ে দিয়ে গেলেই ভাল হয়।

ইন্দ্র বিশ্বাস হাসতে লাগলেন। কিন্তু মনে মনে জ্বলছেন তিনি। তাঁর দম্ভ এ-ব্যাপারে আকাশস্পর্শী। কি করবেন তা তিনি তক্ষুনি সাব্যস্ত করে ফেলেছেন। শর্তের খেলাপ করবেন না। মুখে বললেন, না যদি ছাড়ি, তুমি কি করবে?

কি করব সেটা পরের কথা। কিন্তু কিছু করা দরকার হবে কি? তুমি তো এ যুগের ভীষ্ম, কথার নড়চড় হয় না—

ইন্দ্র বিশ্বাসের মুখ লাল। উঠে বসে হাঁক দিলেন, কনক!—

তাঁকে কি দরকার, তোমার কীর্তির কথা তাঁকে আমি সব বলেছি। তিনি শর্ত মেনে নিয়েছেন।

ইন্দ্র বিশ্বাস তাঁর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন একটা। কিন্তু কিছু বলার আগে কনকদামিনী দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখ থমথমে গম্ভীর।

ইন্দ্র বিশ্বাস বললেন, তৈরি হয়ে নাও, এ বাড়ি থেকে এক্ষুনি যেতে হবে আমাদের।

কৃষ্ণকুমার গম্ভীর মুখে বাধা দিলেন, উনি যাবেন না। শর্ত অনুযায়ী ওঁর ওপরেও তোমার অধিকার গেছে। এ-বাড়ির যাবতীয় কিছু বলতে ওঁকে আমি বাদ দিই নি।

ইন্দ্র বিশ্বাসের ধমনীর সব রক্ত বুঝি মুখে উঠে এলো। দুই

চোখে সামনের লোকটাকে ভস্ম করে নিলেন একপ্রস্থ। বিদ্রূপে চৌচির হয়ে ফেটে পড়লেন তার পর। বললেন, ওটা নিয়ে তা হলে কোর্টেই যাও, কোর্ট ওই কাগজ দেখেই ওকে সুদ্ধ এই বাড়ি ঘর সম্পত্তি সব তোমাকে দিয়ে দেবে।

কৃষ্ণকুমার শান্ত মুখে বললেন, তা না দিলেও কেস্‌টা কাগজে বেরুবে, মদ খেয়ে তুমি কি কর সবাই জানবে, দেশের লোক একটু মজা পাবে—এটুকুই লাভ।···কিন্তু তার দরকার হবে না, কনকদামিনী তোমাকে মিথ্যাচারী হতে দেবেন না হয়তো, বাজীর শর্ত তিনি মেনে নিয়েছেন।

ইন্দ্র বিশ্বাস স্তম্ভিত নেত্রে তাকালেন কনকদামিনীর দিকে। তিনি মূর্তির মত নিশ্চল, নির্বাক। মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলেছে ইন্দ্র বিশ্বাসের। তখন যা মুখে এসেছে তাই বলেছেন। পরে অনেক বুঝিয়েছেন তাঁকে, অনেক অনুনয় করেছেন। কিন্তু কনকদামিনী তেমনি স্থির, নির্মম মৌন।

আবারও কটূক্তি করে উঠেছেন ইন্দ্র বিশ্বাস। বলেছেন, মেয়ে জাত এই রকমই বটে। যখন যার তখন তার। নইলে এই বাড়ি ঘর সম্পত্তির লোভটাই এত বড় হবে কেন! রাগে ওই নারী-দেহ ফালা ফালা করে দিতে চেয়েছেন, বলেছেন, তোমার ছোট মন তাই এটুকুই মস্ত সম্পত্তি ভাবছ, কিন্তু আমার এখনো অনেক—অনেক আছে, বুঝলে? তোমার ভাবনা নেই—

কনকদামিনী এইবার তকিয়েছেন তাঁর দিকে। বলেছেন, সে-সব তোমার মদ খেতে আর বাজী ধরতে লাগবে।

এক কথায় সমস্ত চেষ্টার নিস্পত্তি করে দিয়ে সামনে থেকে চলে গেছেন।

আবার বছর ঘুরেছে একটা দুটো তিনটে। বহু জায়গা ঘুরে এই সাঁওতাল পরগণার নির্জনে প্রাসাদ ফেঁদে বসেছেন। সর্বক্ষণ জ্বলেছেন, অথচ আশ্চর্য, তাঁর শরীর তাজা। কবে মদ ছেড়েছেন

নিজেরও ঠিক খেয়াল নেই। ভিতরের তাড়নায় মদের কথা মনেও পড়ে নি অনেকদিন, তার পর খেতে গিয়েও থমকেছেন। তার পর অভ্যাসটা কখন আস্তে আস্তে চলেই গেছে।

থেকে থেকে কেবলই মনে হয়, কোথায় তাঁর ভুল হয়েছে একটা। মস্ত ভুল। মাথা খুঁড়ে ভুলটা খুঁজেছেন। কি ভেবে হঠাৎ একদিন কলকাতায় এসেছেন। দলিলপত্র করে বাকি বিষয়-সম্পত্তি কনকদামিনীর নামেই লেখাপড়া করে দিয়েছেন। কনকদামিনী ওই বাড়িতেই আছেন। দলিলপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও কনকদামিনীর সাড়া পান নি। তিনি ফিরে গেছেন।

তবু মনে হয়েছে, ভুলটা থেকেই গেল। সেই ভুলটাই বুকের তলায় জ্বলে। জ্বলে জ্বলে জ্বলে। শেষে কৃষ্ণকুমারকে চিঠি লিখলেন একটা। লিখলেন, আমার কোথাও ভুল হয়েছে। এই ভুলের জ্বালায় জ্বলে মরলাম। তাই তোমার মত পাষণ্ডের কাছেই লিখছি—ভুলটা কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও।

জবাব পেলেন আরো দু বছর বাদে। কৃষ্ণকুমার কনকদামিনীর মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে লিখেছেন, শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি জেনে গেছেন তুমি ভালই আছ। এইটুকু শান্তি নিয়েই চোখ বুঝেছেন তিনি। তোমার দেওয়া বিষয় সম্পত্তির লোভে কনকদামিনীর বাপের বাড়ির আত্মীয়পরিজনেরা সর্বদা ঘিরে থাকতেন তাঁকে। কিন্তু বিষয়-আশয়ের এক কপর্দক পর্যন্ত কনকদামিনী তোমার মেয়েদুটিকেই দিয়ে গেছেন।

ভুলের হদিস পেয়েছেন ইন্দ্র বিশ্বাস। বাকি জীবনটা এই ভুলের পুঁজি নিয়েই কাটাবেন তিনি। সমস্ত রাত জেগে এই ভুলের ইতিবৃত্ত লিখে রেখে যাচ্ছেন। সঞ্চয় রেখে যাচ্ছেন। সব থেকে বড় সঞ্চয় তাঁর আশা। তাঁর আশা, জীবনের এই দুঃস্বপ্নময় রাত অপগত হবে। তাঁর আশা, কিছুই তাঁর হারায় নি।

এই অট্টালিকার প্রতি রন্ধ্রে, প্রতিটি ধূলিকণায়, রাতের এই

স্তব্ধতার নিভৃততম গভীরে আজকের এই ইচ্ছা, এই উপলব্ধিটুকুই চির-মূর্ত হয়ে থাক্। আবার কোন একদিন আমি জাগব। আবার আমি আসব।...

॥ দশ ॥

সকাল থেকেই সেদিন শশিশেখরের আচরণ বিসদৃশ ঠেকছিল হয়তো অলকার, হাব-ভাব কথা-বার্তা সন্দেহজনক লাগছিল। বিকেলের দিকে অলকা হয়তো তার চোখে জলও দেখেছিল একবার। নইলে হঠাৎ সে তার বাক্স ঘাঁটবে কেন? তার সেই চির-নিশ্চিন্ততার রসদ, কাল-ঘুমের রসদ বাক্স থেকে গেল কোথায়?

শশিশেখর পাগলের মত ছুটেছিল অলকার কাছে। মুখের দিকে একপলক চেয়েই বুঝে নিল সব। কিন্তু তার তখন স্থৈর্য গেছে, বিবেচনা-শক্তিও গেছে। উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষিপ্ত আক্রোশে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমার বাক্স খুলেছিলে কেন? কেন কেন কেন? কোথায় সেটা?

স্তব্ধ মূর্তির মতই বসেছিল অলকা। ঠিক তত বড় একটা ধাক্কা না খেলে হয়তো দিশা ফিরত না। কতক্ষণ ওভাবে বসে ছিল শশিশেখর জানে না। আস্তে আস্তে অলকা নিজের মধ্যে ফিরে এলো যেন। চেয়ে চেয়ে দেখল খানিক। বলল, সেটা তোমাকে আবার দেব বলে নিই নি। পরক্ষণে ঝলসে উঠল সে, তুমি হীন কাপুরুষ, পুরুষ নামের অযোগ্য, লজ্জা করে না আমার সামনে এসে দাঁড়াতে!

শশিশেখর চুপ করে থাকে নি। তার মধ্যে জীবন-মৃত্যুর কাড়াকাড়ি চলেছে। মৃত্যুর দখলের দিকে এগিয়েছে সে। বলেছে, আমার জিনিস নিয়ে দাঁড়াতে তুমি বাধ্য করেছ, নইলে দাঁড়াতুম না। আজ না পারি কাল সরে যাব, কাল না পারি পরশু যাব— যা নিয়েছ, আবার তা সংগ্রহ করতে বেশিদিন লাগবে না। তখন

আমার থেকে যোগ্য লোক খুঁজে নিও—আমি টাকা না পেলেও তুমি পুরুষ পাবে।

সবেগে চলে যাচ্ছিল শশিশেখর, কানে যেন তপ্ত-শলাকা বিঁধল একটা।

—দাঁড়াও!

শশিশেখর ঘুরে দাঁড়াল।

অলকা জিজ্ঞাসা করল, যা তোমার গেছে সেই সবই তোমার ফিরে চাই-ই—কেমন? তা না হলে এই জীবনটার সঙ্গেও তুমি আপোস করতে রাজি নও—তাই না?

হ্যাঁ, তাই। বাঁচতে হলে যা গেছে তার সব চাই। যা গেছে তা না থাকা যে কি সে বোঝার শক্তি তোমার নেই। হঠাৎ কাছে সরে এলো শশিশেখর, খুব কাছে। মৃত্যুর গহ্বরে ডুবতে ডুবতেও যেন একটুখানি জীবনের আলো দেখতে পেল। বিকৃত স্বরে বলল, তোমার তো রূপের তুলনা নেই, কত লোক টাকার তোড়া নিয়ে ঘুরছে তাদের ছবিতে এই রূপ কেনার আশায়—দাও না কিছু টাকা সংগ্রহ করে, বিশ হাজার তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার যা পাও—কেস্‌টার অন্তত নিষ্পত্তি হোক। দেবে? তোমার রূপের জোরেই না-হয় আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে দেখো না—

আর তার পরেও যদি হারো? সাদা কাগজে সই করেছ এক-ধার থেকে, তোমার জেতার আশা কোথায়?

ক্রূর খেদে দু চোখ স্থির হয়ে এলো আবার শশিশেখরের, মুখে মৃত্যুর ছায়া নামল। বিড়বিড় করে বলল, তা হলেও চেষ্টা ক দেখতাম, শেষ দেখতাম।

চলে যাচ্ছিল। আবারও বাধা পড়ল।

শোনো, যাচ্ছ কোথায়?

জবাব দিল না, দুই চোখে অব্যক্ত অসহিষ্ণুতা।

আবারও অলকা যেন অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিল তার। তার পরে বলল, শেষ দেখতে পাবে তুমি। দিন সাতেক অপেক্ষা কর।

শশিশেখর দাঁড়িয়ে ছিল। অলকাই উঠে ঘর ছেড়ে গিয়েছিল।

দেখা হল পরদিন রাত্রিতে। অলকা বাইরে থেকে ফিরল। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা বড খাম তার হাতে দিল। খামভর্তি টাকা।

—দশ হাজার আছে ওখানে। পরে আরো দিচ্ছি।

শশিশেখর হতভম্ব খানিক। এমন অবিশ্বাস্য যে সবই ঘুলিয়ে যাচ্ছে।—এরই মধ্যে কন্ট্রাক্ট হয়ে গেল নাকি কিছু?

হ্যাঁ। পরক্ষণে আচমকা জ্বলে উঠল।—তোমার ওই চাকরকে এক্ষুনি তাড়াবে কিনা আমি জানতে চাই। তার এত সাহস, আমি যেখানে যাই সে ছায়ার মত ঘোরে আমার পিছনে!

দশ হাজার টাকায় মধ্যেই জীবনের নতুন প্রতিশ্রুতি দেখল শশিশেখর। কর্তব্যের তাগিদে হঠাৎ দিশেহারা সে। মহাদেওকে ডেকে সে মারতে বাকি রাখল শুধু।

—গেট্ আউট্! এক্ষুনি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাও তুমি, পাজি শুয়ার উল্লুক! গেট্ আউট্, গেট্ আউট্—

মহাদেও পাথরের মত দাঁড়িয়ে। অলকাও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

শশিশেখর চেঁচিয়ে উঠল, এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও এ-বাড়ি থেকে, কাল যদি তোমাকে দেখি চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব!

বলতে বলতে কে জানে কেন, নিজেই সে টাকার খাম হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন অলকাকে বলল, আমি পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই দিল্লী আর বোম্বেটা একবার ঘুরে আসি—বাইরের কাজ তো সব আমিই করতাম, সেখানে কিছু প্রমাণ-টমান মিলবে।

অলকা শান্ত জবাব দিল, এসো।

ফিরে আসার পর অলকা দু-দুবার দশ হাজার করে আরো বিশ হাজার টাকা দিয়েছে তার হাতে। শশিশেখর একবারও জিজ্ঞাসা করে নি, কি করে এলো, কোথা থেকে এলো। নিজের উত্তেজনায়

ভরপুর সে। তা ছাড়া অলকার মুখের দিকে চেয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও অস্বস্তি। সে আড়ালে থাকলেই শশিশেখর স্বস্তি বোধ করে।

অলকা আড়ালেই থাকে বেশির ভাগ। চার-পাঁচ দিনের জন্যে কোথায় চলে যায়। আবার আসে। আবার যায়। আগেও যেত। তার ড্রামা পার্টি আছে, ড্যান্স পার্টি আছে। শশিশেখর জিজ্ঞাসা করে না কোথায় যায়। বাইরে বাইরে হয়তো ছবির শূটিংও থাকে। ছবির কণ্ট্রাক্ট না হয়ে থাকলে অলকা এত টাকা পাচ্ছে কোথায়? শশিশেখরের এখন খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—কিন্তু ভরসা করে একটি কথাও বলে উঠতে পারে না। ভাবে, থাক, এদিকের ফয়সালা হয়ে গেলে সব দিকই আবার ঠিক হয়ে যাবে।

কেস্-এর ফলাফল দেখে শশিশেখর নিজেই তাজ্জব। এরই মধ্যে সব নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে ভাবা যায় না। আরো অবাক, দিব্যেন্দু বোস কোর্টে হাজির দেওয়া বন্ধ করেছে, তার উকিলও পর পর অনুপস্থিত। এক্সপার্টি ডিক্রি হয়েছে, ব্যবসার যাবতীয় সম্পত্তি, ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি সব দু ভাগ হবে। অর্ধেক শশিশেখর পাবে।

শশিশেখর আনন্দে আত্মহারা। তার দুই বাহুতে এত শক্তি এখন যে দুনিয়া ওলটপালট করে দিতে পারে।

অলকা কোথায়—ক'দিন আবার অলকাকে দেখছেই না বলতে গেলে।

কিন্তু অলকার দেখা সে-দিন পেল না। তার পর দিনও না। তার পর দিন ছোট একটা চিঠি পেল। চিঠির মাথায় দিব্যেন্দুর বাড়ির ঠিকানা। কিন্তু চিঠিটা লিখেছে অলকা। মামলার অনুকূলে নিষ্পত্তির জন্য সে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। আর লিখেছে, বিনিময়ে শশিশেখরের কাছ থেকে দিব্যেন্দু অলকার সেই ছবির অ্যালবামটা চেয়েছে।···ওটা একবার সে-ই নিয়েছিল, অলকা তার

অনুপস্থিতিতে সেটা আবার চুরি করে এনেছিল। আর লিখেছে সে ডিভোর্স স্যুট ফাইল করেছে, বোকার মত শশিশেখর যে আবার এই মামলাও যুঝতে না যায়। সব শেষে, লিখেছে, দফায় তাকে দেওয়া সেই নগদ তিরিশ হাজার টাকাও দিবে আর ফেরত চায় না। কিন্তু সম্ভব হলে সে টাকাটা যেন তা ফিরিয়েই দেয়।

দিন তিনেক বাদে শশিশেখরের একবার চমক লেগেছিল তার সামনে মহাদেও দাঁড়িয়ে। সেই আগের মতই নির্বিকা নির্লিপ্ত মূর্তি।

পরে মহাদেও জানিয়েছে, বউদিমণি তাকে চিঠি লি জানিয়েছে।

আরো অনেকদিন পরে আর একটা খবর জানিয়েছিল মহাদেও সেই একদিন তাকে চলে যেতে বলে দাদাবাবু যখন ঘর থেকে চলে গেলেন, তখন বউদিমণির দু'চোখ জ্বলছিল। আর মহাদে যখন আরো কিছুক্ষণ বাদে তাঁকে প্রণাম করে চলে যাচ্ছিল, তখ বউদিমণি কাঁদছিল। বউদিমণির জ্বলন্ত চোখে জল দেখে গিয়েছি মহাদেও।

ভোর হয়ে গেছে কখন। বাইরের বাগানের দিক থেকে একটা চেঁচামেচি কানে আসছে।

শশিশেখর বেরিয়ে এলো।

মজুরেরা বাগানে মাটি খোঁড়ার কাজে লেগেছে। কিন্তু তারা কাজ করছে না, এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কিছু দেখছে তারা, তাদের মুখে উত্তেজনা।

শশিশেখর পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। একজন লোক দৌড়ে এসে খবর দিল, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মাটির নীচে মস্ত একটা বাক্সর মত দেখা যাচ্ছে!

শশিশেখর তাড়াতাড়ি দেখতে এলো। দেখল। একটা কফিন।

কক্ষণ ধরে স্থির নেত্রে চেয়ে রইল সেটার দিকে। মজুরেরা
য়ে মালিককে দেখছে।

ম্বিৎ ফিরল। ওখানটায় আর না খুঁড়ে মাটি ফেলতে আদেশ
শশিশেখর ফিরে চলল।

ও-জায়গাটুকু আলাদা করে ঘিরে রাখতে হবে। সম্ভব হলে
সমাধি তুলে দেবে। আর, চারধারে ফুল গাছ বসাবে।

ইব্রেরী ঘর। শশিশেখর ভিতরে এসে দাঁড়াল। দেয়ালের
কর বড় বড় অয়েলপেন্টিংগুলো হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।
ারী চেনা লাগছে। ভিন্ন আকারে আর ভিন্ন সাজে এরাই
র কলকাতাব সেই ফেলে আসা অ্যালবামে। দেখছে, সব
চ জীবন্ত।

ার তাদের সামনে তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে সে কে?

ান যুগের শশিশেখর দত্তগুপ্ত?

চামড়ায় মোড়া পাণ্ডুলিপিটা আলমারিতে রাখার জন্য তুলে
কি মনে হতে দাঁড়িয়ে ভাবল একটু। পাণ্ডুলিপির গোড়ার
াদা।

শখর বসল। পকেট থেকে কলম তুলে নিল। পাণ্ডুলিপির
া কটাই গোড়ায় লিখল। একেবারে ঠিক শেষের কথা

আমি আবারও আসব।

াম স্বাক্ষর করল, শশিশেখর দত্তগুপ্ত। তারিখ বসাল।
পি আলমারিতে রেখে আলমারি বন্ধ করল। মহাদেও
য়ের ট্রে সাজিয়ে বসে আছে। ঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে
প্রশস্ত সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগল।